ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. ফিল ডিগ্রির জন্য রচিত অভিসন্দর্ভ

আধুনিক ফারসি কবি মুহাম্মদ হোসাইন শাহরিয়ার ও তাঁর অধ্যাত্মপ্রেম

Modern port Muhammad Hossain Shahriar and his spritual love

তত্ত্বাবধায়ক

ড. কে এম সাইফুল ইসলাম খান
অধ্যাপক
ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

রচনা ও উপস্থাপনায়
মোহাম্মদ আহসানুল হাদী
সহকারী অধ্যাপক ও এম. ফিল গবেষক
রেজিঃ নম্বর : ৬৪, শিক্ষাবর্ষ : ২০০৮-২০০৯
ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

আধুনিক ফারসি কবি মুহাম্মদ হোসাইন শাহরিয়ার ও তাঁর অধ্যাত্মপ্রেম

Modern port Muhammad Hossain Shahriar and his sprital love

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. ফিল ডিগ্রি অর্জনের জন্য

উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

মোহাম্মদ আহসানুল হাদী

সহকারী অধ্যাপক ও এম.ফিল গবেষক

ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকা-১০০০।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ. ডি. ডিগ্রি অর্জনের জন্য উপস্থাপিত

অভিসন্দর্ভ

আধুনিক ফারসি কবি মুহাম্মদ হোসাইন শাহরিয়ার ও তাঁর অধ্যাত্মপ্রেম

সূচিপত্র

শিরোনাম	পৃষ্ঠা নম্বর
প্রত্যয়ন পত্র	৬
ঘোষণা পত্র	৭
কৃতজ্ঞতা ও ঋণ স্বীকার	৮
প্রথম অধ্যায়	**১২**
ভূমিকা	১২
শাহরিয়ারের জীবনি	১৬
প্রথম কবিতা লেখা	১৮
জীবনে প্রেমের সূচনা	১৯
প্রেমে ব্যার্থতা	২১
প্রথম কাব্যগ্রন্থ	২৭
পিতার মৃত্যু	২৭
আধ্যাত্মিক সাধণা	২৯
মায়ের মৃত্যু	৩১
শাহরিয়ার ও ইসলামি বিপ্লব	৩২
মৃত্যু	৩৩

দ্বিতীয় অধ্যায়	**৩৪**
সাহিত্যকর্ম	৩৪
শাহরিয়ারের কবিতার ভাষা ও বর্ণনা ভঙ্গি	৩৬
অলংকার শাস্ত্রের ব্যাবহার	৪৭
গঠন ও প্রকৃতি	৫০
চিন্তা-চেতনা ও বিষয়বস্তু	৫২
চিত্রকল্প	৬১
পূর্ববর্তি কবিদের প্রভাব	৬৭
কোরআন ও ধর্মীয় বিষয়াবলী	৬৮
কাব্যলংকার	৭৪
তৃতীয় অধ্যায়	**৯২**
আধুনিক কবি হিসেবে শাহরিয়ার	৯২
ফারসি কাব্যরীতির প্রথম যুগ	৯২
ফারসি কাব্যরীতির দ্বিতীয় যুগ	৯৫
ফারসি কাব্যরীতির তৃতীয় যুগ	৯৫
ফারসি কাব্যরীতির চতুর্থ যুগ	৯৭
ফারসি কাব্যরীতির পঞ্চম যুগ	৯৭
ফারসি কাব্যরীতির ষষ্ঠ যুগ	৯৯
আধুনিক কবিতার সূচনার যুগ	৯৯
অষ্টম যুগ বা সমকালীন যুগ	১০০
ফারসি কবিতার سکتب বা লেখনি পদ্ধতি	১০১
ইউরোপীয় রচনাশৈলী	১০৭
শাহরিয়ারের দৃষ্টিতে নতুনত্ব	১০৮
আধুনিক কবিতা ও শাহরিয়ার	১১২
আধুনিক কবি হিসেবে শাহরিয়ারের মূল্যায়ন	১২০

চতুর্থ অধ্যায়	১২৩
শাহরিয়ারের জীবনে অধ্যাত্মবাদের সূচনা	১২৩
শাহরিয়ারের প্রেমতত্ত্ব	১২৭
হাফিয প্রভাবিত শাহরিয়ার	১৪০
শাহরিয়ারের আধ্যাত্মিক চিন্তাদর্শন ও দৃষ্টিভঙ্গি	১৫০
শাহরিয়ারের দৃষ্টিতে আ'রেফ ও এরফানিয়াত	১৫১
وحدت বা প্রেমাস্পদের একত্ববাদ	১৫৫
মের্শেদ ও তার অনুসরণ	১৬৫
ফাকর বা অমুখাপেক্ষিতা	১৭২
কানায়াত বা অল্পেতুষ্টি	১৭৪
ফানা বা প্রেমাস্পদে আত্মবিলোপ	১৭৭
বাকা তত্ত্ব	১৮৫
আত্মা-দর্শন বা দেহ তত্ত্ব	১৮৯
দুনিয়ার প্রতি অনিহা	১৯৭
তওবা	২০০
উপসংহার	২০৪
গ্রন্থপঞ্জি	২০৫

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন পত্র

আমি প্রত্যয়ন করছি যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের এম.ফিল গবেষক ও সহকারী অধ্যাপক মোহাম্মদ আহসানুল হাদী কর্তৃক ''আধুনিক ফারসি কবি মুহাম্মদ হোসাইন শাহরিয়ার ও তাঁর অধ্যাত্মপ্রেম'' (*Modern port Muhammad Hossain Shahriar and his spritual love)* শীর্ষক পিএইচ. ডি. অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ নির্দেশনা ও তত্ত্বাবধানে রচিত হয়েছে। এ গবেষণাকর্মটি মোহাম্মদ আহসানুল-এর নিজস্ব ও একক গবেষণাকর্ম হিসেবে রচিত ও উপস্থাপিত হয়েছে। আমার জানামতে ইতোপূর্বে এ শিরোনামে পিএইচ. ডি. ডিগ্রি লাভের উদ্দেশ্যে কোন গবেষণাকর্ম রচিত হয়নি।

আমি এ অভিসন্দর্ভটি পুরোপুরি পাঠ করেছি এবং পিএইচ. ডি. ডিগ্রি অর্জনের জন্য উপস্থাপন করার অনুমতি প্রদান করছি।

(ড. কে এম সাইফুল ইসলাম খান)
গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক
ও
অধ্যাপক
ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০।
ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০

ঘোষণা পত্র

আমি এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, ''আধুনিক ফারসি কবি মুহাম্মদ হোসাইন শাহরিয়ার ও তাঁর অধ্যাত্মপ্রেম'' (*Modern port Muhammad Hossain Shahriar and his spritual love)* শীর্ষক এ পিএইচ. ডি. অভিসন্দর্ভটি আমার একক গবেষণাকর্ম। আমি এ গবেষণাকর্মটির বিষয়বস্তু পূর্ণ অথবা অংশ বিশেষ কোথাও ডিগ্রি লাভের জন্য প্রকাশ করিনি।

(মোহাম্মদ আহসানুল হাদী)
এম.ফিল গবেষক
ও
সহকারী অধ্যাপক
ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০।
রেজিস্ট্রেশন নম্বর : ১৩৪
শিক্ষাবর্ষ : ২০০৮-২০০৯

কৃতজ্ঞতা ও ঋণ স্বীকার

সমস্থ প্রশংসা সেই মহান আল্লাহ পাকের, যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং সমস্থ সৃষ্টির সেরা জীব বলে ঘোষণা করেছেন। সেই পরম করুণাময় প্রভুর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি যার তাওফিক ব্যতিত এই গবেষণাকর্ম সম্পাদন করা বাস্তবিকই ভাবেই অসম্ভব হতো।

অসংখ্য দুরূদ ও সালাম পেশ করছি বিশ্বমানবতার মহান বন্ধু, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে পৃথিবীর সকল মানবের কাছে প্রিয়পাত্র, গ্রহণীয়-বরণীয় ও ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ হিসেবে স্বীকৃত, পৃথিবীর মানবগোষ্ঠির জন্য আদর্শ শিক্ষক হিসেবে জ্ঞানের আলোকবর্তিকা নিয়ে আবির্ভূত বিশ্বনবি হযরত মোহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি। যাঁর উম্মত পরিচয়ে আমরা ধন্য, সৌভাগ্যবান ও গৌরবান্বিত।

কৃতজ্ঞতা ও ঋণ স্বীকার করি পরম শ্রদ্ধেয় মাতা-পিতার প্রতি, যারা অনার্স, মাষ্টার্স ও এমফিল পর্যায়ে ফারসি ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে পড়া ও গবেষণার ব্যাপারে উৎসাহিত করেছেন। আত্মীয়-স্বজন, ঘনিষ্টজন, পাড়া-প্রতিবেশি সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই- যারা সার্বক্ষণিক আমাকে দোয়া করেন, আমার কষ্টে ব্যথিত হন এবং আমার সাফল্যে গৌরববোধ করেন।

আমি হৃদয়ের সবটুকু আবেগ উজাড় করে দিয়ে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি আমার আদর্শ শিক্ষক অধ্যাপক ড. কে এম সাইফুল ইসলাম খানের প্রতি- যিনি দয়া করে, মমতাভরে আমাকে তাঁর শিষ্যত্বের সুযোগ দিয়েছেন, মানুষ হবার দীক্ষা দিয়েছেন, অভিভাবকত্বের দায়িত্ব পালন করেছেন, মানবতা ও মনুষ্যত্বের তালিম দিয়েছেন এবং বিগত এক যুগেরও অধিক সময় ধরে সুখে-দুঃখে, সময়ে-অসময়ে পাশাপাশি থাকার, জীবনকে জ্ঞান, প্রেম ও সৃষ্টির সেবায় উৎসর্গ করার পথে বিরামহীন প্রচেষ্টা চালিয়েছেন, সব ধরণের লোভ, পার্থিব চাওয়া-পাওয়া ও স্বার্থপরতার ঊর্ধ্বে উঠে একনিষ্ঠভাবে জ্ঞানের চর্চা, সৃষ্টির কল্যাণ চিন্তা আর সেবার মহান ব্রত নিয়ে এগিয়ে চলার পথ-নির্দেশনা দিয়েছেন। তাঁর অজস্র অবদানের বিপরীতে কৃতজ্ঞতা জানানোর ভাষা ও সামর্থ আমার নেই; শুধু অকৃপণ ঘোষণা ও স্বীকারোক্তি দিয়ে বলতে চাই- এযাবত অর্জিত যেটুকু সাফল্য তার সিংহভাগ তাঁরই অবদান। এমনকি বর্তমান গবেষণাকর্ম ও অভিসন্দর্ভ রচনা- সেটিও সম্পাদিত হলো তাঁরই সহযোগিতা, তত্ত্বাবধান ও নির্দেশনার আলোকেই। তাই তাঁর ঋণ কখনো শোধ করার মতো নয়।

আমি গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি, ফারসি ভাষা ও সাহিত্যেও সবচেয়ে প্রবীন শিক্ষিকা মা'দারে যবানে ফারসি দার বাংলাদেশ বা বাংলাদেশের ফারসি ভাষার মা হিসেবে খ্যাত ড. কুলসুম আবুল বাশারের প্রতি, যিনি আমাকে এই গবেষণা কর্মের প্রতি উৎসাহিত করেছেন এবং প্রয়োজনীয় তথ্য উপাত্ব দিয়ে যথেষ্ট সহযোগীতা করেছেন।

বিভাগীয় সাবেক চেয়ারম্যান ও আমার সম্মানিত শিক্ষক ড. মোঃ মুহসীন উদ্দিন মিয়ার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। আমাকে এই গবেষণাকর্ম সম্পাদনে বিভিন্ন সময়ে মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে কৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ করেছেন। অভিসন্দর্ভ রচনায় তাঁর সার্বক্ষণিক উৎসাহ-উদ্দীপনা আমাকে এক্ষেত্রে গতিশীলতা আনয়নে সহায়তা করেছে।

ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের বর্তমান চেয়ারম্যান, আমার প্রিয় শিক্ষক ড. তারিক জিয়াউর রহমান সিরাজীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি যিনি গবেষণাকর্ম ও অভিসন্দর্ভ প্রণয়ন সংক্রান্ত সকল বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ, মতামত ও নির্দেশনা দিয়ে সহযোগীতা করেছেন। কোন বিষয়ে যখনই খট্‌কা লেগেছে, সমস্যায় পড়েছি- সাথে সাথে তাঁর কাছে ছুটে গিয়েছি, পরামর্শ নিয়েছি এবং সেই আলোকে সামনের দিকে অগ্রসর হয়েছি। কি দিনে, কি রাতে, অফিসে অথবা বাসায় সর্বত্র তাঁকে বিরক্ত করেছি, অনেক সময় নিয়েছি, কিন্তু কখনো তিনি নিরাশ করেননি, বিরক্তবোধও প্রকাশ করেন নি। এমন উদার চিত্ত ও সহযোগিতার মানসিকতাসম্পন্ন শিক্ষকের সান্নিধ্য ও তত্ত্বাবধান আমার কাজকে অনেক সহজ করে দিয়েছে। তাই বিনম্র চিত্তে আমার প্রিয় তারিক স্যারকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই।

আমার সম্মানিত শিক্ষক ড. আব্দুস সবুক খানের প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করঝি যিনি ছাত্র জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে যিনি আমাকে আন্তরিক ভাবে সহযোগীতা করেছেন এবং এই গবেষণা কর্মের প্রতি উৎসাহিত করেছেন।

বিভাগীয় শিক্ষক ড. মোহাম্মদ বাহাউদ্দিন এর প্রতি আমার গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি, যিনি বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে শুরু থেকেই বিভিন্ন বিষয়ে আমাকে প্রত্যক্ষভাবে সহযোগীতা করেছেন। এই গবেষণা কর্মের ব্যাপারেও তিনি বিভিন্ন তথ্য উপাত্ব সময়পোযোগী বুদ্ধি ও সিদ্ধান্ত দিয়ে সহযোগীতা করেছেন।

বিভাগীয় শিক্ষক ড. আবুল কালাম সরকার, ড. আবু মূসা মোঃ আরিফ বিল্লাহ ও মুমিত আল রশিদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি, যারা বিভিন্ন পর্যয়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়ে আমাকে সহযোগীতা করেছেন। আমাকে তাঁরা এ গবেষণাকর্মের থিসিস রচনায় যে মূল্যবান মতামত ও সাজেশন দিয়েছেন সেজন্য আমি তাঁদেরকে আন্ড়রিক ধন্যবাদ ও সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

আমি সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমার শিক্ষকতুল্য, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা বিভাগের অধ্যাপক ড. এম শামীম খান এবং অধ্যাপক ড. মোঃ নূরুল হুদার প্রতি- যাঁদের নিকট আমি ছাত্রজীবন থেকেই ঋণী হয়ে আছি। অনার্সের বিভিন্ন বর্ষ, মাস্টার্স ও এম. ফিল পর্যায়ে নানান স্ড়রে তাঁদের সান্নিধ্য ও সহযোগিতা লাভ করেছি।

আমার পরিবারের সদস্যদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে শেষ করা যাবে না। আমার স্ত্রী নুরুন্নাহার সুমি, আমার একমাত্র প্রিয় হোসাইনুল হাদী, গবেষণাকর্ম সম্পাদনের তাগিদে কত সময় যে এদের থেকে ফাঁকি দিয়ে থেকেছি তার ইয়ত্তা নেই। তাঁদের সব সময়ই সহযোগির ভূমিকায় পেয়েছি আর সে কারণেই বাসায় নিরবিচ্ছিন্ন কাজের পরিবেশ বিদ্যমান ছিল- যা আমাকে কার্য সম্পাদনে এগিয়ে দিয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গিয়াসুদ্দিন আবাসিক এলাকায় আমার শ্বশুড় বাড়ি হওয়ার সুবাদে অনেক সময় তাঁদেরও সহযোগিতা পেয়েছি। পারিবারিক সহযোগিতা আমার গবেষণায় বড় ভুমিকা পালন করেছেন।

আমার গবেষণাকর্ম সম্পাদন ও অভিসন্দর্ভ রচনায় সংশিণ্টষ্ট গ্রন্থাবলী এবং অন্যান্য তত্ত্ব-উপাত্ত্ব সংগ্রহের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রিয় গ্রন্থাগার, ঢাকাস্থ ইরানি কালচারাল সেন্টারের লাইব্রেরি, শাহবাগস্থ পাবলিক লাইব্রেরি, ইসলামিক ফাউন্ডেশন লাইব্রেরি ও ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের সেমিনার লাইব্রেরি এবং . আল্লামা রুমি সোসাইটির সম্মানিত নেতৃবৃন্দ ও সদস্যবর্গ আমাকে গবেষণাকর্মে অনেক বেশী উৎসাহিত ও অনুপ্রাণীত করেছেন।

আমার বিভাগের সকল কর্মকর্তা, কর্মচারি, ছাত্র-ছাত্রী বৃন্দ, রাজশাহী, চট্রগ্রাম ও খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফারসি ভাষা ও সহিত্যের সকলের প্রতি আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি যারা সময়ে অসময়ে বিভিন্ন ভাবে এই গবেষণায় আমাকে সহযোগীতা ও অনুপ্রাণীত করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

بسم الله الرحمن الرحيم

আধুনিক ফারসি কবি মুহাম্মদ হোসাইন শাহরিয়ার ও তাঁর অধ্যাত্মপ্রেম

ভূমিকা :

হাজার বছরের পুরোনো ভাষা সমূহের মধ্যে ফারসি অন্যতম। খ্রিষ্টপূর্ব দেড় হাজার বছর থেকেই এই ভাষার অস্তিত্ব পাওয়া যায়। পারস্যের 'ফারস' প্রদেশের নাম আনুসারে এই ভাষার নাম করণ করা হয় ফারসি। প্রাচীনকালে গ্রীকরা এই প্রদেশের সংস্পর্শে আসেন। গ্রীক ঐতিহাসিকরা এই অঞ্চলকে পারসিস (persis) বলতেন। এর ফলে এই প্রদেশের নাম অনুসারে সমগ্র দেশ পারসিয়া (persia) নামে বহির্জগতে পরিচিত হয়। (brown, p:34) বর্তমান ইরান যে সভ্যতা ও কৃষ্টির ওপর প্রতিষ্ঠিত তা প্রধানত ইলামি (Elamate) সভ্যতা। খ্রিষ্টপূর্ব ৩০০০ অব্দের প্রথমভাগে দক্ষিণ ইরানে এই সভ্যতার প্রচলন হয় বলে মনে করা হয়। ইরানের বর্তমান অধিবাসীদের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশই আর্য বংশভূত। আর্যরা খ্রিষ্টপূর্ব ১৫০০ অব্দে মধ্য এশিয়ার সমভূমি থেকে ইরানের অভিবাসন শুরু বলে ঐতিহাসিকদের ধারণা। অত্র এলাকার আদিবাসী এবং অভিবাসিত আর্যদের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ ও মেলামেশার ফলে একটি নতুন ভাষা ও সংস্কৃতির উদ্ভব ঘটে। এই নতুন ভাষাটিই ফারসি ভাষা। এ ভাষা চারটি পর্যয়ে বিকাশ লাভ করে : আবেস্তা, প্রাচীন ফারসি, পাহলভি ও আধুনিক ফারসি (বাংলা পিডিয়া[৪৭], ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃ:১৩৫-১৪২)

পাহলভি আশকানি যুগে (খ্রি. পূ ২৪৯-২২৬) পাহলভি বা মধ্য ফারসি নামে ইরানে আর একটি ভাষার উদ্ভব ঘটে। এটি মূলত আবেস্তা ও প্রাচীন ফরসির বিবর্তিত রূপ। পরবর্তীতে সাসানিদের

রাজত্বকালে (খ্রি. পূ ২২৬-৬৫২) এ ভাষার উচ্চারণ ও আঙ্গিকগত উৎকর্ষ সাধিত হয়। এভাবে আশকানি ও সাসানিদের রাজত্বকাল মিলে প্রায় এক হাজার বছরব্যাপী এ ভাষা ইরানে প্রচলিত ছিল। আশকানি যুগে পাহলভি ভাষার কিছু গ্রন্থ লিপিদ্ধ করা হয়েছিল, কিন্তু দুচারটি ছাড়া সেগুলির অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়নি। প্রাচীন ইরানের ইতিহাসে সাসানিদের রাজত্বকালকেই স্বর্ণযুগ বলে মনে করা হয়। এ যুগে ইরানের শিল্প সাহিত্য ও সংস্কৃতি প্রভূত উন্নতি লাভ করে। এরাই প্রথমে গ্রিক ও ভারতীয় মূল্যবান বইপত্র পাহলভি ভাষায় অনুবাদ করতে শুরু করে। স্মরণীয় যে, বিখ্যাত সাসানি সম্রাট নওশেরওয়ান ভারতের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ পঞ্চতন্ত্র পাহলভি ভাষায় অনুবাদ করান। পরবর্তীতে সামানি যুগের (৮৭৪-৯৯৮) প্রসিদ্ধ অন্ধ কবি রুদাকি এর কাব্যানুবাদ করেন।

পাহলভি ভাষায় বেশকিছু রম্যরচনা, ঘটনাপঞ্জি, ছোটগল্প, কবিতা, গান ইত্যাদি রচিত হয় এবং পরবর্তীতে ফারসি কবিরা সেগুলির কিছু কিছু আধুনিক ফারসি ভাষায় অনুবাদ করেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ খসরু ও শিরিন, রোস্তমনামা, বাহারনামা, ইস্কান্দারনামা ইত্যাদির নাম উল্লেখ করা যায়। এছাড়াও হেজার দাস্তান বা হাজার কাহিনী কাব্যটি ফারসি ভাষায় অনুবাদ করা হয় এবং পরে আলফা-লাইলা ওয়া লাইলা (এক হাজার রজনী) নামে সেটি আরবি ভাষায় অনূদিত হয়।(বাংলা পিডিয়া[৪৭], ৬ষ্ঠ খন্ড পৃ: ১৩৫-১৪২)

শেষ সাসানি সম্রাট ৩য় ইয়াযদেগারদ (৬৬৪-৬৫২ খ্রি)-এর রাজত্বকালে মুসলমানগণ কর্তৃক ইরান দখলের পর ইরানের জনগণ বিপুলভাবে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়। বিজেতারা পারস্য দেশের প্রচলিত ভাষা ও হরফের আমুল পরিবর্তন সাধন করেন। ফলে পাহলভি বর্ণমালার পরিবর্তে আরবি হরফ ও ভাষার আশ্রয়ে ফুলে ফলে সুশোভিত হয়ে উঠে। (উদ্দীন[১৬], পৃ: ১১) আরবি ভাষার প্রভাবে পাহলভি ভাষা ক্রমান্বয়ে ফারসিতে রুপান্তরিত হতে থাকে। এভাবে পাহলভি ভাষার মত পাহলভি সাহিত্যের অনেক গ্রন্থও বিলুপ্ত হয়ে যায়।

এই সময় আরব ভাষাবিদগণ পাহলভি বর্ণমালাকে আরবি বর্ণমালার ধাঁচে পরিবর্তন করেন। কয়েকটি বর্ণের আরবি প্রতিবর্ণ না থাকায় অতিরিক্ত বিন্দু বা চিহ্ন প্রয়োগে উক্ত বর্ণাবলি তৈরি করা হয়। যেমন আরবি ' বে' হরফের নিচে দুটি বিন্দু দিয়ে ' পে', 'জিম' এর পেটে দুটি বিন্দু দিয়ে ' চে', যে হরফের উপর একটি সোজা রেখাচিহ্ন বসিয়ে 'গাফ' বর্ণ তৈরি করা হয়। এভাবেই পাহলভি বর্ণমালা ও ভাষা বিলুপ্ত হয়ে যায় ও আধুনিক ফারসি ভাষার উদ্ভব ঘটে। (বাংলা পিডিয়া[৪৭], ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃ:১৩৫-১৪২)

২৬১ হিজরি সালে নসর বিন আহমাদ সামানি, ইরানে সামনি রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। সামানি সম্রাজ্যের রাজধানী ছিল বোখারায়। ফারসি ছিল এই সম্রাজ্যের রাষ্ট্র ভাষা। সামানি শাসকগণ ফারসি ভাষার প্রসারে ব্যপক উদ্যগ গ্রহণ করেন। ৩৫১ হিজরিতে আলপ্তগিন, 'গজনিতে' গাজনাভি সম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। আলপ্তগিনের গোলাম ও মেয়ের জামাই সাবক্তগিন এই সম্রাজ্যের আরো বিস্তৃতি ঘটান। সাবক্তগিনের ছেলে মাহমুদ গাজনাভির সময়ে ভারতবর্ষের কিছু অংশ গাজনাভি সম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত হয়। সিংহাসনে আরোহনের পর সুলতান মাহমুদ ভারতবর্ষের দিকে বিশেষ নজর দেন। তিনি ১০০০ খ্রি. থেকে ১০২৬ খ্রি. মধ্যে ১৭ বার ভারত আক্রমন করেন। সুলতান মাহমুদের ভারত আক্রমন এই উপমহাদেশে ফারসি ভাষা ও সাহিত্য প্রসারের ক্ষেত্রে ব্যাপক ভূমিকা রাখে। অনেক ঐতিহাসিকই সুলতান মাহমুদকে মূর্তি ধ্বংস কারি সাম্প্রদায়িক ও গোড়া ব্যক্তি হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। কিন্তু শিক্ষা-সাহিত্যের

পৃষ্ঠপোষকতার জন্য সুলতান মাহমুদ যে ভূমিকা রেখেছেন তা কিছুতেই অস্বিকার করা যায় না। ডঃ যখাও আল-বিরুনি মন্তব্য করেন :

> ÔÔmjZvb gvng‘ hw‘ mwZ¨B mv¤c‘wqK n‡Zb Zvn‡j Zvi ‘iev‡i wZwb Avj weiæwbi gZ e¨w³‡Zi có‡cvIKZv K‡iZ cvi‡Zb bv| gjZ mjZvb gvng‘ wb‡R GKRb Kwe I cwÛZ e¨w³ wQ‡jb| wZwb wkí mwn‡Z¨i GKRb mgS‘vi wQ‡jb Ges wk¶v I wkw¶Z‡‘i cô‡cvIKZv Ki‡Zb| mwn‡Z¨i cwZ AwZwi³ D‘viZvi Rb¨ Zvi ‘iev‡i †h mKj cwm× Kwe , Áwb, ¸Yx e¨w³ Rgv‡qZ n‡qwQ‡jb, Zv‡‘i g‡a¨ Avj-weiæwb, †di‡‘Šwm, Avbmvjx, DZex Ges Avj-dviwei bvg mwe‡kl D‡jøL‡hvM¨| †di‡‘Šwm Zvi mfvKwe wQ‡jb| cw_exi wewfb w‘K †_‡K cwÛZ‡‘i AvgšY K‡iwQ‡jb| wZwb menr cvVvMvi I hv‘N‡ii mgš‡q MRwb‡Z wekwe‘¨vjq ¯vcb K‡ib|ÕÕ (কে আলী[২৩], পৃ: ৩৬)

সুলতান মাহমুদ ভারতবর্ষে তার আক্রমণের শুরুর দিকেই ১০১৩ খ্রিষ্টাব্দে বর্তমান পশ্চিম পাকিস্তানের ‘পেশাওয়ার’ ও ১০১৫ খ্রিষ্টাব্দে ‘পাঞ্জাব’ দখল করে নেন এবং গজনি সালতানাতের শাসনকার্য পরিচালনার প্রশাসনিক কার্যালয় স্থাপন করেন। যার ফলে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই গাজনাভি সুলতানদের পৃষ্টপোষকতায়, ‘গজনির’ পরেই ‘লাহোর’ ফারসি ভাষা ও সংস্কৃতি চর্চার সর্ববৃহৎ প্রাণ-কেন্দ্র হিসেবে গড়ে ওঠে, যেখানে আবুল ফজল রুনি, মাসউদ সাদ সালমান, আবুল হাসান আলি বিন উসমান হাজবেরির মত অনেক জ্ঞানি গুনি ব্যাক্তিবর্গের সমাবেশ ঘটেছিল। এ হিসেবে লাহোর-ই ছিল উপমহাদেশে ইরানি ভাষা-সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার প্রথম প্রাণকেন্দ্র। (আসগর[১৩], পৃ: ২)

সুলতান মাহমুদের সেনাবাহিনি তৎকালিন যুগে ফারসি ভাষা বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে। প্রতি বছর শীতকালে তারা ভারতে আক্রমণ করতেন, নতুন নতুন অঞ্চল দখল করতেন। সাথে করে যে দুটো জিনিষকে তারা বয়ে নিয়ে এসেছিলেন, তা হলো ফারসি ভাষা ও ইসলামি চেতনা। ক্রমান্বয়ে ইরানিদের এই আক্রমণের ফলে, অল্পকয়েকদিনের মধ্যেই ফারসি ভাষা রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ভাষা হিসেবে মানুষের হৃদয়ে জায়গা করে নেয়। (অসতিয়ানি[১], পৃ: ৯)

সুলতান মাহমুদের মৃত্যুর পরে তার বংশধরেরা ভারতবর্ষে তাদের অভিযান অব্যাহত রাখে এবং ভারতবর্ষে রাজ্যের সীমা বৃদ্ধি করতে থাকে। এভাবেই হিজরি পঞ্চম শতকের মাঝামাঝি সময়ে পাঞ্জাব ও তার আশেপাশের অঞ্চলে ফারসি ভাষা প্রচতিল হয়। প্রকৃতপক্ষে গাজনাভি সালতানাত ছিল খেরাসানের ইরানি সভ্যতা ও সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত। গাজনাভি যুগে ইরানিদের মাধ্যমেই ইসলাম সর্বপ্রথম ভারতে প্রসার লাভ করে। ইসলাম প্রসারিত হওয়ার সাথে সাথে ফারসি ভাষাও এই উপমহাদেশে স্থায়ী আসন করে নেয়।

গাজনাভি বংশের পর ইরানের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ঘুরিদের আগমন ঘটে। গজনি এবং হিরাতের মধ্যবর্তী পর্বত সঙ্কুল স্থানে ঘুর রাজ্য অবস্থিত ছিল। ১০১০ খ্রিষ্টাব্দে সুলতান মাহমুদ এই অঞ্চল অধিকার করেন। (কে আলী[২৩], পৃ: ৪০) তখন থেকেই ঘুর গজনি বংশীয়দের কদর রাজ্যে রুপান্তরিত হয়। সুলতান মাহমুদের পতাকাতলে দাঁড়িয়ে ঘুরিরা বিশ্বস্থতার সাথে যুদ্ধ করে। কিন্তু তার উত্তরাধিকারীদের রাজত্বকালে তারা গজনি বংশীয়দের আনুগত্য অস্বীকার করে। সুলতান মাহমুদের বংশধর বাহরাম শাহ

ঘুরি বংশের অন্যতম সর্দার কুতুবুদ্দিনকে হত্যা করলে অবস্থা মারাত্মক হয়ে দাঁড়ায়। নিহত সর্দারের ভাই সাইফুদ্দিন এতে ক্রুদ্ধ হন। বাহরামের বিরুদ্ধে অভিযান করে তিনি তাকে গজনি হতে বিতাড়িত করেন। বাহরাম শীঘ্রই ফিরে আসেন এবং যুদ্ধে সাইফুদ্দিনকে পরাজিত করে হত্যা করেন। আলাউদ্দিন তার ভাইয়ের দুর্ভাগ্যের কথা শুনে গজনির সুলতানকে শাস্তি দেওয়ার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। তিনি বাহরাম শাহকে আক্রমণ করে বিতাড়িত করেন এবং গজনি নগরী লুণ্ঠন করে সাত দিন যাবত হত্যাকার্য চালান। গজনির বহু সুন্দর অট্টাকিা ধ্বংস করেন ও অধিকাংশ অধিবাসিকে হত্যা করেন। এই নিষ্ঠুর কার্যের ফলে আলাউদ্দিন, জাহান সুয (পৃথিবীদাহক) উপধি পান। (কে আলী[২৩], পৃ: ৪০)

বাহরামের পুত্র খসরু শাহ নিজের বংশের গৌরব পুনরুদ্ধার করার বিফল চেষ্টা করেন। তার পুত্র খসরু মালিক, পিতার উত্তরাধিকার লাভ করেন। কিন্তু ১১৫১ খ্রিষ্টাব্দে তিনি মুহম্মদ বিন সাম কর্তৃক পরাজিত ও নিহত হন। আলাউদ্দিনের মৃত্যুর পর তার পুত্র সাইফুদ্দিন ক্ষমতা অধিকার করেন। কিন্তু তুর্কীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তিনি অল্পকালের মধ্যে নিহত হন। রাজ্যের অভিজাতগণ আলাউদ্দিনের ভ্রাতুষ্পুত্র মুহম্মদকে সিংহাসনে বসান। খসরু শাহের রাজত্বকালে গজনী ও গুজ তুর্কীদের অধিকারে আসে। গিয়াসুদ্দিন গজনি অধিকার করলেন। তিনি তার ভাই মুহম্মদ বিন সামকে শিহাবুদ্দিন উপাধি দান করে এই নতুন প্রদেশের শাসনভার অর্পন করেন। সিংহাসনে আরোহণের পর তিনি মুইযুদ্দিন উপাধি গ্রহণ করেন। কিন্তু ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে তিনি মুহম্মদ ঘুরি নামেই অধিক পরিচিত হন।

ক্ষমতায় অধিষ্টিত হওয়ার পর ৫৮৩ হিজরিতে / ১১৮৭ খ্রি লাহোরের সর্বশেষ গাজনাভি শাসক সুলতান খসরু মালিককে পরাজিত করে 'লাহোর' দখল করেন। ৫৮৮ হিজরিতে/ ১১৯২ খ্রি. দিল্লির রাজা চুহানকে পরাজিত করে দিল্লি দখল করেন। (আসগর[১৩], পৃ: ৪)

ঘুরিগণ ভারতীয় উপমহাদেশে ফারসির প্রসারের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। ঘুরিদের রাজত্যকালে উপমহাদেশের ইতিহাসে প্রথম মহিলা সম্রাজ্ঞী সুলতানা রাজিয়া মুলতানে ফারসি সাহিত্য চর্চার একটি প্রসিদ্ধ কেন্দ্র গড়ে তোলেন। এছাড়া এই সময়ে ইরান থেকে ব্যাপক সংখ্যক কবি সাহিত্যিক ভারতে পাড়ি জমান। মূলত ভারতবর্ষে ইসলাম প্রচারের প্রসারতা ঘুরিদের আমল থেকেই ব্যাপকতা লাভ করে। ইসলাম প্রসারের জন্য তারা অনেক মসজিদ, মাদ্রাসা ও খানকা স্থাপন করেন। এগুলো প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে ফারসি ভাষারও প্রচলন এই উপমহাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। (আমেরী[৯], পৃ: ৮)

দিল্লি দখলের পর মুহম্মদ ঘুরির শাসন ক্ষমতা তার গোলাম কুতুবুদ্দিন আইবকের হাতে ন্যস্ত করে গজনিতে প্রত্যাবর্তন করেন। সিংহাসনে অধিষ্টিত হওয়ার পর কুতুবুদ্দিন তার বিজয় অভিযান অব্যাহত রাখেন। অল্পসময়ের মধ্যেই তিনি হানসি, মিরাট, দিল্লি, রণথম্ভোর, কোইল এবং কনৌজ অধিকার করে সম্রাজ্যের বিস্তার ঘটান। তার সুযোগ্য সেনাপতি বখতিয়ার ও তার ভ্রাতুষ্পুত্র গিয়াসউদ্দিন মুহম্মদ, উত্তরাধিকার সূত্রে ঘুর সম্রাজ্যের সুলতান হলে দাসত্ব মুক্তির সনদ পাঠিয়ে দেন। (কে আলী[২৩], পৃ: ৫২) ১২০৬ খ্রিষ্টাব্দে কুতুবুদ্দিন, লাহোরে উপস্থিত হয়ে সিংহাসনে আরোহণ করেন। এভাবেই কুতুবুদ্দিন আইবকের মাধ্যমেই উপমহাদেশের ইতিহাসে স্বাধীন মুসলিম শাসনের সূচনা হয় এবং এই উপমহাদেশের রাজনৈতিক, সামাজিক, জ্ঞান, বিজ্ঞান, শিল্প-সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাসে নতুন যুগের সূচনা ঘটে।

১২০৩ খ্রিষ্টাব্দে দিল্লির সম্রাট কুতুবদ্দিন আইবকের সেনাপতি ইখতিয়ারউদ্দিন মোহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি নদিয়া ও গৌড় জয় করেন। পরবর্তীতে তিনি সমগ্র উত্তর বাংলা অধিকার করেন।

বাংলায় এই মুসলিম শাসন সামগ্রিকভাবে ইতিহাসের ঘটনাপ্রবাহকে পাল্টে দেয়। বাংলার অধিকাংশ জনগণ, বিশেষত পূর্ব বাংলার জনগণ ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়। ধীরে ধীরে সংস্কৃত ভাষার গুরুত্ব কমতে থাকে এবং ফারসি মুসলিম রাজদরবারের ভাষা হওয়ায় অত্যন্ত প্রভাবশালী ভাষা হিসেবে আবির্ভূত হয়।

বাংলার যেসব জায়গায় ইসলামের অনুসারীরা বসতি স্থাপন করে, সেসব জায়গায় ইসলামি শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে ওঠে এবং এ উদ্দেশ্যে একাধিক মসজিদ, মকতব ও মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। এর ফলে আরবি ফারসি সাহিত্যের উন্নয়নের একটি অনুকুল পরিবেশ তৈরী হয়। ধর্মীয় ও লোকায়ত উভয় ধরণের ফারসি গ্রন্থ রচনার ক্ষেত্রে এসব প্রতিষ্ঠান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তৎকালীন শাসকগণও লেখক ও কবি-সাহিত্যিকদের প্রতি উদার পৃষ্ঠপোষকতা দান করতেন। তৎকালীন বিখ্যাত শিক্ষা কেন্দ্রসমূহের মধ্যে গৌড়, পান্ডুয়া, দারাসবাড়ি, রংপুর, সোনারগাঁও, ঢাকা, সিলেট, বগুড়া এবং চট্রগ্রামের কেন্দ্রসমূহ ছিল উল্লেখযোগ্য। ইংরেজ শাসনের সূচনালগ্নে বাংলায় প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসার সংখ্যা ছিল প্রায় ৮০,০০০।

ছয়শত বছরেরও অধিককালব্যাপী (১২০৩-১৮৩৭) ফারসি ছিল বাংলার রাষ্ট্রভাষা। এই দীর্ঘ সময়ে হাজার হাজার ফারসি গ্রন্থ রচিত হয়েছে, অসংখ্য কবি ফারসি ভাষায় কাব্য রচনা করেছেন। সেসব সাহিত্যকর্ম পান্ডুলিপি অথবা প্রন্থের আকারে বাংলাসহ সমগ্র উপমহাদেশের বিভিন্ন গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে। অঠারো শতকের মধ্যভাগ থেকে উনিশ শতকের সমাপ্তিকাল পর্যন্ত সুলতানুল আখবার ও দুরবিন সহ পাঁচ-ছয়টি ফারসি দৈনিক কলকাতা থেকে নিয়মিত প্রকাশিত হতো, যা এতদঞ্চলে ফারসি ভাষার জনপ্রিয়তা প্রমান করে। (বাংলা পিডিয়া[৪৭], ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃ:১৩৫-১৪২)

এভাবে পৃথিবীর বিভন্ন প্রান্তে ফারসি সাহিত্যের দ্যুতি ছড়িয়ে পরে। এই সূদীর্ঘ পথ চলায়, রচিত হয়েছে ফারসি সাহিত্যের অমূল্য ভান্ডার যা জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-সাহিত্য, গল্প ও কবিতার রত্নরাজিতে সমৃদ্ধ। আরবি সাহিত্যের মত ফারসি সাহিত্যের কাব্য শাখাই বেশি সমৃদ্ধ এবং বিস্তৃত। প্রেম, মানবতা, নৈতিকতা, আধ্যাত্মিকতা, জ্ঞান, বিজ্ঞান, দর্শন প্রতিটি বিষয়ে রচিত হয়েছে দীপ্তিময় কবিতা গুচ্ছ,যা দিনের পর দিন কাব্যপ্রেমিকদের আত্মার খোরাক যুগিয়েছে। সমাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট পরিবর্তনের সাথে সাথে যুগের চাহিদা অনুযায়ী কবিতার ধরণও পরিবর্তিত হয়েছে। যুগে যুগে বদলে গেছে এর রূপ ও প্রকৃতি। চিরায়িত ধারার ফারসি কবিতায় যেমনি ভাবে জন্ম নিয়েছিলেন ফেরদৌসি, হাফিজ, রুমি, সা'দী ও খৈয়ামের মত জগত বিখ্যাত কবিগণ, তেমনি ভাবে সেই ধারাকে অব্যাহত রেখে, সমকালীন যুগেও, নিমা ইউশিজ, মাহদি আখভানে ছালেছ, সোহরাব সেপাহরি, পারভিন এ'তেসামি, তাহেরা সাফার যাদেহ, আহমাদ শামলু ও শাহরিয়ারের মত জগৎ বিখ্যাত কবিরা, আধুনিক ফারসি কবিতার জগত কে আলোকিত করেছেন । কাসিদা, গযল, মাসনাভি, রুবায়ি, দে-বেইতি, প্রভৃতি কবিতার পাশাপাশি মুক্ত কবিতা ও গদ্য কবিতার মাধ্যমে ফারসি সাহিত্যে আধুনিক কবিতার দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন। আধুনিক ফারসি কবিতাকে যারা অনেক দুর এগিয়ে নিয়ে গেছেন, তাদের মধ্যে শাহরিয়ারের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি ফারসি সাহিত্যে আধুনিক গযলের দৃষ্টান্ত তৈরি করেন। শাহরিয়ারের কবিতা ও কবিতার বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করার আগে তার সম্পর্কে আলোকপাত করা প্রয়োজন।

শাহরিয়ারের জীবনী :

১২৮৫ হি: শা:/ ১৯০৬ খিষ্টাব্দে তিনি তাবরিযে জন্মগ্রহণ করেন।[র] পিতা 'হাজি মির ওগা খোসগোনাবি' (শাহরিয়ার[৬৬], ভূমিকা, পৃ: ১৯) 'কারেহচামান' জেলার কাছে অবস্থিত 'খোসগোনাব' গ্রামের বিখ্যাত সাইয়্যেদ বংশের সন্তান ও তাবরিজের বিচার বিভাগের সিনিয়র উকিল ছিলেন। এছাড়াও আযারবাইজানের কোর্টের সিনিয়র উকিল হিসেবে কিছুদিন কাজ করেন। (মোহাম্মদি[৫৩], পৃ: ১৪) একজন নম্র, ভদ্র, সংস্কৃতিমনা ও সুলেখক হিসেবে হাজি মির ওগার বেশ সুনাম ছিল। ১৩১৩ হি: শা:/ ১৯৩৪ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ইন্তেকাল করেন এবং 'কোমে' তাকে দাফন করা হয়। শাহরিয়ারের মা ছিলেন 'কাওকাব খানম', তিনি 'খানম নানে' নামেও পরিচিত ছিলেন। একজন দ্বীনদার ও ধর্মভীরু নারী হিসেবে সবার কাছে প্রসিদ্ধ ছিলেন। শাহরিয়ারের শৈশবকাল মা বাবার স্নেহছায়ায় অতিবাহিত হতে থাকে। (কাভইয়ানপুর[২১], পৃ: ৫)

শাহরিয়ারের পুরো নাম 'সাইয়্যেদ মুহাম্মদ হোসাইন বেহজাত তাবরিযি'। (শাহরিয়ার[৬৬], পৃ: ১৯) 'শাহরিয়ার' কাব্যনাম। যদিও প্রাথমিক জীবনে কাব্যনাম হিসেবে 'বেহজাত' নির্বাচন করেন কিন্তু পরবর্তী জীবনে কাব্যনামের ব্যাপারে ফালে হাফিযের[রর] সাহায্য নেন। সেক্ষেত্রে ফালে হাফিজের ফলাফলে নিম্নোক্ত কবিতাটি উঠে আসে :

كه چرخ سكة دولت به نام شهريان زد
روم به شهر خود و شهريار خود باشم

(শাহরিয়ার[৬৬], পৃ: ১৯)

উচ্চারণ ঃ

কে চোরখ সেক্কেয়ে দওলাত বেনা'মে শাহ্রইআরান যাদ,

রাভাম বে শাহরে খোদ ভা শাহরিয়া'রে খোদ বশাম ॥

অর্থ ঃ

যেহেতু ভাগ্যের চাকা রাষ্ট্রীয় মুদ্রায় বাদশাদের নাম অঙ্কিত করলো,

তাই আমি নিজের শহরে যাব এবং নিজের বাদশা নিজেই হবো ॥

উপরোক্ত বেইতের 'শাহরিয়ার' শব্দটির জন্য পরবর্তীতে কাব্যনাম হিসেবে 'শাহরিয়ার' নির্বাচন করেন।

শৈশবে তাবরিজে অবস্থানকালীন সময়ে ইরানে সাংবিধানিক বিপ্লব শুরু হলে শাহরিয়ারের বাবা তাকে পৈত্রিক গ্রামে পাঠিয়ে দেন। সেখানে 'সঙ্গুলাবাদ' ও 'কেইস কোরশাক' গ্রামে কিছুদিন অবস্থান

[i] যদিও কবি তার পরিচয়পত্রে ১৩৮৩ হিঃ শাঃ কে জন্ম সাল হিসেবে উলেণ্টখ করেছেন, কিন্তু উপযুক্ত প্রমান দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, কবির জন্ম সাল হলো ১৩৮৫ হিঃ শাঃ

[ii] ইরানিরা কোন কাজের ভাল মন্দ জানার জন্য অথবা কোন ব্যাপারে সিদ্ধান্ড় নেওয়ার জন্য ফালে হাফেযের সাহায্য নেন। অর্থাৎ দিভানে হাফেয থেকে লটারির মাধ্যমে যে কোন একটি গযল নির্বাচন করেন। তাদের বিশ্বাস সেই গযলের যে কোন বয়াতের মধ্যে সে কাজের ফলাফলের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

করেন। পরবর্তীতে নিজস্ব পৈত্রিক আবাসন 'কারেহচামানের' 'খোশগোনাবে' ছয় বছর বয়স পর্যন্ত অবস্থান করেন। শৈশবের এই গ্রাম্য পরিবেশ কবির মনে চমৎকার কিছু স্মৃতির জন্ম দেয়, যাকে কেন্দ্র করে, ১৯৫১-১৯৫৩ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে তুর্কি ভাষায় বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ 'হায়দার বাবায়ে সালাম' রচনা করেন। সেখানেই স্থানীয় মক্তবে 'মোল্লা মোহাম্মদ বাকের' ও 'মোল্লা ইব্রাহিমের' কাছে ক্বোরআনুল করিম পড়তে শেখেন এবং একই সাথে বাবার কাছে গুলিস্তানে সাদি, নেসাবুস সাবয়িয়ান, ও দিভানে হাফিয পড়ার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা আরম্ভ করেন। শৈশব থেকেই তার কাব্য প্রতিভা প্রকাশ পায়। মাত্র চার বছর বয়সে গৃহ পরিচারিকা রোকেয়া খানমের উদ্দেশ্যে তুর্কি ভাষায় নিম্নোক্ত কবিতাটি লেখেন :

روقيه باجي باشمين تاجي
آتي آت ايته منه وير كته

(সারুতিয়ান[৭১], পৃ: ৫৮)

উচ্চারণ ঃ

রোক্বেয়া বা'জী বা'শেমীন তা'জী,
অ'তি অ'ত ইতে মানে ভীরকুতে ॥

অর্থ ঃ

বোন রোকেয়া, তুমি আমার মাথার তাজ,
গোস্তগুলো কুকুরকে দিয়ে আমাকে শুধু সেদ্ধ ভাত দাও ॥

প্রথম কবিতা লেখা :

মাত্র নয় বৎসর বয়সে তিনি ফারসি ভাষায় কবিতা লিখতে শুরু করেন। সৌভাগ্যক্রমে সেই সময়ের লেখা তিনটি বেইত এখনো পাওয়া যায়। একবার শাহরিয়ারের মা তার উপর রাগ করলে, মাকে খুশি করতে গিয়ে তিনি নিম্নোক্ত কবিতাটি লিখেন :

من گنه كار شدم واي به من
مردم آزار شدم واي به من
ياد دارم پدرم شيشة مي ديد شكست
من چرا سبحة اجدادي خود داده ز دست
پي زنار شدم واي به من
مردم آزار شدم واي به من

(সারুতিয়ান[৭১], পৃ: ৫৮)

উচ্চারণ ঃ

মান গুনাহ কা'র শুদাম ভ'ই বে মান,

মারদুম অ'যার শুদাম ভ'ই বে মান।

ইয়া'দ দা'রাম পেদারাম শীশেয়ে মেই দীদ শেকাস্ত,

মান চেরা' সাবহেয়ে আজদাদীয়ে খোদ দা'দে যে দাস্ত।

পেই যেন্না'র শুদাম ভয়াই বে মান,

মারদুম অ'যার শুদাম ভ'ই বে মান ॥

অর্থ ঃ

হায়রে কপাল, আমি গোনার কাজ করে ফেললাম,

হায়রে আফসোস, মানুষের কষ্টের কারণ হলাম।

মনে আছে আমার বাবা মদের পেয়ালা দেখলে ভেঙ্গে ফেলতেন,

কেন আমি আমার পূর্ব পুরুষদের দোয়া হাত ছাড়া করলাম।

হায়রে কপাল আমি সেই মদের পেয়ালার পিছনে ছুটলাম,

হায়রে আফসোস আমি মানুষের কষ্টের কারণ হলাম ॥

১২৯১ হি: শা:/ **১৯১২** খ্রিষ্টাব্দে তিনি পূণরায় তাবরিযে ফিরে আসেন। তাবরিযের 'মোত্তাহেদে' ও 'ফেইযিয়া' মাদরাসায় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা লাভ করেন। পরবর্তীতে 'তালেবিয়া' মাদরাসায় আরবি সাহিত্য সম্পর্কে ধারণা লাভ করেন। সেখানে 'জামেউল মাকা'মাত, 'মাকা'মাতে হারিরি' ও 'হুমাইদি' প্রভৃতি বই সমাপ্ত করেন। বাসায় বিশেষ শিক্ষকের মাধ্যমে ফারাসি ভাষাও আয়ত্ব করেন। সেই বয়সেই তাবরিযের একজন তরুণ কবি হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন এবং প্রথম বারের মত তার কবিতা 'বেহজাত' কাব্যনাম সহ তাবরিযের 'আদব' পত্রিকায় ছাপা হয়।

প্রেমের সূচনা :

১২৯৯ হি: শা:/ **১৯২০** খ্রিষ্টাব্দে শাহরিয়ার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পড়া শেষ করেন এবং সেই বছরের এসফান্দ[i] মাসে চাচার সাথে তেহরানে চলে আসেন, সেখানে 'দার আল-ফুনূন' উচ্চ বিদ্যালয়ে মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য ভার্তি হন। 'দার আল-ফুনূনে' অবস্থানকালীন সময়ে 'আবুল হোসেন সাবা' ও 'আমির ফিরোয কুহির' সাথে পরিচিত হন। এই সময়েই দিভানে হাফিযের ফালের সাহায্যে তার কাব্যনাম পরিবর্তন করে, বেহযাতের পরিবর্তে শাহরিয়ার রাখেন (পৃ- ২ এর দ্রষ্টব্য)। **১৩০৩** হি: শা:/ **১৯২৪** খ্রিষ্টাব্দে 'দার আল-ফুনূনে' পড়া শেষ করে, পিতার নির্দেশে মেডিকেল কলেজে এম, বি, বি, এস কোর্সে ভর্তি হন। এম, বি, বি, এস, কোর্সে পড়া কালীন সময়ে সুরাইয়া নামের এক অনিন্দ্য সুন্দরীর প্রেমে পড়েন। সুরাইয়া সেনাবাহিনীর কর্নেলের মেয়ে ছিলেন। অসাধারণ রূপের কারণে শাহরিয়ার তাকে

[i] ইরানি বর্ষ পঞ্জিকার দ্বিতিয় মাস।

পরি বলে ডাকতেন। (সারুতিয়ান[৭১], পৃ: ৬২) পরিকে নিয়ে তিনি অনেক কবিতা লিখেছেন। এই প্রণয়ের শুরুতে কবি ও সুরাইয়ার মধ্যে কোন সমস্যা ছিলনা, কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই প্রণয় করুণ পরিনতির দিকে গড়ায়। শাহরিয়ারের ভাষ্য অনুযায়ী সুরাইয়ার বাবা-মা তাদের এই সম্পর্কের কথা জানতেন এবং শাহরিয়াকে তারা অনেক পছন্দ করতেন। তিনি বলেন :

پدر و مادر پري سخت به من علاقهمند بودنذ، به طوري كه بارها با يكديگر سر سفره غذا خورده بوديم و از عشق و علا قه ام نيز با خبر بودند(সারুতিয়ান[৭১], পৃ: ৬২)

উচ্চারণ ঃ

পেদা’র ও মা’দারে পারী সাখ্‌ত বে মান আলাক্বেমান্দ বুদান্দ, বে ত্বোরী কে বা’রহা’ বা’ একদিগার সারে সোফরে গাযা’ খুরদে বুদীম ভা আয এশক্ব ও আলাক্বে আম বা’ খবর বুদান্দ।

অর্থাৎ ঃ

Ôcwii evev, gv Avgvi cwZ Le AvMÖn wQ‡jb| Avgiv A‡bKevi GKmv‡_ GKB ‘¯ÍiLv‡b Lvevi †L‡qwQjvg| (cwii cwZ) Avgvi ‘ejZv I Avgv‡‘i †cg m¤ú‡K Zviv Rvb‡Zb|Õ

সুরাইয়াকে নিয়ে শাহরিয়ারের জীবনে অনেক ঘটনা ঘটেছে, প্রায় প্রতিটি ঘটনা নিয়েই তিনি কবিতা লিখেছেন। তেমনি একটি ঘটনা ছিল এরকম :

ÔGKevi Mx®§Kv‡j †Zniv‡b Le wei³Ki Mig c‡owQj| cix Avgv‡K ej‡jv : K‡jR †_‡K K‡qK w‘‡bi QwU wb‡q P‡jv, ÔBjv‡KÕ evevi KvQ †_‡K †ewo‡q Avwm| AšÍZ K‡qKw‘‡bi Rb¨ GB Mig †_‡K gy³ cve| Awg †mmg‡q Le e¨v¯Í wQjvg, ZvB †Kvb fv‡eB QwU wb‡Z cvijvg bv| Awb”Qv m‡ZI cix‡K we‘vq w‘jvg| cix P‡j hvIqvi ci Awg Aw¯i n‡q cojvg| evi evi cixi K_v g‡b cowQj| †Kvb Kv‡RB gb emv‡Z cviwQjvgbv| eÜzi Avgvi Ae¯v †‘‡L mvšÍbv w‘‡Z _vKj| †kl chšÍ Avgvi QwUi ‘iLv¯Í wb‡q Aa¨‡¶i Kv‡Q †Mj| Avgv‡‘i †cg I Avgvi eZgvb Ae¯v m¤ú‡K Aa¨¶‡K ewS‡q ej‡jv| Aa¨¶ mewKQ ï‡b Avgvi Ae¯v eS‡jb Ges Avgvi Rb¨ QwU gÄi Ki‡jb| QwU †c‡qB ÔBjv‡KiÕ c_ aijvg| hLb cwii evmvq †cšQvjvg ZLb Mfxi ivZ n‡q †M‡Q| cwii N‡ii Rvbvjvq ZL‡bv Av‡jv RjwQj| I ZLb Rvbvjvi av‡i †mZviv wb‡q e‡m Avgvi †kLv‡bv GKwU Mv‡bi †iIqvR KiwQj| G ‘k¨ †‘‡L Awg †Pv‡Li cwb a‡i ivL‡Z cvijvg bv| c‡KU †_‡K GK UK‡iv KvMR †ei K‡i wb‡Pi KweZwU wj‡L †djjvg Ges wPrKvi K‡i co‡Z ïiæ Kijvg :

باز كن نغمه ي جان سوز از آن ساز امشب

تا كني عقده ي اشک از دل من باز امشب
ساز در دست تو سوز دل من مي گويد
من هم از دست تو دارم گله چون ساز امشب
مرغ دل در قفس سينه ي من مي نالد
بلبل ساز تورا ديده هم آواز امشب
(শাহরিয়ার[৬৬], পৃ: ৯৬)

উচ্চারণ ঃ

বা'য কোন নাগ্মেয়ে জা'ন সুয আয অ'ন সা'যে এমশাব,
তা' কোনী আক্বদেয়ে আশ্ক আয দেলে মান বা'য এমশাব।
সা'য দার দাস্তে তো সূযে দেলে মান মী গুয়াদ,
মান হাম আয দাস্তে তো দা'রাম গেলেহ চোন সা'যে এমশাব।
মোরগে দেল দার ক্বাফাসে সীনেয়ে মান মী না'লাদ,
বুলবুলে সা'যে তো রা দীদে হাম অ'ভাযে এমশাব ॥

অর্থ ঃ

আজ রাতে তোমার বাদ্যযন্ত্র থেকে যে হৃদয় জ্বালানো সুর ছড়িয়ে দিলে,
(সেই সুরে) এই রাতে আমার হৃদয় থেকে সব বেদনাশ্রু ঝরিয়ে দিলে।
তোমার হাতের বাদ্যযন্ত্র যেন আমার হৃদয়ের যন্ত্রনার কথাগুলো বলছে,
রাতের বাদ্যযন্ত্রের সুরের মত তোমার কাছে আমারও কিছু অনুযোগ আছে।
আমার হৃদয় পাখি বুকের খাচায় আর্তনাদ করছে,
তোমার গানের বুলবুলিকে দেখে আজ রাতে এই গান গাচ্ছে ॥

Avgvi KÚ ï‡b cix Pg‡K DVj, Rvbvjvi av‡i G‡m jwd‡q Avgvi †Kv‡j bvg‡Z PvBj| Awg I‡K I fv‡e bvg‡Z wb‡la Kijvg| cwi wb‡P †b‡g G‡m, Avgv‡K evmvi wfZ‡i wb‡q †Mj Ges Ii evev-gvi mv‡_ cwiPq Kwi‡q w'j| evmvq ZLb cwii evevi K‡qKRb eÜ G‡mwQ‡jb| Awg Zv‡'i mv‡_ e‡m K_v ej‡Z ïiæ Kijvg| wKš wKQ‡ZB †mB AvÇvq gb emv‡Z cviwQjvg bv| g‡b g‡b ïa fvewQjvg, KLb GB Avmi fvO‡e Avi Awg Mí Kivi Rb¨ cwi‡K GKvšÍ fv‡e

Kv‡Q cve| cwii gv Avgvi g‡bi Ae¯v eS‡Z cvi‡jb I md‡ii Kwš Íi QZvq Avgv‡K †mLvb †_‡K †ei K‡i cwii Kv‡Q wb‡q Avm‡jb| (সারুতিয়ান[৭১], পৃ: ৬৬-৬৮)

প্রেমে ব্যার্থতা :

এভাবে সুরাইয়ার সাথে শাহরিয়ারের সম্পর্ক বেশ ভালো ভাবেই চলছিল। ১৩০৮ হি: শা:/ ১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দে এম, বি, বি, এস ফাইনাল পরীক্ষা শেষ করে, যখন হাসপাতালে ইন্টারনি করছিলেন, সে সময়ে শাহরিযার বুঝতে পারলেন, সুরাইয় কেমন যেন বদলে গেছে। আগের মত আর দেখা করতে আসে না। কথাও বলতে চায় না। একবার দুই সপ্তাহ পার হয়ে গেলেও পরি আসে নি। তখন শাহরিয়ার هواي رشت বা বোনা বাতাস শিরোনামের এই কবিতাটি লিখেন :

دو هفته رفت و هنوز آن مه دو هفته نيامد
برشته گشت دل و آن به رشت رفته نيامد
چو گل به وعده ي يک هفته رفته خدايا
چه شد که وعده ي يک هفته شد دو هفته نيامد
بهار آمد و گلدان من شکفت در ايوان
ولي بهار من آن گلبن شکفته نيآمد

(শাহরিয়ার[৬৬], পৃ: ১৯৯)

উচ্চারণ ঃ

দো হাফতে রাফ্ত ভা হানূয অ'ন মা'হে দো হাফতে নাইঅ'মাদ,
বেরেশ্তে গাশ্ত দেল ভা অ'ন বে রাশ্ত রাফতে নাইঅ'মাদ।
চো গোল বে ভা-দেয়ে এক হাফতে রাফত খোদা' ইয়া,
চে শোদ কে ভা-দেয়ে এক হাফতে শুদ দু হাফতে নাইঅ'মাদ।
বাহা'র অ'মাদ ভা গোলদা'নে মান শেকোফতে দার এইভা'ন,
ভালী বাহা'রে মান অ'ন গোলবানে শেকোফতে নাইঅ'মাদ ॥

অর্থ ঃ

দুই সপ্তাহ পার হয়ে গেল কিন্তু ঐ দুই সপ্তাহের চাঁদ এখনো এলো না,
হৃদয় পুড়ে অঙ্গার হয়ে গেছে, সে চলে গেল আর ফিরে এলো না।
হায় খোদা, এক সপ্তাহের ওয়াদা দিয়ে ফুল বিদায় নিল,
এমন কি হলো এক সপ্তাহের ওয়াদা দিয়ে দুই সপ্তাহ এলো না।

বসন্ত এসে গেল সদর দরজার ফুলদানিতে প্রষ্ফুটিত হল ফুল,

কিন্তু আমার বসন্তকাল আর প্রষ্ফুটিত ঐ গোলাপ গুচ্ছ আজো আসল না ॥

সুরাইয়া কেবলমাত্র শাহরিয়ারের প্রেমিকাই ছিলনা বরং তার খুব ভাল বন্ধুও ছিল। সুরাইয়ার এই আচরণ তিনি কোনভাবেই মেনে নিতে পারছিলেন না। একদিন সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে জানতে পারলেন সুরাইয়া এসেছিল। কিছুক্ষণ তার জন্য অপেক্ষা করে চলে গেছে এবং বলে গেছে: ''রাতে ফিরে এসে এক ঘন্টার জন্য হলেও দেখা করে যাবে"। কিন্তু যাওয়ার সময় সুরাইয়ার যে জামাটি ছিল সেটি নিয়ে গেছে। শাহরিয়ার সুরাইয়ার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। রাত গভীর হতে থাকল । গৃহ পরিচারিকা 'লালে খানম' ঘরের প্রদীপ জ্বালিয়ে দিলেন। শাহরিয়ার বললেন : ''ঘরের জানালা গুলো সব খুলে দাও, আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে''। 'লালে খানম' ঘরের দরজা জানালা সব খুলে দিলেন। হঠাৎ দমকা হাওয়া এসে প্রদীপটি নিভিয়ে দিল। 'লালে খানম' প্রদীপ জ্বালাতে গেলে শাহরিয়ার বললেন : ''প্রদীপ জ্বালানোর দরকার নেই, যদি পরি আসে তাহলে আমি নিজেই জ্বালিয়ে নিব। সে রাতে শাহরিয়ারের ঘরের প্রদীপ আর জ্বলেনি, কারণ কথা রাখেনি পরি, সে আর কখনই ফিরে অসেনি। শাহরিয়ার সারা রাত জেগে কাটালেন, ভোরের দিকে بوي پيراهن বূয়ে পীরাহান বা কাপড়ের গন্ধ শিরোনামের কবিতাটি লিখে ফেলেন। যার কয়েকটি ছত্র ছিল নিম্নরূপ :

به بوي زلف تو جان و عده داده ام اينكه

چراغ عمر نهادم برهگذار نسيم

حديث روي تو من گفت لاله با دل

كه داغ دل كندم تازه ياد عهد قديم

(শাহরিয়ার[৬৬], পৃ: ৩৩৩)

উচ্চারণ ঃ

বে বূয়ে যোলফে তো জা'ন ভা-দেহ দা'দেহ আম ইনকে,

চেরা'গে উমর নেহা'দাম বে রাহগোযা'রে নাসীম।

হাদীসে রূয়ে তো মান গোফত লা'লে বা' দেল,

কে দা'গে দেল কানদাম তা'যে ইয়া'দে আহদে কাদীম ॥

অর্থ ঃ

তোমার চুলের সুগন্ধের কাছে এই ওয়াদা দিয়েছি প্রিয়,

এই জীবন প্রদীপ, ঐ চলে যাওয়া পথের, বয়ে যাওয় বাতাসে আজীবন মেলে রাখব।

তেমার মুখচ্ছবি যেন (কাল সারারাত) হৃদয়ের কানে কানে কথা বলছিল,

পুরোনো দিনের স্মৃতিতে, হৃদয়ে যন্ত্রনার দাগ নতুন করে অঙ্কন করেছি ॥

সুরাইয়ার এই আচরণের মূল কারণ ছিল, রেজা শাহ পাহলভির দরবারের তরুণ মন্ত্রী ‘আব্দুল হোসাইন তৈইমুরতাশ’। সে সুরাইয়ার রূপে মূগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। যে কোন উপায়েই হোক সুরাইয়াকে বিয়ে করতে চাচ্ছিল। তৈইমুরতাশ শাহরিয়ারের বিষয়টি জানত। এক পর্যায়ে সে শাহরিয়ার কে হত্যা করে তার পথের কাটা সরিয়ে দিতে চাচ্ছিল। কিন্তু সুরাইয়ার মায়ের জন্য সে যাত্রায় শাহরিয়ার প্রাণে বেঁচে যান। তবে শর্ত হিসেবে চিকিৎসা বিজ্ঞানের পড়া ছেড়ে দিয়ে তেহরান থেকে চলে যেতে হয়। শাহরিয়ার ঘটনাটি এভাবে বলেছেন :

ÒÒ1308 wn: kv:/ 1929 wLÓv‡ã Gg, we, we, Gm dvBbvj cix¶v †kl K‡i ÔAveÿvmvev‘Õ †iv‡Wi †mbvewnbxi nvmcvZv‡j B›Uvibx KiwQjvg| GKw‘b nvmcvZv‡ji cwiPvjK Avgv‡K Zvi K‡¶ †W‡K cvVv‡jb| i/‡g X‡K †‘Ljvg wZwb Aw¯ifv‡e cvqPwi Ki‡Qb| Zv‡K †ek wPwšÍZ g‡b nw”Qj| †mbvewnbxi GKRb †gRil †mLv‡b wQ‡jb| cwiPvjK Avgv‡K †‘‡L ej‡jb : ÒÒ†Zvgv‡K †gRi mv‡n‡ei mv‡_ †h‡Z n‡e, nqZ †Zvgvi mv‡_ Ibvi we‡kl †Kvb ‘iKvi Av‡QÕÕ| †gRi mv‡ne Avgv‡K †mLvb †_‡K mivmwi †Zniv‡bi Ô†‘vRevbÕ KvivMv‡i wb‡q †M‡jb| Avwg †RjLvbvq ew›‘ n‡q †Mjvg| ‰ZgiZvk Avgv‡K †g‡i †djvi wb‡‘k w‘‡qwQj| wKš cwii gv‡qi Kvi‡Y Avgv‡K gviv n‡jv bv| wZwb ej‡jb : ÒÒGB wb‡‘vI †Q‡jwU wK K‡i‡Q? †Kvb Aciv‡a Zvi m‡_ GB AvPiY Ki‡Qv| Zv‡K nZ¨v Kiv n‡j, GB Awfkv‡c Avgiv mevB †kl n‡q hveÕÕ| †kl chšÍ, GB k‡Zi Dci Avgv‡K gw³ †‘Iqv n‡jv †h, Awg †Znivb †Q‡o wPiZ‡i P‡j hv‡evÕÕ । (সারুতিয়ান[৭১], পৃ: ৬৮-৬৯)

সাত বছর এম, বি, বি, এস পড়ার পর ফাইনাল পরীক্ষার মাত্র তিনমাস বাকি থাকতে প্রেম সংক্রান্ত এই জটিলতার কারণে তিনি পড়ালেখা ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। আজীবন এই প্রেমের স্মৃতি শাহরিয়ার কে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। এই প্রেম নিয়ে তিনি অনেক কবিতা লিখেছেন। কখনো কখনো এই প্রেম কে তিনি স্বপ্ন ও বক্রতার ঢেউ বলে উল্লেখ করেছেন। যেমন এক জায়গায় বলেন :

افسانه ي عمرم آرد خواب

عمري كه نبود خواب ديدم

در سيل گذشت روزگاران

امواج به پيچ و تاب ديدم

(শাহরিয়ার[৬৬], পৃ: **১২**)

উচ্চারণ ঃ

আফসা‘নেয়ে ওমরাম অ’রাদ খা’ব,

ওমরীকে নাবুদ খা’ব দীদাম।

দা’র সেইল গোযাশত রুযেগা’রা’ন,

আমওয়াজ বে পীচ ও তা'ব দীদাম ॥

অর্থ ঃ

আমার জীবনের কল্পকাহিনি স্বপ্নের মত মনে হয়,

জীবনতো ছিলনা যেন স্বপ্ন দেখেছি।

অতীত দিনগুলোর স্রতধারায়,

জটিলতা ও বক্রতার ঢেউ দেখেছি ॥

তার نالة نا كامي বা অসিদ্ধ আর্তনাদ গযলে বলেন :

برو اي ترک که ترک تو ستمگر کردم
حيف از آن عمر که در پاي تو من سر کردم
عهد و پيمان تو با ما و وفا با دگران
ساده دل من که قسم هاي تو باور کردم

(শাহরিয়ার[৬৬], পৃ: ২৯৬)

উচ্চারণ ঃ

বোরো এই তোরক কে তোরকে তো সেতামগার কারদাম,

হেইফ আয অ'ন উমর কে দার পা'য়ে তো মান সার কারদাম।

আহদ ও পেইমা'নে তো বা' মা' ও ভাফা বা' দেগারা'ন,

সা'দে দেল মান কে কাসাম হায়ে তো বা'ভার কারদাম ॥

অর্থ ঃ

চলে যাও হে তুর্কি সুন্দরী, তোমাকে ছেড়ে দিয়ে আমি অন্যায় করেছি,

জীবনে সেই সময়ের জন্য আফসোস যা তোমার পায়ে বিষর্জন দিয়েছি।

আমাদের সাথে তোমার কত প্রতিজ্ঞা ও অঙ্গিকার আর অন্যান্যদের প্রতি তোমর বিশ্বস্ততা,

আমি এতই সরল মনা ছিলাম যে তোমার শপথ গুলোকে বিশ্বাস করেছি ॥

পরবর্তী জীবনে সুরাইয়াকে করুণ পরিণতি বরণ করে নিতে হয়। বিয়ের কয়েক বছরের মধ্যেই তৈমুরতাশ নিহত হয়। এরপর তিনি রেজা শাহের ভাতিজা চেরাগ আলি খান কে বিয়ে করেন। কিন্তু ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস, চেরাগ আলি খানও নিহত হয়। এরপর সুরাইয়া তার বাবার বাড়িতে ফিরে আসেন। ১৩১৫ হি: শা:/ ১৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দে শাহরিয়ার যখন কৃষি ব্যাংকে চাকরি করছিলেন, সুরাইয়া তার সাথে দেখা করতে আসেন। পূর্বের জীবনের ভুল স্বীকার করে সুরাইয়া বলেন :

به خدا قسم من تقصير ندارم، من هرگز نمي خواستم از تو جدا شوم، مرا با زور و تهديد وا دار كردند، من تا عمر دارم تو را فراموش نمي كنم و با تمام وجود ترا مي خواهم، تو هميشه در قلب مني، ما يلم به عقد ازدواز تو در آيم (سারুতিয়ান[৭১], পৃ: ৮৪)

অর্থাৎ ঃ আল্লাহর শপথ করে বলছি আমার কোন দোষ ছিল না, আমি কখনোই তোমার থেকে আলাদা হতে চাইনি, আমাকে জোর করে বাধ্য করা হয়েছে। যতদিন এ জীবন আছে তোমাকে কোনদিন ভুলব না। আমার সমস্ত অস্তিত্ব জুড়ে শুধু তোমাকেই চাই। সবসময় আমার হৃদয় জুড়ে শুধু তুমিই আছ। আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই।

সুরাইয়ার কথার জবাবে হাফিজের এই কবিতাটি বলে তিনি তাকে ফিরিয়ে দেন :

من از بيگانگان ديگر ننالم
كه با من هرچه كرد آن آشنا كرد
گر از سلطان طمع كردم خطا بود
و از دلبر وفا جستم جفا كرد

(সারুতিয়ান[৭১], পৃ: ৮৪)

উচ্চারণ ঃ

মান আয বিগা'নেগা'ন দীগার নানা'লাম,
কে বা' মান হারচে কারদ অ'ন অ'শেনা' কারদ।
গার আয সুলতা'ন তমা- কারদাম খাত্বা' বুদ,
ভা আয দিলবারান ভাফা' জুস্তাম জাফা' কারদ ॥

অর্থ ঃ

আমি অনাত্মীয় ছাড়া অন্য কারো জন্য কাদিনা,
কারণ আমার সাথে যত (অন্যায়) পরিচীতরাই করেছে।
যদি বাদশার কাছে লোভ করে কিছু চেয়েছি তবে তা ছিল ভূল,
আর যদি প্রিয়তমার কাছে বিশ্বাস চেয়েছি তবে সে কষ্ট দিয়েছে ॥

প্রথম কাব্যগ্রন্থ :

১৩১০ হি: শা:/ ১৯৩১ খ্রিষ্টাব্দে শাহরিয়ারের প্রথম কাব্যগ্রন্থ মালেকুশ্ শুয়ারায়ে বাহার, সাঈদ নাফিসি, ও পুজমান বাখতিয়ারের ভূমিকা সহ প্রকাশিত হয়। এই বছরেই প্রেমে ব্যার্থতার পর তিনি

তেহরান ছেড়ে মাশহাদে চলে যান, সেখানে নিশাপুর ও মাশাদের ভূমি রেজিষ্ট্রি অফিসে দলিল লেখক হিসেবে দুই বছর কাজ করেন। এই সময়ে বিশিষ্ট চিত্র শিল্পী কামালুল মুলকের সাথে কবির পরিচয় ঘটে এবং 'যিয়রাতে কামালুল মুলক' নামক মাসনাভি রচনা করেন। ১৩১২হিঃ শাঃ/ ১৯৩৩ খ্রিষ্টাব্দে তিনি মাশাদে স্থানান্তরিত হন, সেখানে মোহাম্মদ,ফররুখ, গোলশান অযারি, মিরযা খান আকিলি প্রমুখ প্রসিদ্ধ সাহিত্যিকদের সাথে পরিচিত হন এবং শাপুর সাহিত্য সমিতিতে যোগদান করেন। 'বামদাদে ঈদ' মাসনাভিটি তিনি এই সময়ে রচনা করেন।

পিতার মৃত্যু :

১৩১৩ হিঃ শাঃ/ ১৯৩৪ খ্রিষ্টাব্দে রমযান মাসের শবেকদরের রাতে, ফজরের আযানের দুই ঘন্টা আগে হার্ট এ্যাটাকে শাহরিয়ারের বাবা ইন্তেকাল করেন। শাহরিয়ার বলেন :

"†mB iv‡Z Avwg †Lvivmv‡bi Mvg AÂ‡j Ae¯vb KiwQjvg, iv‡Z ¯‡c †'Ljvg, evev AvKv‡ki Dci 'wo‡q Av‡Qb, Pv‡'i Av‡jv Zvi eK chš Í †X‡K †i‡L‡Q, wZwb nvmwQ‡jb, Zvi nwmi kã Dc‡ii w'‡K D‡V hw"Qj| Ng †_‡K D‡VB w' fv‡b nv‡dh †_‡K dvj wbevPb Kijvg| dv‡j wb‡Pi †eBZwU DVj :

روز هجران وشب فرقت يار آخر شد
زدم اين فال و گذشت اختر و كار آخر شد
آن همه ناز و تنعم كه خزان مي فرمود
عاقبت در قدم باد بهار آخر شد

(শিরাজী[৬৮], পৃ: ২২৩, গজল ১৬৬)

উচ্চারণ ঃ

রুযে হেজরা'ন ও শাবে ফেরক্বাতে ইয়া'র অ'খের শোদ,
যাদাম ইন ফা'ল ও গোযাশতে আখতার ও কা'র অ'খের শোদ।
অ'ন হামে না'য ও তানা-ওম কে খাযা'ন মী ফারমূদ,
অ'ক্বেবাত দার ক্বাদামে বা'দে বাহা'র অ'খের শোদ ॥

অর্থ ঃ

প্রিয়তমার বিরহের দিন আর বিচ্ছেদের রাত শেষ হলো,
এই ভাগ্য গণনা, তারকার আবর্তন ও কর্মব্যস্ততা শেষ হলো।
হেমন্তের দিয়ে যাওয়া সব লাজুকতা আর বিলাসিতা,
বসন্তের ঝড়ো বাতাসে তার পরিসমাপ্তি ঘটল ॥

ciw‘b mKv‡j †Uwj Mv‡d evevi gZ¨i Lei †cjvg| (কাভইয়ানপুর, পৃ: ৫৩-৫৪)

কোমে তাকে দাফন করা হয়। বাবার মৃত্যুতে শাহরিয়ার মানসিক ভাবে খুব ভেঙে পরেন। তিনি বলেনঃ

بابا بمرد و خانه ي ما هم خراب شد[র]

অর্থাৎ বাবা মারা গেলেন, আমাদের ঘরের অবস্থাও খারাপ হলো

বাবার মৃত্যুর পর ১৩১৪ হি: শা:/ ১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দে তিনি মায়ের সাথে তেহরানে ফিরে আসেন। বাবার মৃত্যুর শোক কাটতে না কাটতে বড় ভাই ‘সাইয়্যেদ রাযি বেহযাত তাবরিযি’ ইন্তেকাল করেন। এতে শাহরিয়ারের জীবনে আবারো বিপর্যয় নেমে আসে। তিনি বলেন :

رفت از برم چو جان عزیز آن برادرم
آوخ از آن برادر با جان برابرم-
چون گنج خسروانیش آورده بود باد
آوخ که گشت باد بر آن باد آورم

(কাভইয়ানপুর[২১], পৃ: ৬৩)

উচ্চারণ ঃ

রাফত আয বারাম চো জা'নে আযীয অ'ন বারা'দা'রাম,
অ'ভাখ আয অ'ন বারা'দার বা' জা'ন বারা'বারাম।
চোন গানজে খোসরোভা'নিয়াশ অ'ভারদে বুদ বা'দ,
অ'ভাখ কে গাশত বা'দ বার অ'ন বা'দে অ'ভারাম ॥

অর্থ ঃ

আমার মাথার উপর থেকে হৃদয়সম প্রিয় ভাই চলে গেছে,
সেই ভাইয়ের জন্য আফসোস যিনি আমার আত্মার মত প্রিয়।
সে যেন খসরুর[রর] গুপ্তধনের মত আশীর্বাদ বয়ে এনেছিল,
হায়! চলে গেছে সেই বায়ু আর নিয়ে আসা সেই আশির্বাদ ॥

বড় ভাইয়ের মৃত্যুর পর তার চার সন্তানের দায়-দায়িত্ব শাহরিয়ারের উপর এসে পড়ে। শাহরিয়ার পিতৃ স্নেহে তাদের মানুষ করতে থাকেন। কবি কন্যা ‘খানম শাহজাদ বেহজাত তাবরিযি’ বলেন :

---

[i] উক্তিটি মূল তর্কি ভাষায় কবি তার বিখ্যাত গ্রন্থ হায়দার বাবায়ে সালামে উলেখ করেন। ডঃ বেহরুয সারওয়াত সেটিকে ফারসি ভাষায় অনুবাদ করেন। মূল তুর্কি উক্তিটি এরকম ছিল (آقا اوّلدي، تو فاقيميز دغليدي) , আলী মোহাম্মদ, আবুল ফজল, জুলফেকার, ডঃ হাছান, হাফেজ বে রেভায়েতে শাহরিয়ার, এন্ডেশারাতে নশর চাশমে, তেহরান, ১৩৮১, পৃ ৬৯

[ii] ইরানের সাসানী রাজবংশের বিখ্যাত সম্রাট। তিনি খসরু পারভীজ নামে অধিক পরিচীত ছিলেন।

پـدرم در اصل فـرقـي بـيـن مـا و آنـهـا قـائـل نـيـست

(সারুতিয়ান[৭১], পৃ: ৩১)

অর্থাৎ ঃ ''বাবা কখোনো আমাদের আর তাদের মধ্যে পার্থক্য করেননি।''

হিজরি ১৩১৫/ ১৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দে শাহরিয়ার তেহরানের কৃষি ব্যাংকে, অফিসার হিসেবে যোগদান করেন। তিন বছর পর, হিজরি ১৩১৮/ ১৯৩৯ খ্রিষ্টাব্দে বাবেল শহরে ভ্রমন করেন। এই সফরে 'আমিরি ফিরুযকুহির' সাথে পরিচিত হন। এই সময়ে 'নিমা ইউশিজের' সাথে দেখা করার প্রবল ইচ্ছা ছিল কিন্তু ব্যস্ততার কারণে তা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। অবশ্য এর তিন বছর পর ১৩২১ হি: শা:/ ১৯৪২ খিষ্টাব্দে তেহরানে নিমা ইউশিজের সাথে তিনি সাক্ষাত করেন এবং 'দু মোরগে বেহেশ্‌ত' কবিতাটি নিমা ইউশিজের জন্য উৎসর্গ করেন।

আধ্যাত্মিক সাধণা :

শাহরিয়ার তার জীবনের বড় একটি সময় আধ্যাত্মিক সাধনার পেছনে ব্যায় করেন। ১৩০৭ হি: শা:/ ১৯২৮ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৩০৯ হি: শা:/ ১৯৩০ খিষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি 'মরহুম ডক্টর সাকফির' খানকায় নিয়মিত যাতায়াত করতেন। সেখান থেকে তিনি আধ্যাত্মিক জ্ঞান অর্জন করেন ও নিজের জীবনে সেই জ্ঞানকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করেন। ১৩১০ হি: শা:/ ১৯৩১ খিষ্টাব্দে তিনি খোরাসানে যান এবং সেখানেও আধ্যাত্মিকতার চর্চায় নিজেকে নিয়োজিত করেন। ১৩১৪ হি: শা:/ ১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দে তেহরানে ফিরে আসার পর পুরোপুরি দরবেশী রূপ ধারন করেন এবং কঠিনভাবে তরীকার সাধনা করতে থাকেন। তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে খেরকা[i] ধারণ করে তার পিরের স্থলাভিষিক্ত হবেন। কিন্তু এই সাধনা করতে করতে গিয়ে মানুষিক ভাবে অসুস্থ হয়ে পরেন। (শাহরিয়ার[৬৬], পৃ: ২৩)

১৩২০ হি: শা:/ ১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দ থেকে শাহরিয়ারের জীবনে মানসিক অস্থিরতার অধ্যায় শুরু হয়। তিনি প্রচন্ড হতাশায় ভূগতে থাকেন। ১৩২৬ হি: শা:/ ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দের পর তার মানসিক অস্থিরতা আরো বৃদ্ধি পায়। শাহরিয়ারকে দেখাশোনার জন্য তার মা তেহরানে চলে আসেন। জীবনের এই পর্যায়ে তার চিন্তা-চেতনার জগতে নতুন দিগন্তের উম্মোচন হয়। যে দুনিয়াবি প্রেমের জ্বালা-যন্ত্রনায় কবির হৃদয় জর্জরিত ছিল, সেই প্রেমের পরিবর্তে হৃদয়ে আধ্যাত্মিক প্রেমের আলো জ্বলে উঠে। অধিকাংশ সময়েই যিকির-আযকার ও কোরআন তিলাওয়াত নিয়ে ব্যাস্ত থাকতেন। তার আধ্যাত্মিক গজল গুলো এই সময় থেকেই লিখতে শুরু করেন। শাহরিয়ারের ঘনিষ্ট বন্ধু জনাব যাহেদি বলেন :

> ÔÔtmB mg‡q wZwb Le AmsjM K_vevZv ej‡Zb Ges A¯vfweK AvPiY Ki‡Zb| hv mevi Rb¨ eS‡Z mgm¨v n‡q †hZ| AwaKvsk mgq †mZvi wb‡q e‡m _vK‡Zb Ges wewfb Mv‡bi mi eva‡Zb| KweZv †jLv †Q‡o w'‡qwQ‡jb| cvq mg‡qB '‡Pv‡L cwb _vKZ| wb‡Ri KvR-K‡g KvD‡K mvnvh¨ Ki‡Z w'‡Zb bv| gv‡S gv‡S GB K_wU Avl iv‡Zb :

[i] সুফীদের ব্যবহৃত, আলখেল্লার মত বিশেষ পশমী পোষাককে খেরকা বলা হয়।

مرد خدا و مومن حقيقي بايد امتحان بدهد و امتحان من بسيار سخت است

A_wr t ÔÔcKZ gÕwgb‡'i‡K eva¨ZvgjKfv‡e cix¶v w'‡Z nq, Avgvi cwi¶v eoB KwVb|ÕÕ

১৩৩১ হিঃ শা:/ ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দে তিনি মানসিক অস্থিরতা থেকে মুক্তি পান। এ সময়ে তিনি বলেন :

امتحان من تمام شده است و علم قرآن را يافته ام (কাভইয়ানপুর[৭১], পৃ: ৬৭)

অর্থাৎ ঃ ''আমার পরীক্ষা শেষ হয়েছে এবং আমি কোরআনের জ্ঞান অর্জন করেছি।''

মানুষিক অস্থিরতার মধ্যেই মায়ের অনুরোধে তূর্কি ভাষায় তার বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ 'হায়দার বাবায়ে সালাম' রচনা করেন। শাহরিয়ারের মা তাকে বলেছিলেন :

پسرم اينهمه شعر در فارسي داري و من هيچكدام آنها را نمي فهمم، حيف است به زبان مادري، زباني كه من كلمه به كلمه آنرا بر زبان تو آوردم يا به قول معروف حتي فرزندان لال خودشان را هم مي فهمند، براي چه من زتان شعر بو را نمي فهمم (কাভইয়ানপুর[৭১], পৃ: ৬৭)

A_vr t ÔÔ†Q‡j Avgvi, dviwm fvlvq †jLv †Zvgvi GZ KweZv, wKš G¸‡jvi GKUvI Awg ewSbv| gvZ fvlvi Rb¨ Avd‡mvm, G fvlvq Awg †Zvgv‡K GKwU GKwU K‡i evK¨ wkwL‡qwQ Ges GKwU K_v cPwjZ Av‡Q †h gv‡qiv Zv‡'i †evev mšÍvb‡'i I fvlv eS‡Z cv‡i, wKš Avd‡mvm! †h Awg †Zvgvi fvlv eS‡Z cwibv|ÕÕ

মায়ের এই কথার পরিপ্রেক্ষিতে মতৃভাষা তুর্কিতে 'হায়দার বাবায়ে সালাম' রচনা করেন।

মানসিক অস্থিরতার সময়ে তৎকালীন প্রধান মন্ত্রির অনুমতিক্রমে কয়েক বছরের জন্য চাকরি থেকে ছুটি নেন। এক সময়ে তার মনে হচ্ছিল, তিনি সরকারি কাজের ক্ষতি করছেন। তাই শেষ পর্যন্ত এই ক্ষতি পুষিয়ে দেওয়ার জন্য পূণরায় চাকরিতে যোগদান করেন ও ব্যাংকের কাজে মনোযোগ দেন। মূলত : ব্যাংকের হিসাব নিকাষের সাথে তিনি কাব্যিক মনকে খাপ খাওয়াতে পারছিলেন না, বরং নিরূপায় হয়েই তাকে এ কাজ করতে হচ্ছিল। শাহরিয়ার কবিতার ভেতর বিষয়টি এভাবে ব্যক্ত করেছেন :

خدمت من اداره رفتن نيست
مهملي گفتن و شنفتن نيست
من به كار حساب مرد نيم
بلكه با اين حساب مردنيم

(শাহরিয়ার[৬৬], পৃ: ২০)

উচ্চারণ ঃ

খেদমাদে মান এদা'রে রাফতান নীস্ত,

মোহমালী গোফতান ও শেনুফতান নীস্ত।

মান বে কা'রে হেসা'ব মোরদানিয়াম,

বালকে বা' ইন হেসা'ব মোরদানিয়াম ॥

অর্থ ঃ

অফিসে যাওয়া আমার কাজ নয়,

অনর্থক কথা বলা বা শুনাও আমার কাজ নয়।

আমি হিসাবের লোক নই,

কিন্তু এই হিসাব নিয়েই এখন মারা যাচ্ছি ॥

মায়ের মৃত্যু :

১৩৩১ হিঃ শাঃ/ ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দে শাহরিয়ারের মা ইন্তেকাল করেন। তাকে কোমে দাফন করা হয়। মায়ের মৃত্যুর পর, ১৩৩২ হিঃ শাঃ/ ১৯৫৩ খ্রিষ্টাব্দে তেহরানের 'খিয়াবানে ফালাহ' এ অবস্থিত নিজস্ব বাড়িটি তার ভাইয়ের ছেলেদের নামে লিখে দিয়ে, প্রায় তেত্রিশ বছর পর নিজ জন্মস্থান 'তাবরিযে' ফিরে আসেন। তাবরিযে একবছর অবস্থান করার পর ৪৮ বছর বয়সে, 'খানমে আযিযা আব্দুল খালেকি' নামের এক নারীকে বিয়ে করেন। খানমে আযিযা কবির চাইতে ২৮ বছরের ছোট ছিলেন। সম্পর্কের দিক থেকে তিনি শাহরিয়ারের দুঃসম্পর্কের চাচার নাতি ছিলেন। খানমে আযিযা তাবরিযে শিক্ষকতা করতেন। তার গর্ভে শাহারযাদ ও মরিয়ম নামে দু'টি কন্যা সন্তান ও হাদি নমে একটি পুত্র সন্তানের জন্ম হয়। প্রথম সন্তান, 'শাহারযাদের' জন্মের পর তিনি শিক্ষকতা ছেড়ে দেন।

১৩৩৫ হিঃ শাঃ/ ১৯৫৬ খ্রিষ্টাব্দে অর্থনৈতিক সমস্যার কারণে শাহরিয়ার নতুন করে ব্যাংকের কাজে যোগদান করেন। ১৩৪৪ হিঃ শাঃ/ ১৯৬৫ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ব্যাংকের কাজ থেকে অবসর নেন। ১৩৩৭ হিঃ শাঃ/ ১৯৫৮ খ্রিষ্টাব্দে, সাংস্কৃতিক মন্ত্রনালয়ের নির্দেশে, ফারসি এসফান্দ মাসের ১৬ তারিখে কে শাহরিয়ার দিবস হিসেবে ঘোষনা করা হয়। ১৩৪৮ হিঃ সালে তাবরিয বিশ্ববিদ্যালয় কবিকে সম্মান সূচক ডঃ ডিগ্রি প্রদান করে। ১৩৫১ হিঃ সালের পর থেকে পরবর্তি চার বছর তিনি তেহরানে অবস্থান করেন। এই সময়ে কবির স্ত্রী ইন্তেকাল করেন। স্ত্রীর মৃত্যুর পর কবি তাবরিযে ফিরে আসেন এবং সবার সাথে যোগাযোগ বন্ধ করে দিয়ে নির্জনে বসবাস করতে থাকেন।

শাহরিয়ার ও ইসলামি বিপ্লব :

এর মধ্যে ইরানে ইসলামী বিপ্লব শুরু হলে, বিপ্লবের প্রতি তার পূর্ণ সমর্থন জানান এবং বিপ্লবের পক্ষে অনেক কবিতা লেখেন। ১৩৬৩ হি: শা:/ ১৯৮৪ খিষ্টাব্দে তাবরীয বিশ্ববিদ্যালয়ে, শাহরিয়ারের ৮০ বছর পূর্তি উপলক্ষে, তাকে গণ সম্বর্ধণা দেওয়া হয়। শাহরিয়ার ঐ সমস্থ সৌভাগ্যবান কবিদের মধ্যে একজন যারা জীবদ্দশাতেই মানুষের কাছ থেকে নিজেদের সাহিত্যকর্মের সম্মান লাভ করেছিলেন। সেই অনুষ্ঠানে কবি 'তাজলীলে তাহমিলি' বা আরোপিত সম্মান নামক কবিতাটি পাঠ করেন।

জীবনের শেষ দিকে শাহরিয়ারের খুব ইচ্ছে ছিল, তেহরান ছেড়ে শিরাযে চলে যাবেন এবং কবি হাফিয ও সা'দির মাযারের পাশে কিছুদিন অবস্থান করবেন। اي شيراز বা হে শিরায কবিতায় তার এই ইচ্ছার প্রতিফলন দেখতে পাওয় যায়। যেমন তিনি বলছেন :

ديدمت دور نماي دروبام اي شيراز
سرم آمد ببر سينه، سلام اي شيراز
وامداريم و سرافكنده ز خجلت در پيش
كه پس انداخته ايم اينهمه وام اي شيراز

(শাহরিয়ার[৬৬], প্রথম খন্ড, পৃ: ২৫৯)

উচ্চারণ ঃ

দীদামাত দূর নোমা'য়ে দারওবা'ম এই শীরায,
সারাম অ'মাদ বেবার সীনে, সালা'ম এই শীরায।
ভা'মদা'রীম ও সার আফকানদে যে খাজলাত দার পীশ,
কে পাস আনদা'খতে ঈম ইন হামে ভা'ম এই শীরায ॥

অর্থ ঃ

ফসল কাটার মৌসুমে দূর হতে তোমায় দেখেছি হে! শিরায,[র]
(শ্রদ্ধায়) আমার মাথা বুকের বর্মের কাছে নুয়ে এসেছে, তোমায় জানাই সালাম, হে! শিরায।
তোমার কাছে আমার অনেক ঋণ তাই লজ্জায় আমার মাথা নত,
তোমার এই ঋণ পরিশোধের সময় আরো পিছিয়ে নিলাম হে! শিরায ॥

কিন্তু শারিরিক দূর্বলতা ও অসুস্থতার জন্য তার আর শিরাযে যাওয়া হয়নি। সে সময়ে তিনি তার বন্ধু জনাব যাহেদি কে বলেন :

ممكن است سفري از خلق به خالق داشته باشم

(শাহরিয়ার[৬৬], প্রথম খন্ড, পৃ: ২৫৯)

[i] ইরানের বিখ্যাত শিরাজ নগরী

অর্থাৎ ঃ সম্ভবত আমাকে সৃষ্টি জগৎ থেকে স্রষ্টার কাছে ভ্রমন করতে হবে।

মৃত্যু :

১৩৬৬ হি: শা:/ ১৯৮৭ খ্রিষ্টাব্দে ফারসি অযার মাসের বিশ তারিখ, শাহরিয়ারের শারিরিক অসুস্থতা দেখা দিলে তাবরিযের ইমাম খোমেনি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। প্রায় তিনমাস হাসপাতালে ভর্তি থাকার পর ১৩৬৭ হি: শা:/ ১৯৮৮ খ্রিষ্টাব্দে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পান এবং বাসায় চলে আসেন। আটমাস পর মোরদাদ মাসের প্রথম দিকে শাহরিয়ারের ফুসফুসের সমস্যা দেখা দেয়। অবস্থার অবনতি হলে, তৎকালীন ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা ইমাম খোমেনির নির্দেশে, বিমানে করে তাকে তেহরানে নিয়ে অসা হয় এবং মেহের হাসপাতলের ৫১৩ নম্বর কক্ষে ভর্তি করা হয়। ৪৮ দিন তিনি হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। চিকিৎসকগণ যার পর নাই চেষ্টা করে গেলেন, কিন্তু দিন দিন যেন শাহরিয়ারের অসুখ বেড়েই চললো। শেষ পর্যন্ত ১৩৬৭ হি: শা: সালের ২৭ শে শাহরিয়র, ১৯৮৮ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর, শনিবার ভোর পৌনে ৭ টায়, তেহরনের মেহের হাসপাতালে তিনি ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুর সময় বিড় বিড় করে কবি তার يا علي বা হে আলি কবিতার এই বেইতগুলো আবৃত্তি করছিলেন :

اي مظهرجمال و جلال خدا، علي
يا مظهر العجايب و يا مرتضي علي
از شهريار پير زمين گير دست گير
اي دستگير مردم بي دست وپا، علي

(শাহরিয়ার[৬৬], প্রথম খন্ড, পৃ: ৪০৭)

উচ্চারণ ঃ

এই মাযহারে জামা'ল ও জালা'লে খোদা', আলী,
ইয়া মাযহারুল আ-জা'য়েব ও ইয়া মোরতাযা আলী।
আয শাহরইয়ারে পীরে যামীন গীর দাস্তগীর,
এই দাস্তগীরে মারদোমে বী দাস্ত ও পা' আলী ॥

অর্থ ঃ

ওহে! খোদার সৌন্দর্য ও মাহত্ম্যের প্রকাশক আলি,
হে বিস্ময়ের উদ্রেক কারি ও খোদার সন্তুষ্টি প্রাপ্ত আলি।
মাটির বুকে এই বৃদ্ধ শাহরিয়ারকে তুমি গ্রহণ কর ও সাহায্য কর,

হে! হাত–পা হীন অসহায় মানুষের সাহায্য কারি আলি ॥

ফারসি শাহরিয়ার মাসের ২৭ তারিখ, রবিবার তেহরানে জানাযার নামায অনুষ্ঠিত হয়। সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা ইমাম খোমেনি সহ অনেক বুদ্ধিজিবী, কবি, সাহিত্যিক ও নেতৃস্থানীয় ব্যাক্তিবর্গ সেই জানাযায় উপস্থিত ছিলেন। ২৮ শে শাহরিয়ার, সেমবার তাবরিযে তাকে সমাহিত করা হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সাহিত্যকর্ম :

শাহরিয়ারের পদ্য সাহিত্যকর্মই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গদ্য সাহিত্যে তার বিচরণ নেই বললেই চলে। শাহরিয়ারের সাহিত্যকর্মকে প্রধাণত দুইভাগে ভাগ করা যায়। ক. ফারসি কবিতা ও খ. তুর্কি কবিতা। ফারসিতে প্রায় ২৮ হাজার বেইত ও তুর্কিতে প্রায় ৩ হাজার বেইত তিনি লিখে গেছেন। ফারসি ভাষায় ৫৪৭ টি গযল, ১০০ টি কাসিদা, ২৫ টি দীর্ঘ মাসনাভি, ১৫০ টি কেতয়া কবিতা, অন্যান্য বিভিন্ন গঠনের ১২৩ টি খন্ড কবিতা এবং ইসলামি বিপ্লব নিয়ে ৩৯ টি কবিতা লিখেছেন। আর তুর্কি কবিতার মধ্যে হায়দার বাবায়ে সালাম (প্রথম খন্ড) ও (দ্বিতীয় খন্ড), সাহান্দিম, ও তুর্কি মুক্ত কবিতা সমূহ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

শাহরিয়ার জীবনে প্রচুর কবিতা লিখেছেন। মাত্র চার বছর বয়সে গৃহ পরিচারিকা রোকেয়া খানমের উদ্দেশ্যে প্রথম কবিতা লিখেন (পৃষ্ঠা-৩ এর দ্রষ্টব্য)। তাবরিযের প্রাথমিক বিদ্যালয়েল ছাত্র থাকা অবস্থায় সেখানকার একজন তরুণ কবি হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন এবং প্রথম বারের মত তার কবিতা বেহজাত কাব্যনাম সহ 'আদব' পত্রিকায় ছাপা হয়।

শাহরিয়ার ছিলেন স্বভাব কবি। যখন-তখন যে কোন মুহুর্তকে কেন্দ্র করে কবিতা বানিয়ে ফেলতেন। সেগুলোকে লিখেও রাখতেন না। এভাবে তাঁর অলিখিত অনেক কবিতা কালের গর্ভে হারিয়ে গেছে। এই প্রসঙ্গে কবি-বন্ধু জনাব যাহেদি বলেন :

سابقا شهريار زياد شعر مي گفت. هر كجا من رفت و يا مهمان بود شعري وصف حال من گفت و همانجا من گذاشت و بيشتر اوقات آن اشعار از بين مي رفت

(শাহরিয়ার[৬৬], প্রথম খন্ড, পৃ: ১২)

অর্থাৎঃ ''শাহরিয়ার প্রচুর কবিতা বলতেন। যেখানেই যেতেন অথবা কোথাও অতিথি হলে উপস্থিত পরিবেশের উপর কবিতা লিখে ফেলেতেন এবং সেখানেই সেগুলো শেষ হয়ে যেত ও অধিকাংশ সময় সেগুলোকে আর মনে করতে পারতেন না।''

তার প্রথম কাব্যগ্রন্থ ১৩০৯ হি: শা:/১৯৩০ খিষ্টাব্দে মালেকুশ শুয়ারায়ে বাহার, সাঈদ নাফিসি, ও পুজমান বোখতিয়ারের ভূমিকা সহ প্রকাশিত হয়।

১৩২৮ হি: শা:/১৯৪৯ খিষ্টব্দে শাহরিয়ারের দিভান বা কাব্য সংকলনের প্রথম খন্ড প্রকাশিত হয়। এর ভূমিকায় মালেকুশ শুয়ারায়ে বাহার, শাহরিয়ার সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন :

شهريار شاعر بزرگ و افسونكاري است، شهريار از اساتيد بزرگ شعر است، شهريار بزرگترين و هنرمندترين شاعر معاصر ايران و يگانه شاعر واقعي حساس است، شهريار نه تنها افتخار ايران، بلكه افتخار شرق است. (শাহরিয়ার[৬৬], প্রথম খন্ড, পৃ: ১২)

অর্থাৎ ঃ '' শাহরিয়ার যাদুময় প্রতিভার অধিকারি বড় একজন কবি। শাহরিয়ার কবিতার একজন বড় শিক্ষক। শাহরিয়ার ইরানের সমকালীন কবিদের মধ্যে সবচেয়ে শৈল্পিক ও স্পর্ষকাতর কবি। শাহরিয়ার শুধু আমাদের নয় বরং প্রাচ্যের সকল মানুষের গর্ব।

ইমাম খোমেনি শাহরিয়ারকে তার মৃত্যু বাষিকীতে 'بلبل داستانسراي غزل فارسي' ফারসি গযলের বুলবুলি পাখি বলে উল্লেখ করেছেন।

১৩৩৫ হি: শা:/ ১৯৫৬ খ্রিষ্টাব্দে তার দিভানের দ্বিতীয় ও তৃতীয় খন্ড এবং ১৩৪৬ হি: শা:/ ১৯৫৬ খিষ্টাব্দে চতুর্থ ও পঞ্চম খন্ড প্রকাশিত হয়। বর্তমানে, তেহরানের এন্তেশারাতে নেগাহ, শাহরিয়ারের দিভান বা কাব্য সমগ্র দুটো খন্ডে প্রকাশিত করেছে। তাঁর দিভানে গজল, কাসিদা, মাসনাভি, দো বেইতি, রুবায়ি, কেতআত, মোতাফার্‌রেকে ও কিছু মুক্ত কবিতা দেখতে পাওয়া যায়। অর্থাৎ ফারসি সাহিত্যে প্রচলিত প্রায় সবধরণের কবিতাই তিনি লিখেছেন।

তবে শাহরিয়ারের সাহিত্য প্রতিভার পুরোটাই 'গযলে' ঢেলে দিয়েছেন। শাহরিয়ারকে বুঝতে হলে তার গযলকে বুঝতে হবে। 'গযল' শব্দটির মূল আরবি। আরবিতে এর অর্থ নারীর সঙ্গে কথাবার্তা, অথবা প্রেমালাপ। মনে করা হতো, গযল অর্থে গান অথবা কাব্যগীতি বোঝায়, যাতে প্রেমিক হৃদয়ের চিন্তা প্রকাশ পায়। এ চিন্তা-ক্ষেত্রের পরিধি বিস্তর, প্রেম-বিরহ থেকে শুরু করে মিলনের আকাঙ্খা-হতাশা, এক কথায় প্রেমঘটিত ব্যাথা-বেদনা, আশা-অহ্লাদ। গযল শুরু হয় যে দুটি চরণ দিয়ে, সেই প্রথম চরণ দুটিকে বলা হয় 'মাতলা'। প্রথম চরণের শেষ দুটি শব্দটির পূর্ববর্তী শব্দ দ্বিতীয় চরণের শেষ শব্দটি মাতলার দ্বিতীয় চরণের শেষ শব্দটির স্থলে বারবার ঝংকৃত হবে, এর নাম রাদিফ বা অন্তমিল। গযলে দু'টি মিল থাকে , একটি কাফিয়া বা ধ্বনিগত মিল, অন্যটি রাদিফ বা শব্দগত মিল। (চৌধুরী[২৯], পৃ: ৭)

শাহরিয়ার পুরো জীবনের অভিজ্ঞতাকে তাঁর গযলে নিয়ে এসেছেন। বিষয় বৈচিত্রের মাঝে প্রেমই সবচেয়ে বেশী প্রাধান্য পেয়েছে। শাহরিয়ার তাঁর প্রেমকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন। প্রথম জীবনের প্রেম, যা প্রেমিকা সুরাইয়াকে নিয়ে ছিল, সেই প্রেমের নাম দিয়েছেন এশকে মাযাযি বা রূপক প্রেম। অপরটি ছিল এশকে এরফানি বা আধ্যাত্মিক প্রেম। কবির অধিকাংশ প্রসিদ্ধ গযল ছিল এই রূপক প্রেমকে ঘিরে। এর মধ্যে 'মাহ সাফার কারদে (চাদ ভ্রমন করেছে)' 'তূশেয়ে সাফার (ভ্রমনের রসদ)' 'পারভা'নে দার

অ'তাশ (আগুনের ভেতর প্রজাপতি)' 'ইয়া'রে ক্বাদীম (পুরোনো বন্ধু)' 'খুমা'রে শাবা'ব যৌবনের মাদকতা)' 'নালেয়ে না কা'মি (ব্যার্থ অর্তনাদ)' 'শা'হেদে পান্দারি (জ্ঞানি সাক্ষদাতা)' 'শেকারিনে পুস্তে খা'মুশ (পশ্চাতের নিরব শিকারি)' 'না'লেয়ে নূমিদী (হতাশার কান্না)' ও 'হালা চেরা (এখন কেন)' বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

আধ্যাত্মিক প্রেমের বর্ণনা যে গযল গুলোতে নিয়ে এসেছেন তাদের মধ্যে 'এন্তেযার (অপেক্ষা)' 'যামা ভা তাফরিক (একবচন ও বহুবচন)' 'ভাহশিয়ে শেকার (শিকারির হিংস্রতা)' 'ইউসোফে গোমগাশতে হারানো ইউসুফ)' 'মুসাফেরে হামেদা'ন (হামেদানের মুসাফির)' 'হারাযে এশক (প্রেমের পঙ্কিলতা)' 'সা'যে সাবা (ভোরের সেতারা)' 'না'য়ে শাবান (রাতের সানাই) ও আশক্বে মারইয়াম (মরিয়মের অশ্রু)' 'মোরগে বেহেশতী (বেহেশতের পাখি)' 'মেলা'লে মোহাব্বত (প্রেমের বিষাদ)' 'নাসখিয়ে জা'দু (যাদুর পান্ডুলিপি)' ও 'শা'য়েরে আফসা'নে (রূপক কবি)' বিশেষ প্রসিদ্ধ। কবির জীবনের কিছু ব্যার্থতা ও না পাওয়ার ইতিহাস যে গযল গুলোতে নিয়ে এসেছেন সেগুলো হলো 'গওহার ফোরুশ (রত্ন বিক্রেতা)' 'না কা'মীহা (হতাশা সমূহ)' 'জারাসে কা'রেভান (কাফেলার অর্তনাদ)' 'নালিয়ে রুহ' (আত্মার কান্না) 'মাসনাভিয়ে শে'র (কবিতার দুই পদ), হেকমাত (কৌশল)' 'যাফা'ফে শা'য়ের (কবির অত্যাচার)' প্রভৃতি কবিতায় বর্ণিত হয়েছে।

কবির জীবনের সর্বশেষ কবিতা ছিল মৌলা'না' দার খানক্বা'হে শামস (শামসের দরবারে মাওলানা। তাবরিযে, মাওলানা দিবসে তিনি কবিতাটি পাঠ করেন।

শাহরিয়ারের কবিতার ভাষা ও বর্ণনা ভঙ্গি :

শাহরিয়ার ফারসি ও তুর্কি উভয় ভাষার কবি ছিলেন। তিনি ফারসিতে প্রায় ২৮ হাজার বেইত ও তুর্কিতে প্রায় ৩ হাজার বেইত লিখেন।

তিনি তার তেজদীপ্ত, গতিশীল, আন্তরিক, কোমল ও হৃদয়গ্রাহী ভাষার মাধ্যমে অবিস্মরণীয় কবিতার দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন। তার কিছু কবিতার ভাষা এতই সহজ সরল যা শুনলে দৈনন্দিন কথা-বার্তার মত মনে হয়। সাধারণ মানুষের মুখের প্রচলিত শব্দ গুলো তার কবিতায় ব্যাবহার করেছেন। যদিও অধিকাংশ সাহিত্য সমালোচকগণ, কবিতায় এই সাধারণ শব্দ ব্যবহারের সাহসিকতাকে প্রসংশা করেছেন, তবে কারো কারো মতে, কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই ব্যাবহার তাঁর কবিতার মূল্যকে কমিয়ে দিয়েছে। এ ধরণের শব্দ তাঁর কবিতার অনেক যায়গায় দেখতে পাওয়া যায়। যেমন :

آزگار، آس و پاس، اردنگ، از دماغ در آوردن، از سر وا کردن، اکبیري، الو گرفتن، با مبول، بنجل، به رخ کشیدن، بي قواره، پاپیچ، پدر صلواتي، تار و مار، چشم دریده، خاک بر سر، خل، داد و قال، دکه، دل و دماغ، دوز و کلک، روده درازي، زیر سبیلي، سیاسوخته، شنگول، فوت و فن، قلمبیده، گنده، متلک

উদাহরণ স্বরুপ তার گوهر فروش বা রত্ন বিক্রেতা কবিতায় তিনি বলছেন :

یـار و همسر نـگرفـتم کـه گـرو بـود سرم

تـو جگرگـوشه هم از شیـر بـریـدي و هنـوز

مـن بـیچـاره همـان عـاشق خونـین جگرم

پـدرت گـوهر خود را بـه زر و سیم فـروخت

پـدر عشق بـسوزد کـه درآمـد پـدرم

(শাহরিয়ার[৬৬], প্রথম খন্ড, পৃ: ৩০৪)

উচ্চারণ ঃ

ইয়ার ও হামসার নাগেরেফতাম কে গেরু বূদ সারাম,

তো জেগার গূশে হাম শীর বোরিদী ও হানূয।

মান বীচা'রে হামা'ন আশেক্বে খুনীন জেগারাম,

পেদারাত গওহারে খোদ রা' বে যার ও সীম ফোরুখ্ত।

পেদার এশক বেসুযাদ কে দার অ'মাদ পেদারাম ॥

অর্থ ঃ

বন্ধু বা জীবন সাথী গ্রহন করিনি কারণ মাথায় ছিল অনেক দায়বদ্ধতা,

আর তুমি আমার কলিজার টুকরা এখনো দুধ খেয়ে যাচ্ছ।

আমি এখনো সেই বেচারা প্রেমিক, যার হৃদয় রক্তে রঞ্জিত

আর তোমার বাবা নিজের সম্পদ সোনা রুপার কাছে বিক্রি করছে,

প্রেমকে এমনভাবে ক্ষত-বিক্ষত করছে যেন আমার বাবা চলে আসে ॥

এই কবিতায় جگر گـوشه ، گـرو ، از شیـري بـریـدن ، پـدرت ، پـدرت عشق بـسوزد ، প্রভৃতি শব্দগুলো সাধারণ মানুষের মুখের ব্যাবহরিত শব্দ।

অপর একটি কবিতায় তিনি বলেন :

آن بيد كناره جاده ده
آيا كه پس از منش گذر كرد
هر برگي از آن زبان دل بود
با من چه فسانه ها كه سر كرد
او ماند و جوان عاشق از ده
شب همره كاروان سفر كرد

(http\\www.sid.ir.com)

উচ্চারণ ঃ

অ'ন বীদ কেনা'রে যা'দ্‌দেয়ে,
অ'ইয়া' কে পাস আয মানাশ গোযার কারদ।
হার বারগী আয অ'ন যাবা'নে দেল বূদ,
বা' মান চে ফাসা'নে হা কে সার কারদ।
উ মা'নদ ও যাবা'নে আশেক্ব আয দেহ,
শাব হামরা'হে কা'রেভা'ন সাফার কারদ ॥

অর্থ ঃ

গ্রামের রাস্তার পাশে অবস্থিত ঐ বীদ বৃক্ষ,[র]
আমার পরে কি আর কেউ তার পাশ দিয়ে চলে গেছে।
সেই গাছের প্রতিটি পাতায় হৃদয়ের ভাষা ছিল,
আমার কাছে কত গোপন কল্প-কাহিনি বর্ণনা করেছে।
সে দাঁড়িয়ে ছিল আর গ্রামের প্রেমিক যুবকেরা,

[i] সরু নমনীয় শাখাযুক্ত এক প্রকার গাছ ও ফুল, যাকে ইংরেজীতে উইলো গাছ বলে।

রাতের কাফেলার সাথে তার পাশ দিয়ে ভ্রমন করেছে ॥

এই কবিতায় بيد، كناره جاده ده، منش، چه فسانه ها প্রভৃতি শব্দ গুলো সাধারণ মানুষের মুখের ভাষা।

গযলের ক্ষেত্রেও সাধারণ শব্দের ব্যাবহার লক্ষ করা যায়। গযলের ক্ষেত্রেও এই সাধারণ শব্দের ব্যাবহার ফারসি সাহিত্যে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। এরকাম কতগুলো গযলের মাত্বলা ছিল নিম্নরূপ :

از تو بگذشتم و بگذاشتمت با دگران

رفتم از كوي تو ليكن عقب سرنگران

(শাহরিয়ার[৬৬], প্রথম খন্ড, পৃ: ৩৩৭)

উচ্চারণ ঃ

আয তো বেগোযাশতাম ও বেগোযাশতামাত বা' দেগারা'ন,

রাফতাম আয কুয়ে তো লিকান আক্বাব সার নেগারা'ন ॥

অর্থ ঃ

তোমাকে ছেড়ে চলে গেছি, চলে গেছি অন্যদের সাথে,

তোমার গলিপথ থেকে সরে গেছি কিন্তু পরিশেষে চিন্তিতই রয়ে গেলাম ॥

×××

امشب از دولت مي دفع ملالي كرديم

اين هم عمر شبي بود كه حالي كرديم

(শাহরিয়ার[৬৬], প্রথম খন্ড, পৃ: ৩২৫)

উচ্চারণ ঃ

এমশাব আয দৌলাতে মেই দাফয়ে মেলা'লী কারদীম,

ঈন হাম ওমরে শাবী বূদ কে হা'লী কারদীম ॥

অর্থ ঃ

আজ রাতে শরাবের দৌলতে আমার বিষন্নতাকে দূর করেছি,

এগুলো আমার জীবনেরই রাত যা আমি পার করে এসেছি ॥

×××

آمدي جانم به قربانت ولي حالا چرا

بي وفا حالا كه من افتاده ام از پا چرا

(শাহরিয়ার[৬৬], প্রথম খন্ড, পৃ: ৭৯)

উচ্চারণ ঃ

অ'মাদী জা'নাম বে ক্বোরবানাত ভালী হা'লা' চেরা',

বি ওফা' হা'লা' কে মান ওফতা'দে আম আয পা' চেরা' ॥

অর্থ ঃ

এসেছ, আমার জীবন তোমার জন্য উৎসর্গিত কিন্তু এখন কেন এলে,

বিশ্বাস ঘাতক, যখন আমি নিঃশেষ হয়ে গেছি তখন কেন এলে ॥

×××

تا هست اي رفيق نداني كه كيستم

روزي سراغ وقت من آيي كه نيستم

(শাহরিয়ার[৬৬], প্রথম খন্ড, পৃ: ২৮৯)

উচ্চারণ ঃ

তা' হাস্ত এই রাফীক্ব নাদা'নী কে কীস্তাম,

রূযী সোরা'গে ভক্বতে মান আ'য়ী কে নিস্তাম ॥

অর্থ ঃ

যতক্ষন ছিলাম বুঝলেনা হে! বন্ধু আমি ছিলাম কে ,

একদিন আমার খোঁজে তুমি আসবে সেদিন আর আমি রইবো না যে ॥

×××

نه وصلت ديده بودم كاشكي اي گل نه هجرانت

كه جانم در جواني سوخت اي جانم به قربانت

(শাহরিয়ার[৬৬], প্রথম খন্ড, পৃ: ১৪৮)

উচ্চারণ ঃ

না ভাসলাত দীদে বূদাম কা'শাকী এই গোল না হেজরা'না'ত,

কে জা'নাম দার জাভা'নী সূখত এই জা'নাম বে ক্বোরবা'নাত ॥

অর্থ ঃ

না তোমার মিলন দেখেছি, না দেখেছি তোমার বিচ্ছেদ ওগো! ফুল,

আমার প্রাণ যৌবনে পুড়ছে, ওগো প্রিয়া আমি তোমার জন্য উৎস্বর্গিত ॥

نالد به حال زار من امشب سه تار من

اين مايۀ تسلي شبهاي تار من

(শাহরিয়ার[৬৬], প্রথম খন্ড, পৃ: ৩৫১)

উচ্চারণ ঃ

না'লাদ বে হা'লে যা'রে মান এমশাব সে তা'রে মান,

ইন মা'য়েয়ে তাসাললিয়ে শাবহা'য়ে তা'রে মান ॥

অর্থ ঃ

আমার দুঃখ দেখে আজ রাতে আমার সেতারাও কেঁদেছে,

এ যেন আমার প্রতি আধার রাতের সান্ত্বনা ॥

×××

با رنگ و بویت اي گل، گل رنگ و بو ندارد

با لعلت آب حیوان آبي به جو ندارد

از عشق من هر سو در شهر گفتگویي است

من عاشق تو هستم این گفتگو ندارد

(শাহরিয়ার[৬৬], প্রথম খন্ড, পৃ: ১৫৯)

উচ্চারণ ঃ

বা' রানগ ও বূইয়াত এই গোল, গোল রানগ ও বূ নাদা'রাদ,

বা' লা-লাতে অ'বে হাইভা'ন অ'বী বে জূ নাদা'রাদ।

আয এশক্বে মান হার সূ দার শাহর গোফ্তেগূয়ী আস্ত,

মান অ'শেক্বে তো হাস্তাম ইন গোফতেগূ নাদা'রাদ ॥

অর্থ ঃ

তোমার রঙ ও গন্ধের কাছে ফুলের রঙ ও গন্ধ হারিয়ে গেছে,

তোমার আবে হায়াতের উম্মাদনায় সব নদীর পানি নিঃশেষ হয়ে গেছে।

আমার প্রেম নিয়ে শহরের সব প্রান্তে আলোচনা হচ্ছে,

আমি তোমার প্রেমিক এজন্য আলোচনার প্রয়োজন কেন ॥

উপরোক্ত গযল গুলোর ভাষা বিশ্লেষণ করলে বুঝতে পারা যায়, তিনি গযলের ক্ষেত্রে একেবারে সহজ সরল ভাষা ব্যবহার করেছেন। এভাবে সাধারণ ভাষায় গযল রচনা, ফারসি সাহিত্যে আধুনিক গযলের নবতর রুপরেখা তৈরী করেছে।

আঞ্চলিক শব্দের ব্যাবহার ছিল শাহরিয়ারের কবিতার একটি বিশেষ বৈশিষ্ঠ। যেমন :

با خلق مي خوري مي و با ما ***تلوتلو***

قربان هر چه بچه ي خوب سرش بشو

(শাহরিয়ার[৬৬], প্রথম খন্ড, পৃ: ৫৭২)

উচ্চারণ ঃ

বা' খালক্ব মেই মী খুরী ভা বা' মা' মাতলুতলু,

ক্বোরবা'ন হারচে বাচ্চেয়ে খুব সারাশ বেশো ॥

অর্থ ঃ

মানুষের সাথে মদ খাও আর মাতলামী কর আমার সাথে,

তোমাকে কোরবানী করে দিলাম যা ভাল মনে চায় তাই হও ॥

***

سر و بلند من كه بدادم نمي رسي

دستم اگر رسد به خدا مي رسانمت

(শাহরিয়ার[৬৬], প্রথম খন্ড, পৃ: ১৪৭)

উচ্চারণ ঃ

সার ও বোলান্দে মান কে বেদা'দাম নেমী রাসী,

দাস্তাম আগার রাসাদ বে খোদা মী রেসা'নামাত ॥

অর্থ ঃ

আমার ইজ্জত সম্মান সব দিলাম তোমার কাছে পৌছল না,

আমার হাত যদি খোদা পর্যন্ত পৌছাত তবে এগুলো তোমার কাছে পৌছাতাম ॥

***

پـدرت گـوهـر خـود تـا بـه زر و سـيـم فـروخـت

پـدر عشق بـسـوزد کـه در آمـد پـدرم

(শাহরিয়ার[৬৬], প্রথম খন্ড, পৃ: ৩০৪)

উচ্চারণ ঃ

পেদারাত গোওহারে খোদ তা’ বে যার ও সীম ফোরুখ্ত,

পেদার এশক্ব বেসূযাদ কে দার অ’মাদ পেদারাম ॥

অর্থ ঃ

তোমার বাবা নিজের সম্পদ সেনা রুপার কাছে বিক্রি করছে,

প্রেমকে এমনভাবে ক্ষত-বিক্ষত করছে যেন আমার বাবা চলে আসে ॥

শাহরিয়ারের কবিতায় প্রকৃতির প্রভাব বিশেষভাবে দেখা যায়। সুনিপুন দক্ষতার সাথে কবি প্রকৃতিকে কবিতায় নিয়ে এসেছেন এবং চমৎকার ভাবে প্রকৃতিকে উপস্থাপন করেছেন। জঙ্গল, পাহাড়, সকাল, চাঁদ, ঝরণা, রাত ইত্যাদির বর্ণনা ও উপমা প্রায়ই নিয়ে এসেছেন। যেমন তিনি তার اشک دریـاچـة বা অশ্রুর সাগর কবিতায় বলছেন :

سـرو مـن صـبـح بـهـار اسـت بـه طـرف چـمـن آي

تـا نـسـيـمـت بـنـوازد بـه گـل افـشـانـي هـا

گـر بـديـن جـلـوه بـه دريـاچـة اشـکم تـابـي

چـشم خـورشـيـد شـود خـيـره ز رخـشـانـي هـا

(শাহরিয়ার[৬৬], প্রথম খন্ড, পৃ: ৯৪)

উচ্চারণ ঃ

সারভে মান সোবহে বাহা’র আস্ত বে ত্বারাফে চামান অ’য়,

তা’ নাসীমাত বেনাভা’যাদ বে গোল আফশা’নী হা।

গার বেদীন জালভা বে দারইয়াচেয়ে আশকাম তা’বী,

চাশমে খুরশীদ শাভাদ খীরে যে রোখশা’নী হা ॥

অর্থ ঃ

ওগো আমার চিরসবুজ বৃক্ষ, বসন্তের এই সকালে তৃণ ভূমিতে এসো,

তোমার কোমল বাতাস ফুলের গায়ে আদর বুলিয়ে দিবে।

যদি তুমি এই আলো, আমার অশ্রুর সাগরে ছড়িয়ে দেও,

তবে সেই বিস্ময়কর আলোয় আমার চোখ যেন সূর্য হয়ে যাবে ॥

বাল্যকালের স্মৃতি নিয়ে লেখা হেইদার বাবায়ে সালামের মধ্যেও কবি প্রকৃতিকে ব্যাপকভাবে নিয়ে এসেছেন। যেমন :

حیدر بابا، به هنگام رعد و برق،

خروشیدن و روان شدن سیلاب ها

(শাহরিয়ার[৬৬], দ্বিতীয় খন্ড, পৃ: ৯৮৯)

উচ্চারণ ঃ

হেইদার বা'বা', বে হেনগা'মে রা-দ ও বারক্ব,

খারুশীদান ভা রাভা'ন শোদানে সেইলা'ব হা' ॥

অর্থ ঃ

হায়দার বাবা, মেঘ ও বৃষ্টির মৌসুমে,

তোমার ঝর্ণা গুলোতে স্রতের কলরোব শুরু হয় ॥

শাহরিয়ারের কবিতার আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো গ্রাম্য ভাষার ব্যবহার। হায়দার বাবায়ে সালাম, সাহান্দিয়ে ও আরো বিশেষ কয়েকটি কবিতাকে বিশ্লেষণ করলে, নিঃসংকোচে তাকে পল্লি কবি বলা যায়। বিশেষ করে হায়দার বাবায়ে সালামের মধ্যে পল্লি মানুষের জীবনধারা, তাদের সামাজিক অবস্থান, আচার-ব্যবহার রীতি–নিতি, ভাষা ও সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। ফারসি কবিতার আধুনিক যুগের অন্য কোন কবি গ্রাম্য উপাদান নিয়ে এত কবিতা লিখেন নাই। (তোরাবী, পৃ: ২৬-২৮)

শাহরিয়ারের কবিতায় তেহরানের অঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার ও তেহরান সংক্রান্ত আলোচনা অত্যাধিক প্রাধান্য পেয়েছে। তাবরিযের কিছু ভাষাও কবিতায় দেখতে পাওয়া যায়, তবে তুলনামূলকভাবে তিনি তেহরানকেই বেশী প্রাধাণ্য দিয়েছেন। تهران و یاران নামক গযলে বলেন :

من نه آنم که فراموش کنم تهران را

شب تهران و شعاع و شفق شمران را

(শাহরিয়ার[৬৬], প্রথম খন্ড, পৃ: ৮৫)

উচ্চারণ ঃ

মান না অ'নাম কে ফারা'মোশ কোনাম তেহরা'ন রা',

শা'বে তেহরা'ন ও শেয়া ও শাফাক্ব শোমারা'ন রা' ॥

অর্থ ঃ

আমি এমন নই যে তেহরানকে ভুলে যাব,

তেহরানের সূর্যকিরণ ও সন্ধায় লালিমার দৃশ্য উপভোগ করাকে ॥

এতদসত্বেও শাহরিয়ারের কবিতা, ভূল–ভ্রান্তি ও ক্রুটি–বিচ্যুতি থেকে মুক্ত নয়। আব্দুল আলীম দাস্গেিরের মতে ভুলগুলো ছিল سهل انگاري لفظي বা শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে অসতর্কতা, يک نواخت نبودن ابيات يک منظومه একটি কবিতার ভেতরই কয়েক ধরণের ছন্দ বা লয় ব্যবহার করা, حذف فعل بي قرينه বা চিহ্ন ব্যাতীত ক্রিয়াকে বিলোপ্ত করা এবং কিছু যৌগিক শব্দ ও পদের ব্যবহার। (দাস্তেগীর, পৃ: ৭১)

অলংকার শাস্ত্রের ব্যবহার :

অলংকার শাস্ত্র ব্যবহারের ক্ষেত্রে নতুনত্ব ছিল চোখে পড়ার মত। এক্ষেত্রে অনেক জায়গাতেই তিনি নিযামি গানযুবিকে আনুস্মরণ করেন। (মোহাম্মদি, পৃ: ৬৭) যেমন তার সেতারার সংগীতের উপমা দিতে গিয়ে তিনি বলেন :

ريزش زخمه رشک باران بود
نغمه چون رقص جويباران بود
رقص انگشت ها به دسته ي تار
رشک پا ها ي آهوان تتار

(শাহরিয়ার[৬৬], দ্বিতীয় খন্ড, পৃ: ৬৯৮)

উচ্চারণ ঃ

রীযাশ যাখ্মে রাশ্কে বা'রা'ন বূদ,

নাগ্মে চোন রাক্বসে জূয়ীবা'রা'ন বূদ।

রাক্বসে আনগোশ্তহা বে দাস্তেয়ে তা'র,

রাশ্কে পা' হা'য়ে অ'হুভা'নে তাতা'র ॥

অর্থ ঃ

তাকে বাজানোর দন্ড বৃষ্টিকেও ইর্ষান্বিত করত,

তার সুর যেন ঝর্ণাদের নৃত্যের মত ছিল।

তার তারের উপর আঙ্গুলের নৃত্য,

তাতারী হরিণের পা গুলোকেও ইর্ষান্বিত করত ॥

চিত্রকল্প ব্যবহারের ক্ষেত্রে শাহরিয়ার বেশ পারদর্শিতার পরিচয় দেন। তার চিত্রকল্প গুলো ছিল জীবন্ত ছবির মত। পরিপূর্ণ দক্ষতার সাথে জীবন্ত চিত্রকল্প ব্যবহারের মাধ্যমে তিনি তার কবিতার ভাষাকে বেশ সমৃদ্ধ করেছন। যেমন : پیشة عشق বা প্রেমের পেশা শিরোনামের গযলে তিনি বলছেন :

به کاخ وصل تو پر مي فشاندم از سر شوق
کنون ز سنگ جدايي شکسته بال شدم
به دست تیر و کمان آمدم به پیشة عشق
شکار شیر نگاه تو اي غزال شدم

(শাহরিয়ার[৬৬], প্রথম খন্ড, পৃ: ২৯৭)

উচ্চারণ ঃ

বে কা'খে ভাসলে তু পার মী ফেশান্দা'ম আয সারে শোওক্ব,

কানূন যে সানগে জোদা'য়ী শেকাস্তে বা'ল শোদাম।

বেদাস্তে তীর ও কামা'ন অ'মাদাম পীশেয়ে এশ্ক্ব,

শেকা'রে শীর নেগা'হে তো এ্যয় গাযাল শোদাম ॥

অর্থ ঃ

অনেক আসা নিয়ে পাখা মেলেছিলাম তোমার মিলন প্রসাদের দিকে,

তোমার বিচ্ছেদের পাথরের আঘাতে এখন ডান ভাঙ্গা (পাখির) মত হয়ে গেছি।

তীর আর ধনুক হাতে প্রেমের পেশায় নেমেছিলাম,

কিন্তু হায়! তোমার ব্যার্ঘ দৃষ্টির কাছে শিকারী হরিণে পরিণত হয়েছি ॥

এখানে কবি নিজের ভালবাসা, প্রেম, বিরহ, বিচ্ছেদ, পেমিকার নির্দয় আচরণ ও প্রেমির শেষ পরিণতিকে শিকারী, বাঘ, হরিণ, ডানা ভাঙ্গা পাখি প্রভৃতি চিত্রকল্প দ্বারা চমৎকার ভাবে চিত্রিত করেছেন।

তেমিনি ভাবে তার ماه نخشب গযলে বলছেন :

تا روي روز در خم زلف شب اوفتاد
یک آسمان ز دیده من کوکب اوفتاد
خورشید رخ ز صبح گریبان طلوع ده

تـا مـاه تـيـره روز بـه چـاه شب اوفـتـد

(শাহরিয়ার[৬৬], প্রথম খন্ড, পৃ: ১৫৩)

উচ্চারণ ঃ

তা' রুয়ে রূয দার খা'মে যোল্‌ফে শা'ব ওফতা'দ,

এক অ'সেমা'ন যে দীদে মান কাউকাব ওফতা'দ।

খুরশীদ রোখ যে সোব্‌হে গারীবা'ন ত্বোলুউ দে,

তা' মা'হে তীরে রুয বে চা'হে শাব উফতা'দ ॥

অর্থ ঃ

যখন দিনের চেহারা রাতের ঝোলানো চুলের বক্রতার নিচে ঢাকা পড়ল,

আমার চোখ থেকে এক আকাশ তার ঝরে পড়ল।

সূর্য যখন ভোরের কাধ থেকে মুখ তুললো,

দিনের আন্ধকারচ্ছন্ন চাদ যেন রাতের কুয়ায় হারিয়ে গেল ॥

রাত ও দিনের আবর্তনকে খুব চমৎকার ভাবে তিনি এই কবিতায় চিত্রিত করেছেন।

অনুরূপভাবে তার خزان جاودانـي বা অবিনশ্বর হেমন্ত গযলে তিনি বলছেন :

مـژه سوزن رفـو كـن، نـخ او ز تـار مـو كـن

كـه هـنـوز وصلـه ي دل دو سه بـخيـه كـار دارد

دل چـو شكستـه سـازم ز گـذشتـه هـاي شيـريـن

چـه تـرانـه هـاي مـحزون كـه بـه يـادگـار دارد

(শাহরিয়ার[৬৬], প্রথম খন্ড, পৃ: ১৫৭)

উচ্চারণ ঃ

মোয়ে সুযান রেফো কোন, নোখে উ যে তা'রে মূ কোন,

কে হানুয ভাসলেয়ে দেল দো সে বা'খেয়ে কা'র দা'রাদ।

দেল চো শেকাস্তে সা'যাম যে গোযাশ্‌তেয়ে শীরীন,

চে তারা'নে হা'য়ে মাহযূন কে বে ইয়া'দেগা'র দা'রাদ ॥

অর্থ ঃ

চোখের পাঁপড়িকে সুঁই বানাও আর চুল কে বানাও তার সুতা,

কারণ হৃদয়ের মিলনের জন্য এখনো দুই-তিনটি সেলাই প্রয়োজন।

মধুময় দিনের অতিক্রান্তে আমার হৃদয় ভেঙ্গে ফেলেছি,

কতই না বিরহের গান স্মৃতির স্মারক করে নিয়েছি ॥

প্রিয়তমার দেওয় দুঃখ বেদনাকে চমৎকার ভাবে এই কবিতায় তিনি চিত্রিত করেছেন।

গঠন ও প্রকৃতি :

শাহরিয়ারের কবিতগুলো আধুনিক ও ক্ল্যাসিক ধারার সংমিশ্রনে লিখিত। তাতে একদিকে নিযামি, হাফিয, অওহেদি, ও সালমান সাওজির কবিতার বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান, অন্যদিকে আধুনিক কবিতার ভাষাগত বৈশিষ্ট্য তার কবিতাকে ফারসি সাহিত্যের শ্রেষ্ঠত্বের আসনে বসিয়েছে।

শাহরিয়ারের কবিতা বোঝার মূল মাধ্যম হলো গযল। তার মতে :

ÔÔKweZvi †jLvi Rb¨ wZwb Mhj‡K wbe©vPb K‡ibwb eis Rxeb KvwnwbB Zv‡K Mhj wbe©vPb Ki‡Z eva¨ K‡i‡Q|ÖÖ (হুকুকী, পৃ: ৬১)

তার গযলগুলো হৃদয়গ্রাহী ও অত্যন্ত স্পর্শকাতর। শাহরিয়ারের চিন্তা–চেতনা, আবেগ–অনুভূতি ও জীবনের অভিজ্ঞতা গুলোকে গযলের ভেতর উজাড় করে দিয়েছেন। বাহিহ্যিক, আভ্যন্তরিণ ও অর্থগত ছন্দের সামঞ্জস্যতার মাধ্যমে গযল গুলো আধুনিক যুগের শ্রেষ্ঠ গযলের মর্যাদা লাভ করেছ। দিভানের অবস্থিত চারশত গযল, গযল রচনায় তার পারদর্শিতার প্রমান বহন করছে। মালেকুশ শোয়ারায়ে বাহার সহ অন্যান্য গবেষকদের মতে :

ÔÔnwd‡hi ci kvnwiqvi-B dviwm Mhj‡K cYiæ¾weZ K‡i‡Qb|

শাহরিয়ারের গযলগুলোকে দুটি যুগে ভাগ করা যায়। প্রথমটি দুনিয়াবি প্রেমের জ্বালা–যন্ত্রনার যুগ। দ্বিতীয়টি বিষন্নতার যুগ বা আধ্যাত্মিক প্রেমের যুগ। (মাশিরী[৫১], পৃ: ৪২) নিমা ইউশিয, শাহরিয়ারের هذيان دل গযলটিকে শ্রেষ্ঠ গযল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। سه تار গযলটিও শাহরিয়ারের প্রসিদ্ধ গযল সমূহের মধ্যে একটি, এই গযল দুইটিতে কবি তাঁর জীবনচিত্র তুলে ধরেছেন। গযল লেখার ক্ষেত্রে শাহরিয়ার অধিকাংশ জায়গায় হাফেজকে অনুস্মরণ করেছেন। হাফিযের চিন্তা–চেতনাকে আধুনিক ভাষায় গযলের ভেতর নিয়ে এসেছেন। (শাহরিয়ার[৬৬], প্রথম খন্ড, পৃ: ১৯)

গযল ছাড়াও শাহরিয়ার কিছু উল্লেখযোগ্য মাসনাভি লিখেছেন। منظومه ي تخت جمشيد তাঁর একটি বিখ্যাত মাসনাভি। এই মাসনভিটিতে, তিনি ইরানের প্রাচীন শৌর্য–বির্য্যের ইতিহাস তুলে ধরেছেন ও এর সাথে বর্তমান ইরানের একটি তূলনামূলক আলোচনা করেছন।

কিছু চমৎকার 'কেতয়া' কবিতাও তিনি লিখেছেন। کودک و خزان তার বিখ্যাত একটি কেতায়া যা آخرین برگ গল্প আবলম্বনে লেখা হয়েছে। এই কেতায়ার কিছু অংশ নিচে তুলে ধরা হলো :

مادري بود و دختر و پسري
پسرک از مي محبت مست
دختر از غصه ي پدر مسلول
پدرش تازه رفته بود از دست
یک شب آهسته با کنایه، طبیب
گفت با مادر این نخواهد رست

(শাহরিয়ার[৬৬], দ্বিতীয় খন্ড, পৃ: ১০৬২)

উচ্চারণ ঃ

মা'দারী বূদ ও দোখতার ও পেসারী,
পেসারাক আয মেই মোহাব্বত মাস্ত।
দোখতার আয গোস্‌সেয়ে পেদার মাসলূল,
পেদারাশ তা'যে রাফতে বূদ আয দাস্ত।
এক শাব অ'হেস্তে বা' কেনা'য়ে ত্বাবিব,
গোফত বা' মা'দার ঈন নাখা'হাদ রাস্ত ॥

অর্থ ঃ

একজন মা, তার এক কন্যা ও এক পুত্র ছিল,
পুত্রটি তার মদের নেশায় মাতাল ছিল।
কন্যাটি বাবার দুঃখে মৃত প্রায় ছিল,
কারণ তার বাবা কিছুদিন আগেই মারা গিয়েছিল।
একরাতে ডাক্টার আস্তে করে ইশারায়,
তার মা কে বললেন, সে আর মুক্তি পাবেনা।

ক্ল্যাসিক গঠনের পাশাপাশি আধুনিক গঠনের কবিতা বা নিমা ইউশিযের মুক্ত কবিতার অবলম্বনে বেশকিছু কবিতা লেখেন। پیام ایـنشتین তার লেখা মুক্তধারার একটি কবিতা। এই কবিতায় তিনি একজন আইনেস্টাইন চেয়েছেন, যার কাছে নিজস্ব প্রতিভাকে বিনিময় করবেন এবং এর দ্বারা

সমাজের নিপিড়ীত মানুষের দুঃখ দূর্দশাকে দূর করা সম্ভব হবে। دو مرگ بهشت তাঁর আধুনিক কবিতার আরেকটি উদাহরণ, যেখানে স্বপ্নের ভেতর পারস্পরিক কথা বার্তার মাধ্যমে নিজের আধ্যাত্মিক চিন্তা- চেতনাকে তুলে ধরেছেন।

سهندیه কবিতার মাধ্যমে শাহরিয়ার আধুনিক মোস্তাযাদ কবিতার দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন। এই কবিতাটি ২৬০ মেসরা সম্বলিত। কবিতাটি তিনি আযারবাইযানের কবি সাহান্দিয়ে কে অনুসরণ করে লিখেছেন।

চিন্তা-চেতনা ও বিষয়বস্তু :

শাহরিয়ার প্রায় সব ধরণের বিষয়বস্তু নিয়ে কবিতা লিখেছেন। তার কবিতাগুলো নিজের জীবনের খুব কাছাকাছি ছিল। ছোটবেলার বিভিন্ন স্মৃতি, না পাওয়ার বেদনা, জীবনের ব্যর্থতা, প্রেম, বিরহ, নিজস্ব ধর্ম বিশ্বাস প্রভৃতি দ্বারা শাহরিয়ারের কবিতাগুলো পরিপূর্ণ ছিল।

শাহরিয়ার ছিলেন সাধারণ মানুষের কবি। সাধারণ মানুষের চাওয়া-পাওয়, দুঃখ-বেদনার চিত্র তাঁর কবিতার মধ্যে ফুটে উঠেছে। তিনি দেশ নিয়ে কবিতা লিখেছেন, দেশের মানুষের কথা বলেছেন। তার সমসাময়িক যুগের খুব কম কবিদের মধ্যে এই বৈশিষ্ট্যাবলী দেখতে পাওয়া যায়।

পুরো ফারসি সাহিত্য জুড়েই, বিশেষ করে ফারসি গযলে অধ্যাত্মবাদের একটি প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। শাহরিয়ারের গযলও দুনিয়া ত্যাগ, পার্থিব জীবনের প্রতি অনিহা, আখেরাতের প্রতি আগ্রহ প্রভৃতি আধ্যাত্মিক বিষয়বস্তু দ্বারা পরিপূর্ণ। حاتم درویشان، باده ي حسرت، کارگاه آدم سازي، دروغ اي دنيا، راز و نياز প্রভৃতি গযলে উপরোক্ত বিষয়াবলী দেখতে পাওয়া যায়। (মোহাম্মদি[৫৩], পৃঃ ২৪)

শাহরিয়ারের কিছু কিছু কবিতা সামাজিক, ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও জাতীয় বিষয়াবলী নিয়ে লেখা। বিশেষ করে বিভিন্ন উৎসব, যুদ্ধ-বিগ্রহ, যোদ্ধাদের মাহত্ম বর্ণনা, বিভিন্ন যুগের সাংস্কৃতিক রীতি নিতি, ইরানের হৃত গৌরব ফিরিয়ে আনার আকাঙ্খা প্রভৃতি বিষয়বস্তু নিয়ে কবিতাগুলো লেখা হয়েছে। شب و علي، به پيشگاه آذربايجان، تخت جمشيد، کودک قرن طلا، ماتم پدر প্রভৃতি কবিতাগুলো এই সমস্থ বিষয়বস্তু নিয়ে লেখা।

ইসলামী বিপ্লব নিয়েও তিনি অনেক কবিতা লিখেছেন। ইমাম খোমেনির প্রশংসা, বিপ্লবের বৈশিষ্ট্যাবলী, এই বিপ্লবে সাধারণ জনতার অংশগ্রহণ ও তাদের মনোভাব ইত্যাদি বিষয় সমূহ তার বিপ্লবী কবিতায় স্থান পেয়েছে।

নস্টালিজম বা হৃদয়ের ব্যাকুলতার বহিঃপ্রকাশ শাহরিয়ারের কবিতার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। ডঃ আলি মোহাম্মাদী বলেন :

> ÔÔZvi Kcv‡ji fv‡R †e'bvi †h †iLv d‡U D‡VwQj, Zvi gv‡S A‡bK bv cvIqvi †e'bv jwK‡q wQj, †mB †e'bvi ewntcKvk gv‡S gv‡SB Zvi KweZvi g‡a¨ †'L‡Z cvIqv hvq| ني محزون، اقبال من، بگذار بميرم، هجران کشيده ام،

فغان دل، cfwZ KweZvq Kwei †m j‡Kv‡bv †e‘bv¸‡jv‡K wZwb e¨³ K‡i‡Qb|(মোহাম্মদি[৫৩],পৃ: ২৫)

যেমন ঃ তিনি তার اقبال من বা আমার সৌভাগ্য গযলে বলছেন :

تیره گون شد کوکب بخت همایون فال من
واژگون گشت از سپهر واژگون اقبال من
خندة بیگانگان دیدم نگفتم درد دل
آشنایا با تو گویم گریه دارد حال من

(শাহরিয়ার[৬৬], প্রথম খন্ড, পৃ: ৩৫)

উচ্চারণ ঃ

তীরে গুন শোদ কাউকাবে বাখ্তে হুমায়ূনে ফা'লে মান,
ভাঙ্গেগুন গাশত আয সেপাহার ভাঙ্গেগুনে এক্বা'লে মান।
খানদেয়ে বিগা'নগা'ন দীদাম নগোফতাম দারদে দেল,
অ'শেনা'ইয়া' বা' তো গোইয়াম গারইয়ে দা'রাদ হা'লে মান ॥

অর্থ ঃ

হুমায়ুনের মত আমার ভাগ্য তারকাও অন্ধকারচ্ছন্ন হয়ে গেছে,
আমার ব্যার্থ ভাগ্য তারা আকাশ থেকে ঝরে পরেছে।
অপরিচীতদের হাসি দেখেছি তবু বলিনি আমার হৃদয়ের ব্যাথা,
ওগো আমার সুপরিচিতা তোমায় বলি, আমার আছে অনেক কান্না ॥

***

بگذار بمیرم চলে যাও মরে যাব শিরোনামের কবিতায় বলেন :

اي دل چو رخ دوست بیني به مقابل
جاني است اماني به تو بسپار بمیرم
شهري به تو یار است و من غمزده باید

در شهر تو بي یار و پرستار بمیرم

(শাহরিয়ার[৬৬], প্রথম খন্ড, পৃ: ৩০৬)

উচ্চারণ ঃ

এই দেল চো রোখে দুস্ত বীনী বে মাক্বাবেল,

জা'নিস্ত আমা'নি বে তো বেসপা'র বেমীরাম।

শাহরি বে তো ইয়া'র আস্ত ভা মান গামযাদে ব'ইয়াদ,

দার শাহরে তো বী ইয়া'র ও পারাস্তা'র বেমীরাম ॥

অর্থ ঃ

ওগো হৃদয়, আমার বন্ধুর মুখ, সামনে থেকে চেয়ে দেখ,

আমার প্রাণ তোমার জন্য আমানত হিসেবে গচ্ছিত রেখেছি, তোমার জন্যই মরে যাব।

পুরো শহর তোমার বন্ধু আর আমি চির-দুঃখি,

তোমার শহরে আমি বন্ধুহীন হয়ে রইব ও তোমার আরাধণা করেই মরে যাব ॥

***

تو تشنه ي غزل شهريار من به كه بگويم

كه شعر تر نتراود برون ز طبع حزيني

(শাহরিয়ার[৬৬], প্রথম খন্ড, পৃ: ২২৫)

উচ্চারণ ঃ

তো তেশনেয়ে গাযালে শাহরইয়া'রে মান বে কে গোয়াম,

কে শে-রে তার নাতারা'ভাদ বোরুন যে ত্বাবয়ে হাযীনী ॥

অর্থ ঃ

তুমি শাহরিয়ারের গযলের পিপাসায় কাতর, কিন্তু আমি কাকে বলবো যে,

অশ্রুসিক্ত কবিতা দুঃখ ভরাক্রান্ত মন ছাড়া বের হতে পারে না ॥

সহানুভূতি বা অনুকম্পা প্রদর্শন, শাহরিয়ারের কবিতার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। অপরের ব্যাথায় তিনি ব্যাথিত হয়েছেন, অন্যর দুঃখ কষ্টে নিজেও কষ্ট পেয়েছেন। এই সহানুভূতিশীলতার মূল উৎস ছিলতার জীবনের ব্যার্থ প্রেম। طوطی خوش لهجه (সু সময়ের তোতা পাখি) حالا چرا (এখন কেন), نی مخزون (চিন্তিত বাশি), سه تار من (আমার সেতারা), نیما غم (নিমা হৃদয়ের ব্যাথা বল), وحشی شکار (শিকরির পাশবিকতা) প্রভৃতি গযলে তার অনকম্পার প্রতিফলন দেখা যায়।

শাহরিয়ারের লিখিত গযলসমূহ তাঁর আবেগ অনুভূতি ও ব্যক্তিগত চরিত্রের প্রতিফলন ঘটিয়েছে। যে সমস্থ কবিতায় তার সূক্ষ অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ দেখতে পাওয়া যায় সেগুলো হলো اي وي مادرم، كودك و خزان، بهشت گمشده، صبا مي ميرد، প্রভৃতি।

শাহরিয়ার একজন আদর্শবাদী কবি ছিলেন। কবিতায় তিনি নীতি ও আদর্শের কথা বলেছেন। স্বাধীনতাবোধ, ন্যায়পরায়নতা, সত্যবাদিতা, খোদাপ্রেম প্রভৃতি ছিল তার কবিতার মূল উপজীব্য।

রাতের প্রতি শাহরিয়ারের একটি বিশেষ আকর্ষণ ছিল। কারণ অধিকাংশ সময়েই তিনি সারা রাত জেগে থাকতেন। অনেক কবিতাতেই রাতের বর্ণনা নিয়ে এসেছেন। রাতের বন্দনা গেয়েছেন কিংবা রাতকে কেন্দ্র করেই পুরো কবিতা লিখেছেন। 'আফসানিয়ে শাব' মাসনাভিটি এই ধরণের একটি কবিতা।

দেশপ্রেম শাহরিয়ারের কবিতার একটি বিশেষ উপাদান। দেশের মাটি, মানুষ, পানি, বয়ু প্রভৃতি নিয়ে তিনি অনেক কবিতা লিখেছেন।' ঈদে খুনে গযল, ও 'মেহমানে শাহরিয়ার' কাসিদায় কবির দেশপ্রেমের ওযন পরিমাপ করা যায়। এই দেশপ্রেম শুধু বর্তমান সময়ের ইরান নয় বরং হাখামানশি সম্রাট ও কুরেশে কাবিরের সময়ের পুরো পারস্য সম্রাজ্যের প্রতি ব্যাক্ত করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি ফেরদৌসির শাহনামার জতিয়তাবদের কথা উল্লেখ করেন। ফেরদৌসি নামক একটি কেতয়া কবিতায় তিনি এ প্রসঙ্গে বলেন :

در قعر هزار ساله غار قرون

از كشور يادهاي يك قوم اصيل

كانجا غرق غرور قوميت اوست

يك منظره شكوهمندي خفته است

يك دورنماي دلفروز تاريخ

ايران قديم!

(শাহরিয়ার[৬৬], দ্বিতীয় খন্ড, পৃ: ৯৮২)

উচ্চারণ ঃ

দার ক্বে-রে হেযা'র সা'লে গা'রে ক্বারূন,

আয কেশভারে ইয়াদ হা'য়ে এক ক্বাওমে আসীল।

কা'নজা' গারকে গুরুরে ক্বাওমিয়াতে উস্ত,

এক মানযেরেয়ে শোকুমান্দী খোফতে আস্ত।

এক দুর নোমায়ে দেলফোরুযে তা'রীখ,

ইরানে ক্বাদীম ! ॥

অর্থ ঃ

কারূনের গুহার হাজার বছরের গভীরতার মধ্যে,

একটি দেশের একটি মৌলিক জাতির স্মৃতিতে।

একটি জাতিয়তাবাদের অহংকার নিমজ্জিত হওয়ার ইতিহাস,

ও মর্যাদাময় একটি দৃশ্য ঘুমিয়ে আছে।

আর চিত্তাকর্ষক ইতিহাসের একটি দুর দৃষ্টি,

হায়রে প্রাচীন ইরান! ॥

যারা পাশ্চাত্য সমাজকে ও সংস্কৃতিকে নিজের সংস্কৃতির চাইতে বেশী পছন্দ করে বা গুরুত্ব দিয়ে থাকে কবি তাদের কঠোর সমালোচনা করেছেন। তাঁর কোন এক বন্ধু বিদেশে যাবার আমন্ত্রন জানালে তিনি তার উত্তরে এই কবিতাটি লিখেন :

جان من بازآ به جاي خود كه جانان پيش ماست

مدعي آرايش تن ميكند، جان پيش ماست

با چراغ علم راه بتپرستان ميروند

كعبه چشم انداز ما و راه ايمان پيش ماست

آفتاب حكمت از مشرق به مغرب ميرود

چشمه زاينده اشراق و عرفان پيش ماست

(http://www.azarpadgan.com/)

উচ্চারণ ঃ

জা'নে মান বা'য অ' বে জা'য়ে খুদ কে জা'না'নে পীশে মা'স্ত,

মোদ্দায়ী অ'রা'য়েশে তান মী কোনাদ, জা'নে পীশে মা'স্ত।

বা' চেরা'গে এলম রা'হে বুত পারাস্তান মীরাভাদ,

কা-বে চাশম আন্দাযে মা' ভা রা'হে ঈমান পীশে মাস্ত।

অ'ফতা'বে হেকমাত আয মাশরেক্ব বে মাগরেব মী রাভাদ,

চাশমে যায়ান্দেয়ে আশরাক্ব ভা এরফান পীশে মা'স্ত ॥

অর্থাৎ ঃ

প্রিয় বন্ধু আমার ফিরে আস নিজের জায়গায়, যেখানে আছে অমাদের প্রাক্তন প্রিয়তমারা,

যেখানে আমাদের পুরোনো সে হৃদয়, দেহকে সাজাতে চাইছে।

জ্ঞানের প্রদীপ নিয়ে আজ সবাই সে পৌত্তলিকতার পথে হাটছে,

কা'বা হলো আমাদের দৃষ্টিকোন, আর ঈমানী রাস্তা আমাদের সামনে।

জ্ঞানের সূর্যলোক পূর্ব থেকে পশ্চিমে চলে যাচ্ছে,

অবিনশ্বর ঝর্ণা ও অধ্যাত্মবাদ আমাদের কাছে ॥

যুবকদেরকে তিনি দেশের ভিত্তি মনে করেন। ইরানি যুবকদেরকে, দেশের সেবায় উৎসর্গ হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন :

پيام من به گردان دليران

جوانان و جوانمردان ايران

يكي غريدنم بايد كه چون رعد

كند آشفته خواب نره شيران

يك جنبش پديد آيد اساسي

در اين كشور مدارس با مديران

(http://www.azarpadgan.com/)

উচ্চারণ ঃ

পায়া'মে মান বে গারদা'নে দেলীরা'ন,

জাভা'না'ন ভা জাভা'ন মারদা'নে ইরা'ন।

একী গারীন্দাম বা'ইয়াদ কে চুন রা-দ,

কোনাদ অ'শফাতে খা'বে নারে শীরা'ন।

এক জানবেশ পাদীদ অ'ইয়াদ আসা'সী,

দার ঈন কেশভার মাদা'রেস বা' মোদীরা'ন ॥

অর্থ ঃ

আমার বক্তব্যের (দায়ভার) ইরানি বীরদের জন্য,

ইরানি সাহসী যুবক-যুবতীদের জন্য।

আমার বজ্রের মত একটি কণ্ঠস্বর থাকা উচিত,

যা মর্দা বাঘের ঘুমকেও বিঘ্নিত করে।

এই দেশের বিদ্যালয় এবং এদের পরিচালকদের মধ্যে,

একটি মৌলিক আন্দোলন গড়ে তোলা প্রয়োজন ॥

আযারবাইজানকেও তিনি ইরানের অংশ হিসেব মনে করেন। তাই আযারবাইযানের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করতে চেয়েছেন। কাফকাজ প্রদেশ ইরানিদের হাতছাড়া হওয়ার জন্য ইরানি কাযার বংশীয় বাদশাদেরকে দোষারোপ করেন। তার কবিতায় ইরানকে ঘুমিয়ে থাকা শিংহ ও রাশিয়াকে ধূর্ত শিয়ালের সাথে তুলনা করে বলেন :

گله گرگ به مکر و تزویر

شیر خوابیده کند غافلگیر

گويي آنها كه فرا مي‌رفتند

گاه برگشته چنين مي‌گفتند:

الوداع اي افق روشن و باز

شهره گهواره گيتي قفقاز

اي كه تا بازپسين تير و تفنگ

(http://www.azarpadgan.com/)

উচ্চারণ ঃ

গেল্‌লেয়ে গোরগ বে মাক্‌র ও তাযভীর ,

শীর খা'বীদে কোনাদ গা'ফেলগীর।

গোয়ী অ'নহা' কে ফারা' মী রাভাদ,

গা'হ বারগাশতে চোনীন মী গোফতান্দ।

আলভেদা- এই উফক্বে রওশান ও বা'য,

শাহরে গেহভারে গীতীয়ে ক্বাফক্বা'য।

এই কে তা' বা'য পাসীন তীর ও তাফাঙ্গ ॥

অর্থ ঃ

নেকড়ের পাল প্রতারণা আর কপটতা নিয়ে চলছে,

আর বাঘ উদাসীন হয়ে ঘুমিয়ে আছে।

ভাবছে তারা শুধু পথ চলছে,

যখন তারা ফিরে আসছে তখন এই কথা বলছে।

ওহে আলোকিত খোলা দিগন্ড় তোমাকে জানাই বিদায়,

ওহে কাফকাজের ছোট শহরসমূহ।

বিদায় সমস্থ গুলি ও রাইফেল কে ॥

শাহরিয়ারের কবিতায় ব্যাঙ্গাত্মক বিষয়াবলী দেখতে পাওয়া যায়। ব্যাঙ্গাত্মক কবিতায় তিনি নিজের জন্য قراضه রূপক নাম ব্যবহার করেছেন। ব্যাঙ্গাত্মক কবিতাগুলোতে সামাজিক সমালোচনা, রাজনৈতিক বিষয়াবলী আলোচনা করেছেন।

চিত্রকল্প

চিত্রকল্প বলতে কল্পনা শক্তি বা কোন দৃশ্য বা অবস্থার জীবন্ত চিত্র ফুটিয়ে তোলার ক্ষমতাকে বোঝানো হয়। ইংরেজীতে যাকে emagination বলা হয়। ফারসি কবিতায় প্রাচীন কাল থেকেই তাশবীহ, এস্তেয়ারা ও কেনায়ার মাধ্যমে গভীর চিত্রকল্প ব্যাবহৃত হয়ে আসছে। শাহরিয়ারও তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন। তার চিত্রকল্পগুলো মাওলানা, হাফিয, সানায়ি, ও সা'দির মত উচ্চমার্গের ছিল। তার বিখ্যাত মাসনাভি যিয়ারাতে কামালুল মুলকের শুরুতেই তিনি চিত্রকল্পের ব্যাবহার এমনভাবে করেছেন :

قد كشيده،گشاده پيشاني
گيسوان مجمع پريشاني
چشم چون نرگس بشكفته
نرگس ديگرش فرو خفته
اين يكي چون چراغ عالمتاب
وان دگر همچو بخت من در خواب

(শাহরিয়ার[৬৬], দ্বিতীয় খন্ড, পৃ: ৭৬৩)

উচ্চারণ ঃ

ক্বোদ কেশীদে, গোশা'দে পীশা'নী,
গীসুভা'নে মাজমায়ে পেরেশা'নী।
চাশমে চুন নার্গেসে বেশেকুফতে,
নার্গেসে দেগারাশ ফোরুখতে।
ঈন একি চোন চেরা'গে অ'লামতা'ব,
ভা'নে দেগার হামচু বাখতে মান দার খা'ব ॥

অর্থ ঃ

লম্বা গড়ন, প্রশস্থ কপাল,

এলোমেলো ঘন চুল।

তার একটি চোখ যেন প্রস্ফুটিত নার্গিস ফুল,

অপর চোখটি যেন না ফোটা ঘুমিয়ে থাকা একটি নার্গিস ফুল ।

(চোখ দুটোর) একটি যে জগৎ রাঙানো প্রদীপ,

আর অপরটি যেন স্বপ্নময় নিয়তি ॥

***

مرغان خيال وحشي من

تنها كه شدم برون بريزند

در باغچه ي شكفته ي شعر

با شوق و شعف به جست و خيزند

تا مي شنوند صوتي از دور

برگشته چو باد مي گريزند

(http://www.azarpadgan.com/)

উচ্চারণ ঃ

মোরগা'নে খেয়া'লে ওহশেয়ে মান,

তানহা' কে শোদাম বরুন বেরীযান্দ।

দার বা'গচেয়ে শেকোফতেয়ে শে-র,

বা' শওক্ব ও শা-ফ বে জুস্ত ও খীযান্দ।

বা' মেই শানভান্দান সুতী আয দূর,

বারগাশতে চো রা'দ মীগোরীযান্দ ॥

অর্থ ঃ

আমার কল্পনার বন্য পাখিগুলো,

নিঃসঙ্গ, বিক্ষিপ্ত ভাবে বের হচ্ছে।

প্রষ্ফুটিত কবিতার ফুলের বাগানে,

তার আনন্দ উচ্ছলতা ও স্ফিতির

শব্দ দুর থেকে শোনা যাচ্ছে

আবার কখনো পালিয়ে যাওয়া বাতাসের মত ফিরে আসছে ॥

অর্থাৎ কবি এখানে কবিতা লেখার ক্ষেত্রে তার কল্পনাগুলো কিভাবে জন্ম নেয় সে ব্যাপারে আলোচনা করেছেন।

শহরিয়ারের চিত্রকল্পগুলো অত্যন্ত জীবন্ত ও স্পর্ষকাতর ছিল। এই স্পর্ষকাতরতার কারণ ছিল, যখন তিনি কোন কিছু নিয়ে কল্পনা করতেন তখন, চিন্তায় এতটাই মগ্ন হয়ে যেতেন, যে স্থান, কাল, পাত্র সবকিছুই ভূলে যেতেন। (শাহরিয়ার[৬৬], প্রথম খন্ড, পৃ: ১৬)

শাহরিয়ারের বন্ধু জনাব যাহেদি এই বিষয়ে একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন। ঘটনাটি ছিল এরকম :

> ''শাহরিয়ার কখনো কখনো সবার সাথে দেখা সাক্ষাৎ বন্ধ করে দিতেন এবং ঘরের দরজা জনালা অটকে দিয়ে কয়েকদিন পর্যন্ত শুধু কবিতা নিয়ে ব্যাস্ত থাকতেন। এই রকম এক সময়ে আমি তার ঘরে প্রবেশ করলাম। দেখলাম তিনি চোখ দুটো বন্ধ করে দুই হাত উপরে তুলে অস্থিরভাবে হযরত আলী (আঃ) এর ওসিলায় আল্লাহর দরবারে মুক্তির প্রর্থনা করছেন। তাকে নাড়া দিয়ে বললাম : তোমার কি হয়েছে, এরকম করছ কেন? শাহরিয়ার দীর্ঘশ্বাস ফেলে বল্লেন : তুমি আমকে পানিতে ডুবে যাওয়া থেকে বাঁচালে। আমি বললম তুমি কি পাগল হয়ে গেছ? ঘরের মধ্যে পানি ছাড়া কিভাবে ডুবে যাবে? তিনি সামনে রাখা কাগজটি আমার দিকে এগিয়ে দিলেন, দেখলাম সেখানে 'আফসানিয়ে শাব' কবিতার কিছু অংশ ও সানফুনি বা টাইফুন কবিতা লেখা আছে। অর্থাৎ সমুদ্রের মধ্যে ঝড়ের কল্পনা করতে গিয়ে কবির এই অবস্থা হয়ে গিয়েছিল।" (শাহরিয়ার[৬৬], প্রথম খন্ড, পৃ: ১৬)

চিত্রকল্পসমূহ ব্যবহারের ক্ষেত্রে শাহরিয়ার নিজস্ব চিন্তা-চেতনা ও রচনাশৈলীকে কাজে লাগিয়েছেন। এই চিত্রকল্পকে নির্দিষ্ট কোনো সীমায় সীমাবদ্ধ করাটা কঠিন কাজ। তবে এতটুকু বলা যায় যে, একটি ঘটনাকে একোবারে জীবন্তভাবে মানুষের সামনে উপস্থাপন করেছেন এবং পাঠকদেরকে তার কল্পনার জগতে পরিপূর্ণ ভাবে প্রবেশ করাতে সক্ষম হয়েছেন। উদাহরণ স্বরুপ নিচের কবিতাটি :

آهسته باز از بغل پله ها گذشت
در فکر آش و سبزي بيمار خويش بود
او مرده است و باز پرستار حال ماست
در زندگي ما همه جا او ول مي خورد

هر كنج خانه صحنه اي از داستان اوست
در ختم خويش هم به سر كار خويش بود

بيچاره مادر من
او مرد و در كنار پدر زير خاک رفت
ديشب لحاف رد شده بر روي من كشيد
ليوان آب از بغل من كنار زد ،
در نصفه هاي شب.
يک خواب سهمناک و پريدم به حال تب
نزديک هاي صبح
او زير پاي من اينجا نشسته بود
آهسته با خدا ،
راز و نياز داشت
نه ، او نمرده است

(শাহরিয়ার[৬৬], দ্বিতীয় খন্ড, পৃ: ৮৬৩)

উচ্চারণ ঃ

অ'হেস্তে বা'য বাগালে পেল্লেহা' গোযাশত,

দার ফেক্বরে অ'শ ভা' সাবযিয়ে বিমা'রীয়ে খূদ বূদ।

উ মোরদে আস্ত বা'য পারাস্তা'রে হা'লে মা'স্ত,

দার যেন্দেগিয়ে মা' হামে জা উ ভল মীখূরাদ।

হার কোনজে খা'নে সাহনে ই আয দা'স্তা'নে উস্ত,

দার খাতমে খীশ হাম বে সারে কা'রে খীশ বূদ।

বীচা'রে মা'দারে মান,

উ মোরদে আস্ত ভা দার কিনা'রে পেদার যীরে খা'ক রাফত।

দিশাব লাহাফ রাদ শুদে বার রূয়ে মান কোশীদ,

লিভানে অ'ব আয বাগালে মান কিনা'র যাদ।

দার নেসফ্ হা'য়ে শাব,

এক খা'বে সাহামনা'ক পারীদাম বে হা'লে তা'ব।

নাযদিক হায়ে সুবহ,

উ যীরে পায়ে মান ইনজা' নেশাস্তে বূদ।

অ'হেস্তে বা' খোদা'

রা'যো নিয়া'য দা'শ্ত

না, উ না মোরদে আস্ত ॥

অর্থ ঃ

আস্তে করে সিড়ির কিনারা দিয়ে চলে গেছেন,

নিজের অসুস্থতার সুপ আর সব্জি নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন।

তিনি মরে গেছেন কিন্তু আমাদের অবস্থা নিয়ে এখনো ব্যস্ত আছেন,

আমাদের জীবনের প্রতিটি প্রান্তে নাড়া দিচ্ছেন।

আমাদের ঘরের প্রতিটি কোনে তার গল্পের মঞ্চ,

নিজেকে শেষ করে দিয়েও দায়িত্বগুলো সব করে গেছেন।

বেচারা আমার মা,

তিনি মারা গেছেন, আমার বাবার পাশে কবরস্ত হয়েছেন।

গত রাতে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে ছিলাম,

পানির গ্লাস আমার পাশে রাখা ছিল,

ঠিক মধ্য রাতে,

এক ভয়ঙ্কর স্বপ্ন জ্বরের মত আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল

ভোরের দিকে সে আমার পায়ের নিচে ঠিক এই যায়গায়

খোদার শপথ করে বলছি, আস্তে করে বসেছিল

কি প্রয়োজন আর রহস্য নিয়ে সে এসেছিল

না সে মরে নাই ॥

মায়ের স্নেহ ভরা স্মৃতি এবং মায়ের অভাব কিভাবে কবিকে যন্ত্রনা দিচ্ছে সে বিষয় নিয়েই তিনি এই কবিতাটি লিখেছেন। কবিতাটিতে মা কে এমন ভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে যাতে যে কারো শরীরের লোম দাড়িয়ে যাবে। কবির প্রতি সমবেদনা জেগে উঠবে, মনে হবে যেন, মা পাঠকের সামনে দাড়িয়ে আছে। এভাবেই শাহরিয়ার তার অসাধারণ কল্পনাশক্তি দিয়ে তার কবিতাগুলোকে প্রাণবন্ত করে তুলেছেন।

উদাহরণ হিসেবে 'হালা চেরা' নামক আরেকটি কবিতার কথা বলা যায়, যেখানে একজন প্রেমিকার বিশ্বাস ঘাতকতা এবং সে মূহুর্তে প্রেমিকের অসহায়ত্বকে চিত্রিত করেছেন। এই কবিতাটি তাঁর প্রসিদ্ধতম কবিতা গুলোর মধ্যে একটি। এই প্রসিদ্ধির একটি বড় কারণ হলো, বিষয়টিকে তিনি এমনভাবে চিত্রিত করেছেন যা পাঠকদের হৃদয়কে দারুণভাবে স্পর্শ করেছ।

শাহরিয়ারের তুর্কি কবিতাগুলোকেও বিভিন্ন তুর্কি উপমা ও প্রবাদের মাধ্যমে জীবন্ড় করে তুলেছেন। নিজের আবেগ অনুভূতি গুলোকে মাতৃভাষি মানুষের কাছে ব্যক্ত করেছেন। তার হায়দার বাবায়ে সালাম ও বেলালী বশ কবিতাগুলো এক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ।

পূর্ববর্তী কবিদের প্রভাব :

শাহরিয়ারের কবিতায় পূর্ববর্তী কবিদের, বিশেষ করে ক্ল্যাসিক কবিদের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ করে ফেরদৌসির জাতিয়তাবাদ ও বীরত্বগাঁথা, সনায়ির জ্ঞান বিজ্ঞান, নিজমির নাটকিয়তা, মৌলভির আধ্যাত্মিকতা, সা'দির কোমল বর্ণনা ভঙ্গির প্রভাব শাহরিয়ারের কবিতায় দেখতে পাওয়া যায়। তবে তিনি হাফিযকে সবচেয়ে বেশী অনুস্বরণ করেছেন। হাফিযের অধ্যাত্মবাদ ও গযলের প্রভাব শাহরিয়ারের গযল সমূহে অনুভব করা যায়। হাফিযের প্রভাব কবির জীবনে এতটাই প্রবল ছিল যে, দিভানে হাফিজের মাধ্যমে তিনি তার কাব্য নামকে পরিবর্তন করেন। (পৃ- ২ এর দ্রষ্টব্য)

কবি নিজেই বলেছেন :

از کودکي با دو کتاب" قرآن" وغزليات" حافظ" بزرگ شده ام»

আর্থাৎ ঃ ছোট বেলা থেকেই দুটি বইয়ের মাধ্যমে বড় হয়েছি, '' কোরআন" ও ''দিভানে হাফিয''।

তিনি আরো বলেন :

بعد حافظ دهني خوش به غزل باز نشد
عارفان فقل ادب بر در اين خانه زدند

(শাহরিয়ার[৬৬], প্রথম খন্ড, পৃ: ২১০)

উচ্চারণ ঃ

বা-দ হা'ফিয দাহানিয়ে খূশ বে গাযল বা'য নাশোদ,

আ'রেফা'ন ফুক্বলে আদাব বার দারে ইন খা'নে যাদান্দ ॥

অর্থ ঃ

হাফিযের পর গযলের জন্য আর কোন মিষ্টি মুখ উম্মুক্ত হয়নি,

কারণ সাধকেরা এই গৃহে আদবের তালা ঝুলিয়ে দিয়েছে ॥

কবি হাফিয ৭২৪ হি: কা: ইরানের শিরায নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। ছোট বেলাতে বাবাকে হারনোর ফলে আর্থিক দৈন-দশার মধ্যে বড় হন। কিশোর বয়সেই মহল্লার রুটির দোকানে চাকরী নেন। কিন্তু সে কারণে তার পড়া-লেখা থেমে থাকেনি। স্থানিয় জ্ঞানী-গুনি ব্যক্তিদের কাছে তিনি যাতায়াত করতেন। জীবনে শুরুর দিকেই তিনি পুরো কোরআন মুখস্থ করেন। সে জন্যই হাফিয নামে তিনি অধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তার উপাধী ছিল ' লিসানুল গায়ব'[i] বা অদৃশ্যের ভাষ্যকার। যদিও হাফিয সব ধরণেরই কবিতা লিখেছেন তারপরও গযলের জন্যই তিনি অধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন। ৭৯২ হি: তিনি জন্মস্থান শিরাযে ইন্তেকাল করেন। (ফাজেলী[৪১], পৃ: ১০৭-১২২)

শাহরিয়ারের অনেক কবিতা ছন্দ, কাফিয়া, বিষয়বস্তু, চিত্র কল্প ও শব্দ চয়নের দিক থেকেও হাফেযের স্পষ্ট প্রভাব লক্ষ করা যায়। জনাব رضا براهني বলেন :

گرايش او به حافظ بيش از هر شاعر ديگر را هم، دقيقا در همين ميل دروني صورتِ نوعي شاعرانگي او بايد جست. شهريار شاعري است كه در پشتِ سرش، شاعر بزرگتري را مي بيند كه «لسان الغيب» است. شهريار در سراسر حياتِ شاعري خود مي‌خواست «لسان الغيب» بشود، و اين از ويژگي‌هاي روحي و رواني صورتِ نوعي شاعر است.

[i] লিসানুল গায়ব বা অদৃশ্যের ভাষ্যকার ছিল কবি হাফেজ শিরাজির উপাধি।

অর্থাৎ ঃ হাফিযের প্রতি তার আগ্রহ অন্যান্য সকল কবিদের চাইতে বেশী ছিল, সূক্ষভাবে তিনি হাফিযের কাব্য প্রতিভাকে অনুভব করতে চেয়েছেন। শাহরিয়ার তার পৃষ্টপোষকতাকারি কবি হিসাবে লিসানুল গায়েবকেই জেনেছেন। তিনি তার সারা জীবনের কাব্য দ্বারা লিসানুল গায়ব হতে চেয়েছেন। এটি ছিল শাহরিয়ারের কবিতার আভ্যন্তরীণ ও আত্মিক বৈশিষ্ট্য।

শাহরিয়ার সমসাময়িক কবিদের মধ্যে নিমা ইউশিযকে বিশেষভাবে অনুসরণ করেন। নিমায়ি কবিতার আদলেও তিনি কিছু কবিতাও রচনা করেন।

কোরআন ও ধর্মীয় বিষয়াবলি :

শাহরিয়ার ইসলামি বিপ্লবের প্রতি পূর্ণ সমর্থন ব্যাক্ত করেছেন। ইসলামি বিপ্লবে যারা নেতৃত্ব দিয়েছেন তাদের প্রশংসায় কবিতা লিখেছেন। শাহরিয়ারের কবিতাগুলো নিজস্ব ধর্মীয় বিশ্বাসের সাথে মিশে ছিল। তিনি কোরআন ও অহলে বেইতের আশেক ছিলেন। রাসুলে পাক (সাঃ), তার পরিবারবর্গ, আহলে বেইত সদস্যদের নিস্পাপ চরিত্র ও হযরত আলি (রাঃ) এর প্রসংশায় অসংখ্য কবিতা লিখেছেন। যেমন د ا غ حسين নামক কবিতায় বলেন :

محرم آمد و نو کرد درد و داغ حسين

گريست ابر خزان هم به باغ و راغ حسين

هزار و سيصد و اندي گذشت سال و هنوز

چو لاله بر دل خونين شيعه داغ حسين

به هر چمن که بتازد سموم باد خزان

زمانه ياد کند از خزان باغ حسين

هنوز ساقي عطشان کربلا گويي

کنار علقمه افتاده با ياغ حسين

اگر چراغ حسيني به خيمه شد خاموش

منور است مساجد به چلچراغ حسين

(শাহরিয়ার[৬৬], প্রথম খন্ড, পৃ: ৩৬৫)

উচ্চারণ ঃ

মোহার্‌রম অ'মাদ ও নু কারদ দারদ ও দা'গে হোসাইন,

গারীস্ত আবরে খাযা'ন হাম বে বা'গো রা'গে হোসাইন।

হেযার ও সীসাদ ও আন্দি গোযাশ্‌ত সা'ল ভা হানুয,

চো লা'লে বার দেলে খূনীনে শীয়ে দা'গে হোসাইন।

বে হার চামান কে বেতা'যাদ সামূমে বা'দে খাযা'ন,

যামা'না ইয়া'দ কোনাদ আয খাযা'ন বা'গে হোসাইন।

হানুয আ-তেশানে কারবালা গূয়ী,

কেনা'রে আলকেমে ওফতা'দে বা' আয়া'গে হোসাইন।

আগার চেরা'গে হোসাইনী বে খীমে শোদ খা'মূশ,

মোনাভ্‌ভার আস্ত মাসা'জেদ বে চোলচেরা'গে হোসাইন ॥

অর্থ ঃ

মহররম এলো, হুসাইনের ব্যাথা ভরা ক্ষতকে নতুন করে জাগিয়ে তুললো,

শরৎ এর মেঘ গুলোও যেন হুসাইনের বাগানে ও তার উপত্যকায় কাঁদছে।

তেরশত বছরের চেয়ে আরো বেশী কিছু সময় অতিক্রান্ত হয়েছে, কিন্তু এখনো,

শিয়াদের রক্তাক্ত বুকে টিউলিপ ফুলের মত হোসাইনের ক্ষত রয়ে গেছে।

প্রত্যেক তৃণভূমিতে শরৎ এর বিষাক্ত বায়ু বয়ে যাচ্ছে,

হোসাইনের বাগানের শরৎ ঋতুকে যেন সে স্মরণ করে বেড়াচ্ছে।

এখনো যেন কারবালার সেই তৃষ্ণার্ত সাকি বলছে,

আলকামার[i] কিনারায় পরে থাকা সেই রক্তভরা পেয়ালার কথা।

যদিও তাবু গুলোতে হুসাইনি প্রদীপ নিভে গেছে,

কিন্তু মসজিদ গুলো হুসাইনি ঝার বাতিতে আলোকিত হয়েছে ॥

اي همـاي رحمت را بـسرايـد كـه কবিতাটি তার সর্বোৎকৃষ্ট সাহিত্যকর্মের মধ্যে গন্য করা হয়।

অল্প বয়স থেকেই দিভানে হাফিয ও কোরআনের সাথে তিনি পরিচিত ছিলেন। হাফিযের দৃষ্টিকোন থেকেই তিনি কোরআ-ন কে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন।

শাহরিয়ারের কবিতার ধর্মীয় বিষয়াবলীকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। ক. শিয়া মাযহাব তথা রাসূলে পাক (সাঃ) ও তার পরিবারবর্গের প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগ, খ. ইসলামী বিপ্লবের প্রতি সমর্থন, গ. আধ্যাত্মিক বিষয়াবলী।

বিশেষ করে তার প্রসিদ্ধ কাসিদা দুটি قـيـام مـحمـد، عـلـي اي همـاي رحمت আল্লাহর রাসুল ও হযরত আলি (রাঃ) এর প্রশংসায় লিখেছেন। যেমন :

ستـون عرش خدا قـائـم از قـيـام مـحمـد (ص)

بـبـيـن كـه سر بـه كـجا مـي كـشد مـقـام مـحمـد (ص)

(শাহরিয়ার[৬৬], প্রথম খন্ড, পৃ: ৬৮)

উচ্চারণ ঃ

সোতুনে আরশে খোদা' ক্বা'য়েম আয ক্বিয়া'মে মোহাম্মদ,

বেবীন কে সার বে কোজা মী কোশাদ মাকা'মে মোহাম্মদ ॥

অর্থ ঃ

[i] কারবালার যে স্থানে হযরত হোসাই রাঃ শাহাদাত বরণ করেছিলেন, সে স্থানকে আলকামা বলা হয়।

মোহাম্মদ (সা:) এর স্থিতির দ্বারা আল্লাহর আরশের খুঁটি দাড়িয়ে আছে,

চেয়ে দেখ মোহাম্মদের মর্যাদা কোথা থেকে কোথায় গিয়ে পৌছেছে ॥

علي اي هماي رحمت কবিতায় তিনি বলছেন :

علي اي هماي رحمت تو چه آيتي خدا را ؟

كه به ما سوا فكندي همه سايه ي هما را

(শাহরিয়ার[৬৬], প্রথম খন্ড, পৃ: ৬৯)

উচ্চারণ ঃ

আলী এই হোমা'য়ে রাহমাত তো চে অ'য়াতী খোদা' রা',

কে বে মা' সূ আফকান্দিয়ে হামে সা'য়ীয়ে হোমা' রা' ॥

অর্থ ঃ

হে! আলি তুমি সৌভাগ্যময় রহমতের পাখি, তুমি খোদার কি অনুপম নিদর্শন,

তুমি আমাদের জন্য সকল সৌভাগ্যের আলো-ছায়া কে ছড়িয়ে দিয়েছ ॥

শাহরিয়ারের কবিতায় কোরআনের বিষয়াবলি নিয়ে তালহমিহ[i] লক্ষ্য করা যায়। যেমন :

قاف عزلت শিরোনামের গযলে তিনি সূরা আরাফের ১৪৩ নম্বর আয়াতের অর্থাৎ ولما جاء موسي لميقاتنا و كلمه ربه قال رب ارني انظر اليك قال لن تراني . . এর ঘটনা বর্ণনায় বলছেন :

جلوه كن كه سخن با تو كنم چون موسي

سينه ام سوخته در حسرت سينا گشتن

(শাহরিয়ার[৬৬], প্রথম খন্ড, পৃ: ৭১)

উচ্চারণ ঃ

[i] বিশেষ কোন ঘটনা, উদ্বৃতি বা কোন বক্তব্যকে কাব্যরূপে কবিতার মধ্যে নিয়ে আসাকে তালমিহ বলা হয়।

জালভা কোন কে সোখান বা' তো কোনাম চোন মূসা,

সীনে আম সূখতে দার হাসরাতে সিনা' গাশ্তান ॥

অর্থ ঃ

তোমার নিজেকে প্রজ্জ্বলিত কর, কারণ তোমার সাথে মুসার মত কথা বলব,

সিনা পর্বতের অনুশোচনায় আমার হৃদয় পুড়ে গেছে ॥

دل شکسته শিরোনমের গযলে সূরা হিজর এর ৮৭ নম্বর আয়াত ولقد اتيناک سبعا من المثاني والقرآن العظيم এর বিষয় বস্তুকে তার কবিতায় এভাবে নিয়ে এসেছেন :

توسل چارده معصوم را کن

که قرآن خواندشان سبع المثاني

(শাহরিয়ার[৬৬], প্রথম খন্ড, পৃ: ৪১৭)

উচ্চারণ ঃ

তাভাস্সোলে চা'রদাহে মা-সূম রা' কোন,

কে কোরআন খা'ন্দে শা'ন সাবউল মাসা'নী ॥

অর্থ ঃ

নিষ্পাপ চৌদ্দ ইমামের শরণাপন্ন হও ,

কারণ তাদের কথাই সাবউল মাসানি[i] কোরআন ॥

جمع و تفريق শিরোনামের গযলে সূরা আলে ইমরানের ১২২ নম্বর আয়াত অর্থাৎ و ي الله فليتوكل المؤمنون প্রসঙ্গে তিনি বলছেন :

گر دوستان به علم و هنر تکيه کرده اند

[i] কোরআনকে সাতটি পঠন পদ্ধতিতে অবতীর্ণ করা হয়েছে, একে সাবউল মাসানি বলা হয়।

ما را هنر نداده خدا جز توكلي

(শাহরিয়ার[৬৬], প্রথম খন্ড, পৃ: ৪০৬)

উচ্চারণ ঃ

গার দোস্তান বে এলমো হোনার তেক্কে কারদে আন্দ,

মা' রা' হোনার নাদা'দে খোদা' জুযে তাভাক্কুলী ॥

অর্থাৎ ঃ

যদিও বন্ধুরা জ্ঞান ও শিল্পকে অবলম্বন করে কিন্তু,

প্রভু আমাকে তাওয়াক্কুল ছাড়া আর কোন শিল্প দেয়নি ॥

ولقد كرمنا بني آدم قرآن مه و مهر শিরোনমের গযলে সূরা আসরার ৮০ নম্বর আয়াত, অর্থাৎ এর পসঙ্গে তিনি বলছেন :

از ازل خلعت تشريف به دوش تو و من

تا ابد آيد تكريم به شأن من و توست

(শাহরিয়ার[৬৬], প্রথম খন্ড, পৃ: ১১৪)

উচ্চারণ ঃ

আয আযল খালআতে তাশরীফ বে দূশে তো ভা মান,

তা' আবাদ অ'য়াদ তাকরীমে বে শা'নে মান ও তুস্ত ॥

অর্থ ঃ

সৃষ্টির শুরু থেকেই সম্মানের পোষাক তোমার-আমার কাঁধে,

সৃষ্টির শেষ পর্যন্ত তোমার আমার জন্য সম্মান থাকবে ॥

কাব্যলংকার :

এলমে বাদিয়ি বা অলংকার শাস্ত্রের সুনিপুন ব্যাবহার শাহরিয়ারের কবিতাগুলোকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছ। অত্যন্ত দক্ষতার সাথে তিনি তাশবিহ, এস্তেয়া'রা, কেনা'য়া, মাজা'জ, তা'রিজ, মোবালাগা, তাযাদ, তাকরীর, তাশখিস, জেন্নাস, খেতাব, নেদা, সুয়াল, এস্তেফাহাম প্রভৃতি অলংকার সমূহকে নিজ কাব্যে ব্যবহার করেছেন।

তাশবীহ[i] বা উপমা যে কোন সাহিত্যে সর্বাধিক ব্যবহৃত কাব্যলংকার। শাহরিয়ার তার কবিতায়, ক্ল্যাসিক কবিতায় ব্যবহৃত পুরোনো উপমাসমূহ অধিক ব্যবহার করেছেন। যেমন :ভ্রু কে ধনুকের সাথে, চোখের পাঁপড়িকে তীর এর সাথে, মুখমন্ডল কে ফুলের কলির সাথে তুলনা করার পাশাপাশি অনেক নতুন নতুন উপমাও তিনি ব্যবহার করেছেন। যেমন :

هنوز از آبشار ديده دامان رشک دريا بود
که ما را سينه آتشفشان آتشفشاني کرد

(শাহরিয়ার[৬৬], প্রথম খন্ড, পৃ: ১৭৩)

উচ্চারণ ঃ

হানূয আয অ'বশা'রে দীদে দা'মান রাশকে দারইয়া' বূদ,
কে মা' রা' সীনেয়ে অ'তাশফেশা'ন অ'তাশফেশানি কারদ ॥

অর্থ ঃ

এখনো চোখের ঝর্ণা ধারা সাগরকে ইর্ষান্বিত করছে,
আমাদের বুকের অগ্নি গিরি থেকে অগ্নুৎপাৎ করছে ॥

এই কবিতায় কবি চোখকে ঝরনার সাথে, চোখ থেকে ঝরে পড়া অশ্রুকে সাগরের সাথে, হৃদয়ের দীর্ঘশ্বাসকে আগ্নেয়গিরির সাথে চমৎকারভাবে তাশ্বীহ করেছেন। তিনি আরো বলছেন :

به بيشة تو مرا هم پلنگ عشق دريد
چه کودکانه گرفتار خط و خال شدم

(শাহরিয়ার[৬৬], প্রথম খন্ড, পৃ: ২৯৭)

উচ্চারণ ঃ

বে বীশেয়ে তো মারা' হাম পেলাঙ্গে এশক্ দারীদ,
চে কুদেকা'নে গেরেফতা'রে খাত্তো খা'ল শোদাম ॥

[i] কোন গুনাবলী বা সাদৃশ্যের কারণে দুটো জিনিসের মধ্যে তূলনা করাকে তাশবীহ বলে। তাশবীহ এর চারটি রোকন বা মূল ভিত্তি আছে। ১.মোশাব্বাহ বা যাকে তূলনা করা হয়, ২. মোশাব্বাহ বে বা যার সাথে তূলনা করা হয় ৩. আদাতে তাশবীহ বা যে শব্দ দিয়ে তূলনা করা হয় ৪. ওযহে শাবেহ বা যে কারণে তূলনা করা হয়। (আযম, পৃ- ১৯২)

অর্থ ঃ

তোমার জঙ্গলের প্রেমের চিতাবাঘ আমাকেও বিদীর্ণ করেছে,

কি ছেলে মানুষি করেই সেই তিলের রেখার কাছে বন্দি হয়েছি ॥

কবি এখানে প্রেমিকাকে ঘন জঙ্গলের সাথে, প্রেমকে হিংস্র চিতাবাঘের সাথে, প্রতারীত প্রেমিককে আচ্ছন্নকারী তিলের সাথে তুলনা করে অসাধারণ এক তাশবীহ এর দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন যা ইতপূর্বে ফারসি সাহিত্যে দেখতে পাওয়া যায়না। আবার پیشه تو، پلنگ عشق শব্দ দুটিকে নতুন ধরণের মাযাযি অর্থে ব্যাবহার করেছন।

অনুরূপ নিচের কবিতায় বলছেন :

چو شهسوار فلک گر به نیزة زرین

گلوي شب نشکافم فکنده باد سرم

(শাহরিয়ার[৬৬], প্রথম খন্ড, পৃ: ৩০৩)

উচ্চারণ ঃ

চো শাহসাভা'রে ফালাক্ব গার বে নীযেয়ে যারীন,

গেলুয়ে শাব নাশকা'ফাম ফেকান্দে বা'দে সারাম ॥

অর্থাৎ ঃ

যদিও আকাশের নভোচারি তার সোনালি বর্শা উম্মুক্ত করেছে,

রাত তার গলাকে বের করেনি, তবে আমার মাথায় নিক্ষেপ করেছে ঝড়ো বাতাস ॥

এখানে তিনি সূর্যকে নভোচারীর সাথে, সূর্যের আলোকে সোনালী বর্শার সাথে, ভোর বেলার আলো আধারের মিশ্রনকে রাতের গলার সথে তুলনা করেছেন। আবার এর পরের বেইতে রাতের গলাকে মাযাযি অর্থে ব্যবহার করেছেন। এ ধরণের তাশবীহ ফারসি সহিত্যে একেবারেই নতুন।

তিনি আরো বলছেন :

كشيده دايره، اشكم به دور مردم خونين

چنانكه حلقة انگشتري عقيق يمن را

(শাহরিয়ার[৬৬], প্রথম খন্ড, পৃ: ৮৭)

উচ্চারণ ঃ

কেশীদে দা'য়েরে, আশ্কাম বে দওরে মারদোমে খূনীন,

চোনানকে হালক্বেয়ে আঙ্গুশতারী আক্বীক্বে ইয়ামেন রা' ॥

অর্থ ঃ

রক্তাত্ব মানুষের কালচক্র আমার চোখে অশ্রু-ধারা তৈরী করেছে

যেমনি ভাবে ইয়েমেনী আকিক পাথর দ্বারা আংটি তৈরী করা হয় ॥

তিনি এখানে চোখের তারাকে রক্তের মহল, এবং চোখকে অকিক পাথর এবং অশ্রুকে আংটির সাথে তাশবীহ করেছেন, যে ধরণের তাশবীহ আজ পর্যন্ত ফারসি সাহিত্যের কোন কবি ব্যবহার করেননি।

خون سياوش নামক গযলে বলছেন

دل بيماري نتابد تب آن نرگس مست

مگر از شربت لعلش شكري نوش كنيم

(শাহরিয়ার[৬৬], প্রথম খন্ড, পৃ: ৩৩২)

উচ্চারণ ঃ

দেলে বীমা'রী নাতা'বাদ তাব অ'ন নার্গেসে মাস্ত,

মাগার আয শারবাতে লা-লাশ শেকারী নূশ কোনীম ॥

অর্থাৎ

ঐ মাতাল করা নার্গিস ফুলের উত্তাপে কাতর হৃদয় উষ্ণতা পায় না,

তবুও ঐ রুবী পাথরের শরবত থেকে মিষ্টি শরাব পান করব ॥

এখানে প্রিয়ার চোখকে নার্গিস ফুলের সাথে, এবং প্রিয়ার ঠোটকে রুবি পাথরের শরবতের সাথে এস্তেয়ারা করেছেন। অনুরূপ ভাবে নিচের কবিতায় কবি বলছেন :

مژه سوزن رفو کن، نخ او ز تار مو کن
که هنوز وصله ي دل دو سه بخیه کار دارد
دل چو شکسته سازم ز گذشته هاي شیرین
چه ترانه هاي محزون که به یادگار دارد

http//www.sid.ir.com/

উচ্চারণ ঃ

মোজ্বে সূযান রাফূ কোন, নোখে ঊ যে তা'রে মূ কোন,
কে হানূয ভসলেয়ে দেল দো সে বাখিয়ে কা'র দা'রাদ।
দেল চো শেকাস্তে সা'যাম যে গোযাশ্তে হা'য়ে শীরীন,
চে তারা'নে হা'য়ে মাহযূন কে বে ইয়া'দেগা'র দা'রাদ ॥

অর্থ ঃ

চোখের পাঁপড়িকে সুঁই বানও আর চুল কে বানাও তার সুতা,
কারণ হৃদয়ের মিলনের জন্য এখনো দুই-তিনটি সেলাই প্রয়োজন।
মধুময় দিনের স্মরণে আমার হৃদয় ভেঙ্গে ফেলেছি,
কতই না বিরহের গান স্মৃতির স্মারক করে নিয়েছি ॥

কবি এখানে চেখের পাঁপড়িকে গোলাকৃতির ক্ষতর সাথে তুলনা করেছেন এবং সেটিকে প্রিয়ার চুল দিয়ে সেটিকে সেলাই করার যে দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন, তা কেবল মাত্র একজন সিদ্ধ হস্ত কবির পক্ষেই সম্ভব।

শাহরিয়ারের কবিতায় প্রচুর পরিমানে এস্তেয়ারার ব্যবহার লক্ষ করা যায়। এস্তেয়ারা ঐ তাশবীহ কে বলা হয় যেখানে উপমিত ব্যক্তি বা বস্তুকে উল্লেখ করা হয়না। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় : প্রিয়ার ঠোটকে রুবি পাথরের সাথে তুলনা করার পর কবিতায় শুধু রুবি পাথরের উল্লেখ করা এবং প্রিয়ার ঠোটকে উল্লেখ না করা। যেমন শাহরিয়ার বলছেন :

دل بيماري نتابد تب آن نرگس مست

مگر از شربت لعلش شكري نوش كنيم

http//www.sid.ir.com/

উচ্চারণ ঃ

দেলে বীমা'রী নাতা'বাদ তাব অ'ন নার্গেসে মাস্ত,

মাগার আয শারবাতে লা-লাশ শেকারী নূশ কোনীম ॥

অর্থাৎ ঃ

ঐ মাতাল করা নার্গিস ফুলের উত্তাপে কাতর হৃদয় উষ্ণতা পায় না

তবুও ঐ রুবি পাথরের শরবত থেকে মিষ্টি শরাব পান করব ॥

এখানে নার্গিস কে প্রিয়ার চোখের সাথে এবং شربت لعل বা রুবি পাথরের শরবতকে প্রিয়ার ঠোটের সাথে তুলনা করেছেন।

কবি আরো বলছেন :

شمع من با دگران انجمن آراسته اي

تا مرا سوز دل افزوده و جان كاسته اي

(শাহরিয়ার[৬৬], প্রথম খন্ড, পৃ: ৩৭৯)

উচ্চারণ ঃ

শাময়ে মান বা' দেগারা'ন আঞ্জুমান অ'রাস্তে-ই

তা' মারা' সূযে দেল আফযূদে ভা জা'ন কা'স্তে-ই ॥

অর্থ ঃ

আমার প্রদীপ অন্যদের সাথে আসর সাজাচ্ছে

আর এই দিকে আমার হৃদয় জ্বালা বেড়ে যাচ্ছে আর প্রাণ নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে ॥

এখানে شمع বা প্রদীপ কে معشوق বা প্রেমিকার মোস্তেয়ারে হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। আবার বেইতে ব্যবহৃত افزودن ও كاستن শব্দ দুটি পরস্পর متضاد বা বিপরিতার্থক শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

তিনি আরেক গযলে বলছেন :

بياد نرگس مست تو تا شدم مخمور

خيال خواب به چشمم به خواب مي گذرد

(শাহরিয়ার[৬৬], প্রথম খন্ড, পৃ: ১৬৮)

উচ্চারণ ঃ

বিয়া'দে নার্গেসে মাস্তে তো তা' শোদাম মাখমূর

খেয়া'লে খা'ব বে চাশমাম বে খা'ব মী গোযারাদ ॥

অর্থ ঃ

তোমার মাতাল করা নার্গিস ফুলের স্মরণে আমি বিভোর হয়ে গেছি

ঐ স্বপ্নময় কল্পনা আমার দু'চোখকে ঘুমের রাজ্যে নিয়ে যায় ॥

এই কবিতায় نرگس مست মাতাল করা নার্গিস ফুলকে প্রিয়ার চোখের সাথে এস্তেয়ারা করেছেন, আবার خواب শব্দটি দু'বার ব্যবহার করে তিনি তেকরার করেছেন।

শাহরিয়ারের কবিতায় মোবালাগার ব্যবহার ব্যপক ভাবে দেখতে পাওয় যায়। উদাহরণ হিসেবে শাহরিয়ারের এই কবিতাটি :

تا روي روز در خم زلف شب اوفتاد

يک آسمان ز ديده من کوکب اوفتاد

خورشيد رخ ز صبح گريبان طلوع ده

تا ماه تيره روز به چاه شب اوفتد

(শাহরিয়ার[৬৬], প্রথম খন্ড, পৃ: ১৫৩)

উচ্চারণ ঃ

তা' রূয়ে রূয দার খামে যোলফে শাব উফতা'দ,

এক অ'সেমা'ন যে দীদে মান কাউকাব উফতাদ।

খূরশীদ রোখ যে সোবহে গারীবা'ন তোলুউ দেহ,

তা' মা'হে তীরে রূয বে চা'হে শাব উফতাদ ॥

অর্থ ঃ

যখন দিনের চেহারা রাতের ঝোলানো চুলের বক্রতার নিচে ঢাকা পড়ল,

আমার চোখ থেকে এক আকাশ তার ঝরে পড়ল।

সূর্য যখন ভোরের কাধ থেকে মুখ তুললো,

দিনের আন্ধকারচ্ছন্ন চাদ যেন রাতের কুয়ায় হারিয়ে গেল ॥

কবি এখানে বলছেন যখন দিনের মুখে রাতের বাকানো চুলের জুলফি ঝুলে পড়ল আমার চোখ থেকে এক আকাশ তারা ঝড়ে পড়ল। তার মূল বক্তব্য হলো' যখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসল বা জীবনের সায়াহ্নকাল উপস্থিত হলো, আমার অবস্থা দেখে চোখ থেকে পানি ঝড়ে পড়ল। কবি এই কথাটিকে সরাসরি না বলে মোবালাগার আশ্রয় নিয়ে কবিতার কাব্য সৌন্দর্য্যকে আরো বাড়িয়ে দিলেন। তিনি বললেন দিনের আলো রাতের জুলফিতে ঢাকা পড়ল অর্থাৎ দিনের আলো ফুরিয়ে রাত এলো, এরপর তিনি চোখের পানিকে এক আকাশ তারার সাথে তাশবীহ করে বল্লেন আমার চোখ থেকে অশ্রু ঝরে পড়ল। আবার দিন ও রাতকে একসাথে এনে তিনি তাযাদ এর ব্যাবহার করেছেন।

অনরূপভাবে নিচের বেইতটি :

گویند مرگ سخت است بود، راست گفته اند

سخت است لیک سخت بر از انتظار نیست

(শাহরিয়ার[৬৬], প্রথম খন্ড, পৃ: ১২৭)

উচ্চারণ ঃ

গোইয়ান্দ মারগ্ সাখ্ত আস্ত বূদ, রাস্ত গোফতে আন্দ

সাখ্‌ত আস্ত লীক সাখ্‌ত বার আয এন্তেযা'র নীস্ত ॥

অর্থ ঃ

বলা হয় মৃত্যু খুব কঠিন, কথাটি সত্যই বলা হয়েছে

মৃত্যু কঠিন কিন্তু অপেক্ষা করার চাইতে কঠিন কিছু নয় ॥

এই কবিতায় কবি অপেক্ষাকে মৃত্যুর চাইতেও কঠিন বলে মোবালাগায়ে মাতবু করেছন। আবার সাখত শব্দটিকে তিনবার এনে তিনি জেন্নাস এর ব্যাবহার করেছেন।

অনুরূপভাবে নিচের বেইতে তিনি বলছেন :

گر بدین جلوه به دریاچة اشکم تابي

چشم خورشید شود خیره ز رخشاني ها

(শাহরিয়ার[৬৬], প্রথম খন্ড, পৃ: ৯৪)

উচ্চারণ ঃ

গার বেদীন জালভা বে দারইয়া'চেয়ে আশকাম তা'বী,

চাশম্ খুরশীদ শাভাদ খীরে যে রোখশা'নী হা' ॥

অর্থ ঃ

যদি এই দ্যুতি আমার অশ্রুর সাগরে ছড়িয়ে দাও,

তবে সেই উজ্জ্বলতায় সূর্যের চোখও স্তিমিত হয়ে যাবে ॥

কবি এই বেইতে নিজের চোখের পানিকে সাগর এবং প্রেমিকার সৌন্দর্য্যে সূর্যের চোখ স্তিমিত হয়ে যাবে বলে চমৎকার দুটি মোবালাগা করেছেন, আবার সূর্যের চোখকে তিনি এখানে মাযাজি অর্থে ব্যাবহার করেছেন।

কবি আরো বলছেন :

شب است و چشمم به راه ستارة سحرم

كه تا سپيده دم امشب ستاره مي شمرم

سپاه صبحدم و تيغ آفتاب كجاست

كه با ستاره ستيز است و جنگ با قمرم

(শাহরিয়ার[৬৬], প্রথম খন্ড, পৃ: ৩০৩)

উচ্চারণ ঃ

শাব আস্ত ভা চাশমাম বে রা'হে সেতা'রেয়ে সাহ্‌রাম,

কে তা' সেপীদে দামে এমশাব সেতা'রে মিশোমারাম।

সেপা'হে সোবহেদাম ও তীগে অ'ফতা'ব কোজা'স্ত,

কে বা' সেতা'রে সাতীযাস্ত ও জাঙ্গ বা' ক্বামারাম ॥

অর্থ ঃ

এখন রাত, আমার দু'চোখ ভোরের তারার দিকে তাকিয়ে,

আজ রাতে ভোরের সাদা রেখা না ফোটা পর্যন্ত তারা গুনে যাব।

ভোরের সৈনিক আর সূর্যের আলোর ধারালো তরবারী কোথায়,

কারণ তারারা খুব জেদী আর অমার কলহ চাদের সাথে ॥

কবি বলছেন অমি আজ রাত থেকে ভোর পর্যন্ত আকাশের তারা গুনে যাব কিন্তু ভোরের সৈনিকের আর সূর্যের আলোর ধারালো তরবারী কোথায়। এখানে তারা গুনাকে অপেক্ষার অর্থে মোবালাগা করা হয়েছে এবং ভোরের সৈনিক ও সূর্যের আলোর তরবারীকে শান্তি ও শৃঙ্খলার মাজাযি অর্থে ব্যাবহৃত হয়েছে।

শাহরিয়ার তার কবিতায় প্রচুর পরিমানে মাজাযি শব্দ ব্যবহার করেছেন। বিভিন্ন প্রকার মাজাযি শব্দের ব্যাবহার তার কবিতায় দেখতে পাওয়া যায়। যেমন :

لب لعل تو كه تشنه است به خون دل من

نمكيده است ز پستان مروّت لبني

(শাহরিয়ার[৬৬], প্রথম খন্ড, পৃ: ৪২৪)

উচ্চারণ ঃ

লাবে লা-লে তো কে তেশনে আস্ত বে খূনে দেলে মান,

নামকীদে আস্ত যে পেস্তা'ন মোরাভ্ভাত লাবানী ॥

অর্থ ঃ

তোমার রুবী পাথরের মত লাল ঠোট আমার হৃদয়ের রক্তের জন্য তৃষ্ণার্ত হয়ে আছে

আর লবনাক্ত হয়ে আছে মহানুভবতার স্তনের দুধ ॥

মহানুভবতার স্তনের দুধ লবনাক্ত করে তোমার রুবি পাথরের মত লাল ঠোট আমার হৃদয়ের রক্তের জন্য তৃষ্ণার্ত হয়ে উঠেছে। মহানুভবতার কোন স্তন বা দুধ থাকতে পারেনা। কবি এখানে প্রেমিকার বে-ইনসাফি বোঝাতে শব্দটি ব্যাবহার করেছেন। আবার প্রেমিকার ঠোটকে রুবি পাথরের সাথে তূলনা করে চমৎকার তাশবীহ করেছেন।

শাহরিয়ারের কবিতায় جناس এর ব্যবহার প্রচুর পরিমানে দেখতে পাওয়া যায়। যেমন নিচের মেসরায় তিনি বলছেন :

چو فریاد هزار آید شود دردم هزار اي گل

(http//www.sid.ir.com)

মেসরাটিতে তিনি هزار শব্দটিকে جناس হিসেবে ব্যাবহার করেছেন। প্রথম বার বুলবুলির অর্থে এবং দ্বিতীয় বার عدد বা সংখ্যা হিসেবে। তিনি আরো বলছেন :

جز من به شهر یار کسي شهریار نیست

شهري به شاه پروري شهر یار نیست

(শাহরিয়ার[৬৬], প্রথম খন্ড, পৃ: ১২৭)

উচ্চারণ ঃ

জোযে মান বে শাহরে ইয়া'র কাসী শাহরইয়া'র নিস্ত,

শাহরী বে শা'হ পারভারী শাহরিয়া'র নিস্ত ॥

অর্থ ঃ

আমি ছাড়া বন্ধুর শহরে আর কোন বাদশা নেই,

বাদশা তৈরীর জন্য শাহরিয়ারের শহর ছাড়া আর কোন শহর নেই ॥

উপরের বেইতে شهريار শব্দটি তিনবার ব্যাবহার করে جناس করেছেন। প্রথমবারে দক্ষিন ইরানের প্রচলিত গল্প অর্থে, দ্বিতীয় বার নিজের নাম হিসেবে এবং তৃতীয় বার যৌগিব বাক্য হিসেবে ব্যাবহার করেছেন। এছাড়াও তার কবিতায় خطاب، ندا، سوال و استفهام প্রভৃতি প্রচুর পরিমানে দেখতে পাওয়া যায়। যেমন নিচের কবিতাটি :

مه من هنوز عشقت دل من فكار دارد

تو يكي بپرس از اين غم كه به من چه كار دارد

(শাহরিয়ার[৬৬], প্রথম খন্ড, পৃ: ১৫৭)

উচ্চারণ ঃ

মাহে মান হানূয এশক্বাত দেলে মান ফেকা'র দা'রাদ,

তো একী বেপোরস আয ইন গাম কে বে মান চে কা'র দা'রাদ ॥

অর্থ ঃ

ওগো আমার চাঁদ, এখনো তোমার প্রেম আমার হৃদয়ে চিন্তার জন্ম দিচ্ছে,

তুমি অন্য কাউকে প্রশ্ন কর, এই চিন্তা দিয়ে আমার লাভ কি হবে ॥

ارجمند مقام কবিতায় তিনি বলছেন :

اي زده طعنه لب لعلت به قند

قيمت قند لب لعلت به چند

(শাহরিয়ার[৬৬], প্রথম খন্ড, পৃ: ৪৯৫)

উচ্চারণ ঃ

এই যাদে ত্বা-নে লাবে লা-লাত বে ক্বান্দ,

ক্বিমাতে ক্বান্দ লাবে লা-লাত বে চান্দ ॥

Dhaka University Institutional Repository

অর্থাৎ ঃ

ওগো! তোমার রুবি পাথরের মত ঠোঁটের তিরস্কার যেন মিছরি খন্ড,

আর এই রুবি পাথরের ঠোটের মিছরি খন্ডের মূল্যই বা কত ॥

তিনি আরো বলছেন :

تا كه بيني چو منت يار نيست

بي خبري تا به كي و تا به چند

(শাহরিয়ার[৬৬], প্রথম খন্ড, পৃ: ৪৯৬)

উচ্চারণ ঃ

তা' কে বীনী চো মান্নাতে ইয়া'র নীস্ত,

বী খাবারী তা' বে কেই ভা তা' বে চান্দ ॥

অর্থ ঃ

যত কিছুই দেখ কেন প্রিয়ার অনুগ্রহের মত আর কিছু নেই,

ওহে! আর কতদিন তুমি বেখবর হয়ে থাকবে ॥

এই কবিতায় خرت به چند শব্দটি خطاب হিসেবে ব্যাবহৃত হয়েছে, گهر فروش শব্দটি سوال و استفهام হিসেবে এবং گوهرت بچند শব্দটিও سوال و استفهام অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এধরণের কাব্যলংকারের ব্যবহার তার তুর্কি কাব্য গ্রন্থ হায়দার বাবায়ে সালামের মধ্যেও দেখতে পাওয়া যায়। যেমন তিনি বলছেন :

حيدربابا، ملاّ ابراهيم وار يا يوخ؟!

مكتب آچار اوخور اوُشاقلار يا يوخ؟!

خرمن اوستو مكتبي باغلار يا يوخ؟

(http//www.sid.ir.com)

ফারসি অনুবাদ ঃ

حیدربابا، ملاّ ابراهیم زنده است یا نه؟!

باز هم مکتبش دایر است و بچّه ها درس میخوانند یا نه؟!

در سر خرمن باز هم مکتب را میبندد یا نه؟

(http//www.sid.ir.com)

উচ্চারণ ঃ

হেইদার বা’বা’, মোল্লা এবরা’হীম যেন্দে আস্ত ইয়া’ না?

বা’য হাম মাকতাবাশ দা'য়ের আস্ত ও বাচ্চেহা’ দার্স মীখা’নান্দ ইয়া’ না?

দার সারে খারে মান বা’য হাম মাকতাব রা’ মী বান্দাদ ইয়া’ না? ৷৷

অর্থাৎ ঃ

হেইদার বা’বা মোল্লা ইব্রাহিম কি বেঁচে আছে না নেই?

তার মক্তব এখনও কি চলছে এবং বাচ্চারা কি সেখানে পড়ছে না পড়ছে না?

সে কি তার মক্তব বন্ধ করে দিবে না দিবে না? ৷৷

প্রথম মেসরার حیدر بابا শব্দটি خطاب হিসেবে, পরবর্তি মেসরাগুলোতে যথাক্রমে زنده است یا نه، می خوانند یا نه، می بندد یا نه، প্রভৃতি استفهام و سوال হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

بدیعی مقایسه বা তুলনামূলক কাব্যলংকারের ব্যবহার শাহরিয়ারের কবিতায় প্রচুর পরিমানে দেখতে পাওয়া যায়। যেমন নিচের গযলটিতে তিনি বলছেন :

دردناک است که در دام شغال افتد شیر

یا که محتاج فرومایه شود مرد کریم

(শাহরিয়ার[৬৬], প্রথম খন্ড, পৃ: ৩২৬)

উচ্চারণ ঃ

দারদনা'ক আস্ত কে দার দা'মে শেগা'ল ওফতাদ শীর,

ইয়া' মোহতা'জে ফোরুমা'য়ে শাভাদ মার্দে কারীম ॥

অর্থাৎ ঃ

বড়ই পরিতাপের বিষয় যে শিয়ালের ফাদে পড়েছে বাঘ,

তবে কি মহানুভব ব্যক্তিরা অভাবগ্রস্ড়দের মুখাপেক্ষি ॥

এখানে شغال ও شير এবং فرومايه ও كريم পরস্পর مقايسه হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

শাহরিয়ার তার কবিতায় 'তাযাদ' খুব চমৎকার ভাবে ব্যবহার করেছেন। যেমন তিনি বলছেন :

بهار عشق و جواني من خزان شد و من

هنوز عشق رخ گلعذارها دارم

(শাহরিয়ার[৬৬], প্রথম খন্ড, পৃ: ৩০০)

উচ্চারণ ঃ

বাহা'রে এশক ও জাভা'নিয়ে মান খাযা'ন শুদ ও মান

হানুয এশকে রোখে গোলয়েযা'র হা' দা'রাম ॥

অর্থ ঃ

আমার প্রেমের বসন্তকাল ও যৌবন হেমন্তে পরিণত হল,

অথচ আমি এখনো সেই ফুলের মত চেহারার প্রেমে পরে আছি ॥

এখানে বাহার ও খাযান, যৌবন ও বৃদ্ধ বয়সকে একসাথে এনে তাযাদ এর ব্যবহার করেছেন। তিনি আরে বলছেন :

بهر نان بر در ارباب نعيم دنيا

مرو اي مرد كه اين طايفه نامردانند

(শাহরিয়ার[৬৬], প্রথম খন্ড, পৃ: ২১৯)

উচ্চারণ ঃ

বেহ্‌রে না'ন বার দারে আরবা'বে নায়িমে দুনিয়া',

মারো এই মারদ কে ইন ত্বা'য়েফে না' মারদা'নান্দ ॥

অর্থাৎ ঃ

রুটির জন্য ভূস্বামীদের দারস্ত হয়েছে দুনিয়া,

তুমি সেথায় যেয়োনা হে পুরুষ কারণ, এই পরিক্রমণকারীরা কাপুরুষ ॥

এখানে মারদ ও না মারদ শব্দ দুটিকে পাশাপাশি এনে তিনি তাযাদ এর ব্যবহার করেছেন।

তিনি আরো বলছেন :

تا روي روز در خم زلف شب اوفتاد
يک آسمان ز ديده من کوکب اوفتاد
خورشيد رخ ز صبح گريبان طلوع ده
تا ماه تيره روز به چاه شب اوفتد

(শাহরিয়ার[৬৬], প্রথম খন্ড, পৃ: ১৫৩)

উচ্চারণ ঃ

তা' রূয়ে রূয দার খামে যোলফে শাব ওফতা'দ,

এক অ'সেমা'ন যে দীদে মান কাউকাব ওফতা'দ।

খূরশীদ রোখ যে সুবহে গারীবা'ন ত্বোলূউ দে,

তা' মা'হে তীরে রূয বে চা'হে শাব ওফতা'দ ॥

আর্থাৎ ঃ

যখন দিনের চেহারা রাতের ঝোলানো চুলের বক্রতার নিচে ঢাকা পড়ল,

আমার চোখ থেকে এক আকাশ তার ঝরে পড়ল।

সূর্য যখন ভোরের কাধ থেকে মুখ তুললো,

দিনের আন্ধকারচ্ছন্ন চাদ যেন রাতের কুয়ায় হারিয়ে গেল ॥

এই কবিতায় চাদের বিপরীথে সূর্য, রাতের বিপরীথে দিন, সূর্যদয়ের বিপরীথে সূর্যাস্ড়কে নিয়ে এসে একই বেইতে তিনি তিনটি তাযাদ ব্যবহার করে কাব্যলংকার ব্যবহারে কবির অসাধারণ নৈপুন্যতাকে প্রমান করেছেন।

তাকরীর বা পুনরাবৃত্তি শাহরিয়ারের কবিতায় প্রচুর পরিমানে দেখতে পাওয়া যায়। যেমন তিনি বলছেন :

خود چو آهو گشتم از مردم فراري تا كنم رام

آهوي چشم تو اي آهوي از مردم فراري

(শাহরিয়ার[৬৬], প্রথম খন্ড, পৃ: ৩৯১)

উচ্চারণ ঃ

খোদ চো অ'হু গাশ্তাম আয মারদোমে ফারা'রী তা' কোনাম রা'ম,

অ'হুয়ে চাশমে তু এই অ'হু আয মারদোমে ফারা'রী ॥

অর্থ ঃ

ফেরারি মনুষ থেকে যেন হরিণ হয়ে গেছি, কারণ বশীভূত করব,

তোমার হরিণ দুটি চোখ, ওগো ফেরারি মানুষের হরিণ ॥

তিনি আরো বলছেন :

چو ديدم يار با اغيار شد يار

ز تنهايي به حسرت يار گشتم

(শাহরিয়ার[৬৬], প্রথম খন্ড, পৃ: ২৯০)

উচ্চারণ ঃ

চো দীদাম ইয়া'র বা' আগইয়া'র শোদ ইয়া'র,

যে তানহা'য়ী বে হাসরাতে ইয়া'র গাশতাম ॥

অর্থ ঃ

যখন দেখলাম বন্ধু, আমার বন্ধু, অন্যের বন্ধু হয়ে গেছে,

আমার একাকিত্ব থেকে অনুতাপের বন্ধু হয়ে গেলাম ॥

অন্য একটি গযলে বলছেন :

مه من هنوز عشقت دل من فکار دارد

تو یکي بپرس از این غم که به من چه کار دارد

(শাহরিয়ার[৬৬], প্রথম খন্ড, পৃ: ১৫৭)

উচ্চারণ ঃ

মাহে মান হানুয এশকাত দেলে মান ফেকা'র দা'রাদ,

তো একী বেপোরস আয ইন গাম কে বে মান চে কা'র দা'রাদ ॥

অর্থাৎ ঃ

ওগো আমার চাঁদ, এখনো তোমার প্রেম আমার হৃদয়ে চিন্তার জন্ম দিচ্ছে,

তুমি কাউকে প্রশ্ন কর এই চিন্তা দিয়ে আমার কি লাভ হবে ॥

প্রথম বেইতে آهو শব্দটি তিনবার, দ্বিতিয় বেইতে یار শব্দটি তিনবার, তৃতীয় বেইতে من শব্দটি তিনবার পুনরাবৃত্তি করেছেন। এই পুনরাবৃত্তি শুধু কবিতার সৌন্দর্যকেই বৃদ্ধি করেনি বরং কবিতার সুর ও ছন্দ গতিময় করে তুলেছে।

তৃতীয় অধ্যায়

আধুনিক কবি হিসেবে শাহরিয়ার :

কবিতার বিষয়বস্তু, রচনাশৈলী, শব্দ চয়ন ও বর্ণনা ভঙ্গির সার্বিক বিচারে, কবি শাহরিয়ারকে সন্দেহাতীত ভাবে আধুনিক কবিদের কাতারে দাড় করানো যায়। বিশেষ করে ক্ল্যাসিক কবিতার আদলে ছন্দরীতিকে ঠিক রেখে, আধুনিক কবিতার যে দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন তা তূলনাহীন। শাহরিয়ারকে আধুনিক কবি হিসেব প্রমান করতে হলে ফারসি কবিতার উৎপত্তি-ক্রমবিকাশ ও যুগের ব্যাবধানে এর পরিবর্তন সম্পর্কে জানা দরকার।

সময় ও কাব্যরীতির দৃষ্টিকোন থেকে পর্যলোচনা করলে, ফারসি কাব্য সাহিত্যেকে আমরা আটটি যুগে (শামিসা[৬৩], পৃ: ১২-১৩) বা আটটি কাব্যশৈলিতে ভাগ করতে পারি। সেগুলো নিম্নরূপ :

ফারসি কাব্যরীতির প্রথম যুগ :

সাবকে খোরাসানি বা খোরাসানি কাব্যরীতির যুগ। এই যুগের সময়কাল ছিল হিজরী তৃতীয় শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে পঞ্চম শতক পর্যন্ড়। সাফ্ফারি, সামানি ও গাযনাভী শাসন আমল এই যুগের অন্তর্ভুক্ত।

২৫৪ হিজরিতে ইয়াকুব লেইস সাফ্ফার (মৃত্যু- ২৬৫ হিঃ) সিস্তানে স্বাধীন সাফ্ফারী রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন (আনুশে[৫], পৃ: ৯৪-১১৮) এবং ফারসি ভাষাকে ইরানের রাষ্ট্রীয় ভাষার মর্যাদা দেন। (কাসেমি[২০], পৃ: ১০৩) মূলত ঃ সাসানি রাজবংশের পতন ও সাফ্ফারী রাজবংশ প্রতিষ্ঠার মধ্যবর্তী সময়ে ইরানে কয়েকটি ভাষার প্রচলন ছিল। যরতুস্ত্রীয়দের ব্যাবহারিক ভাষা ছিল মধ্যযুগীয় যরতুস্ত্রীয় বা আবেস্তা ভাষা, মানু ধর্মালম্বীদের মুখের ভাষা ছিল মধ্যযুগীয় মানি ভাষা এবং মুসলমানদের মুখের ভাষা ছিল আরবী ভাষা। ইরানে আরবী ভাষা প্রচলনের ফলে ফারসি ভাষায়, অসংখ্য আরবী ভাষার মিশ্রণ ঘটে। যে কারণে এই যুগে ফারসি ভাষা উৎকর্ষতা লাভ করে।

২৬১ হিঃ সনে নসর বিন আহমদ সামানি বোখারায় সামানি রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। (আনুশে[৫], পৃ: ৯৪-১১৮) সামানি রাজাদের ক্ষমতা গ্রহণের মাধ্যমে ফারসি কাব্য সাহিত্যে নতুন যুগের সূচনা হয়। ফারসি সাহিত্যের বিস্তার ও প্রসারে অন্যান্য রাজত্বগুলোর তুলনায় সামানী রাজ দরবারের গুরুত্ব অনেক বেশি ছিল। যে সকল সামানী রাজা নিজেদেরকে প্রকৃত ও মূল ইরানি বলে জানতেন তারাই কেবল ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি অধিকতর গুরুত্বারোপ করেছিলেন। এই দৃষ্টিকোণ থেকে তারা ইরানি বীরত্বগাথার কাহিনীগুলো, তাফসির ও ঐতিহাসিক গ্রন্থসমূহ আরবী ভাষা থেকে ফারসি ভাষায় অনুবাদ করার জন্য নির্দেশ দিতেন। তার নির্দেশেই রুদাকি কালিলা ও দিমনার ফারসি অনুবাদ করেন। (Falconer, 23) তাদের দরবারে নূহ বিন মানসুর ও নসর বিন আহমাদের মত মন্ত্রীরা অবস্থান করতেন, যারা জ্ঞান-গরিমা, পান্ডিত্য ও সাহিত্যের অধিকারী ছিলেন ।

অন্যদিকে কেবল বুখারাই নয়, বরং সিস্তান, গযনি, গোরগান, নিশাপুর, রেই ও সামারকান্দ প্রদেশসমূহ ফারসি সাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে গণ্য হতো। এটা প্রমান করে যে, অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় পূর্বাঞ্চল ও খোরসানে সাহিত্যের ঔজ্জল্য ও সৌন্দর্য অধিক মাত্রায় বিকশিত হয়েছিল। আলে যিয়ারের দরাবরেও মুখাল্লাদি, গোরগানি, দেইলামি, কাযভিনি ও খোস্রুয়ে সারাখাসীর মতো কবিদের আনাগোনা ছিল। এ রাজবংশের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ বাদশা শামসুল মাইল কাবুস বিন ভাশামগির নিজেও ফারসি ভাষায় কবিতা রচনা করতেন। (তামীমদারী[৩২], পৃ: ৪৭)

এই যুগে ফারসি কবিতায় যে কাব্যশৈলী প্রচলিত ছিল, তাকে সাবকে খোরসানি বা খোরসানি কাব্যরীতি বলা হয়। মূলতঃ খোরাসানের অঞ্চলগুলোতে এই কাব্যরীতি প্রচলিত ছিল বিধায় একে খোরাসনী কাব্যরীতি বলা হয়। তৎকালীন খোরাসান , বর্তমান ইরানের খোরাসান প্রদেশ, আফগানিস্তান, তাজিকিস্তান ও তুর্কিস্তান নিয়ে গঠিত ছিল। এই জন্য এই 'সাবক' কে সাবকে তুর্কিস্তানি ও বলা হয়। (শামিসা[৬৩], পৃ: ২০) সাবক খোরাসরনীকে আমরা তিনটি ভাগে ভাগ করতে পারি।

1.Zv‡nwiqvb I mddwiqvb h‡Mi mveKt এই যুগের কাব্যরীতি সম্পর্কে খুব বেশী কিছু জানা যায় না, কারণ এই যুগের মাত্র আটজন কবি ও তাদের কবিতার মাত্র ৫৮ টি লাইন, বর্তমানে আবশিষ্ঠ

আছে। (শামিসা[৬৩], পৃ: ২১-২২) এই যুগের কবিগন হলেন : মুহম্মদ বিন ওয়াসিফ সাগযি, তিনি ইয়াকূব লেইস সাফ্ফার কর্মচারী ছিলেন এবং তৃতীয় হিজরীর মধ্যবর্তী সময়ে জিবীত ছিলেন (শামিসা[৬৩], পৃ: ২১) , বুস্সাম কারদ খারেযী, ফিরুয মাশরেকি (মৃত্যু-২৮৩ হিঃ), আবু সালেক গোগানি (২৬৫-২৮৭ হিঃ), হানযালা বাদগিছি (মৃত্যু-২২০হিঃ), মাহমুদ ভাররাক হারভী ও মাসউদ মারুযি।

এই যুগে 'কেত্য়া' কবিতার প্রচলন সবচেয়ে বেশী ছিল। 'কেতয়া' দুই বেইত বিশিষ্ঠ ঐ কবিতা কে বলা হয় যার মেসরা গুলোতে অন্তমিল থাকেনা। এই যুগের কবিতা গুলো ছিল সহজ, সরল ও জটিলতা মুক্ত। কাব্যলংকার ও শিল্পের ব্যাবহার এই যুগের কবিতার মধ্যে নেই বললেই চলে। আরবী শব্দের ব্যবহার এই যুগে খুব কমই দেখতে পাওয়া যায়। যে কারণে আবু সালেক গোরগানির কবিতায় আরবী শব্দের ব্যবহার একেবারেই নেই। হানযালা বাদগিসির কবিতায় মাত্র তিনটি আরবী শব্দ (خطر،عز، نعمت) পাওয়া যায়। (শামিসা[৬৩], পৃ: ২২) অন্যান্য কবিদের কবিতায়ও খুব সামান্য আরবী শব্দের ব্যাবহার দেখতে পাওয়া যায়। এ যুগের কবিতার বিষয়বস্তু ছিল জ্ঞানগর্ভ আলোচনা, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বর্ননা, বীরত্বগাথা ইত্যাদি।

2.mvgvbx h‡Mi Kve¨‰kjx : ফারসি সাহিত্যের ইতিহাসে এই যুগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন যুগ হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। ফারসি গদ্য ও পদ্য সাহিত্য এই যুগেই স্থিতিশীলতা লাভ করে। এই যুগের শুরুর দিকে ফারসি কবিতার জনক রুদাকি সামারকান্দি, মাঝামাঝি সময়ে ফররুখি সিস্তানি ও শেষের দিকে ফেরদৌসি ও উনসূরীর মত কবিদের আবির্ভাব ঘটেছিল। কবি ও কবিতার আধিক্যতা এই যুগের একটি অন্যতম বৈশিষ্ঠ। (সাফা[৬৯], প্রথম খন্ড পৃ: ১৩২) এই আধিক্যতার কারণ ছিল, সামানির রাজাগণ তাদের যুগের কবি সাহিত্যিকদের উৎসাহিত করার জন্য প্রচুর পরিমানে উপহার ও উপঢৌকন দান করতেন, যার বিস্তারিত বর্ণনা নিযামি আরুযির চাহারমাকালা গ্রন্থে পাওয়া যায়। (সামারকান্দি[৭০], পৃ: ১৩৩)

কেতয়া কবিতার পাশাপাশি এই যুগের কবিদের আরো অনেক নতুন ধরনের কবিতা যেমন : কাসিদা, গজল, মাসনাভি, মোসাম্মাত, তারযি-বান্দ সহ, প্রায় সব ধরণের কবিতা চর্চা করতে দেখা যায়। (সাফা[৬৯], পৃ: ৫১৩) এ যুগে মহাকাব্য লেখার একটি প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। এ যুগের প্রথম দিকে কাসায়ি মারুযি, মধ্যম অংশে দাকিকি ও শেষের দিকে মহকবি ফেরদৌসি ফারসি সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য শাহনামা রচনা করেন।

স্তুতিমূলক কবিতার প্রচলন এই যুগে বেশী দেখা যায়। কবিতার অন্যান্য বিষয়বস্তুগুলোর মধ্যে ছিলঃ সুলতানদের সুলতানদের দরবারের বর্ণনা ,বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদির বর্ণনা, প্রেম কাহিনি, যুদ্ধ বিগ্রহের বর্ণনা, প্রকৃতিক সৌন্দর্য, বীর এবং তাদের বীরত্বগাথা ইত্যাদী। জ্ঞান বিজ্ঞানের আলোচনা যথেষ্ট পরিমানে থাকলেও কোরআন হাদীস বা অন্যান্য ইসলামী বিষয়াবলীর আলোচনা এ যুগের কবিতার ভিতর দেখা যায়না।

ভাষাগত বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে এ যুগের কবিতা সহজ সরল ও জটিলতা মুক্ত। আরবী শব্দের ব্যাবহার খুব কম দেখা যায় বরং এমন কিছু ফারসি পুরোনো শব্দের ব্যাবহার লক্ষ্য করা যয়, যেগুলো পাহলভী ভাষার কাছাকাছি। তাশবীহ, এস্তেয়ারা সহ অন্যান্য বালাগাত ও ফাসাহাতের ব্যাবহার এ যুগেই

ফারসি সাহিত্যে ব্যপক ভাবে শুরু হয়। (শামিসা[৬৩], পৃ: ৩৯) এগুলোর ক্ষেত্রে আরবী সাহিত্যের তাশবীহ ও এস্তেয়ারার প্রভাব ফারসি সাহিত্যে দেখতে পাওয়া যায়।

এ যুগের বিখ্যাত কাবিরা ছিলেন রুদাকি (মৃত্যু ৩২৯ হি./৯৪০ খৃ.), শাহিদ বালখি (মৃত্যু ৩২৫ হি./৯৩৬ খৃ.) আবু শাকুর বালখি , দাকিকি (মৃত্যু ৩৬৭ হি./৯৭৭ খৃ.), কাসাভি মারুযি (মৃত্যু ৩৯১ হি./১০০০ খৃ.),ফেরদৌসি (মৃত্যু) প্রমুখ।

ফারসি কাব্যরীতির দ্বিতীয় যুগ :

হিজরী ষষ্ঠ শতক থেকে এই যুগের সূচনা হয় এবং অষ্টম শতাব্দিতে মোঙ্গোলীয়দের উত্থানের মাধ্যমে এর পরিসমাপ্তি ঘটে। এই যুগে ফারসি কবিতায় যে কাব্যশৈলী প্রচলিত ছিল তাকে হিজরি ষষ্ঠ শতাব্দির সাবক (শামিসা[৬৩], পৃ: ৯১) বা সাবকে হাদ মিয়নে বলা হয়। এক কাব্যশৈলী থেকে অপর কাব্যশৈলীতে রূপান্তরের মধ্যবর্তী সময়ে কবিতার যে কাব্যশৈলী দেখা যায় তাকে, তাকে সাবকে হাদ মিয়ানে বলা হয়। মূলত ঃ সাবকে খেরাসানী ও সাবকে এরাকীর মধ্যবর্তী সাবক ছিল ষষ্ঠ হিজরী শতকের এই সাবক।

ডঃ সিররুশ শামিসা এ যুগের সাবক পরিবর্তনের কয়েকটি কারণ উল্লেখ করেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কারণ গুলো হলো : এ সময়ে খোরাসান ও ইরাকের মধ্যে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়, পাহলভী ও পুরোনো ফারসি শব্দের ব্যবহার কমে যায়, ইলমে তাসাউফ ও সুফিদের কর্মকান্ড বৃদ্ধি পায়, ইরানে ধর্মীয় শিক্ষার জন্য বিভিন্ন মাদ্রাসা স্থাপিত হয়, কাসিদার প্রচলন কমে যায় তার পরিবর্তে গজলেন প্রচলন বৃদ্ধি পায় এবং ইরানের সর্বোত্র রাজনৈতিক গোলোযোগ বৃদ্ধি পায়।(শামিসা[৬৩], পৃ: ৯১-১০৭)

চিন্তা-চেতনা ও বিষয়বস্তুর দৃষ্টিকোন থেকে এ সময়ের কবিতায় ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। কবিতায় জ্ঞান-বিজ্ঞান, দর্শন, কোরআন, হাদিস, ইলমে ফিক্হ, ইলমে কালাম আর্থাৎ মু'তাযিলা আশারিয়া ও যাবরিয়াদের দর্শন সংক্রান্ত আলোচনা বৃদ্ধি পায়। গ্রিক দর্শন ও বিজ্ঞানের কিছু বিষয়াবলী এ যুগের কবিতায় দেখতে পাওয়া যায়। সামাজিক সমালোচনা, হাযু বা কবিদের পারস্পরিক সমালোচনামূলক কবিতার চর্চা এ যুগে দেখা যায়। পাশা খেলা ও দাবা দেখার বর্ণনা এ যুগে দেখতে পাওয়া যায়। ফারসি কবিতায় আধ্যাত্মিকতা এ যুগ থেকেই শুরু হয়।

ভাষাগত বৈশিষ্টের মধ্যে, এ যুগের কবিতায় প্রচুর আরবী শব্দের ব্যাবহার দেখতে পাওয়া যায়। কবিতার ভিতর জটিলতা লক্ষ্য করা যায়। দীর্ঘ ও কঠিন রাদিফের ব্যাবহার দেখা যায়। এ যুগের বিখ্যাত কবিগন ছিলেন সানায়ি (মৃত্যু ৫৪৫হি./১১৫০ খৃি.), যহির ফারইয়াবি (মৃত্যু ৫৯৮ হি./১২০১ খ্রি.),আনওয়ারি (মৃত্যু ৫৮৩ হি./১১৮৭ খ্রি.), মাসউদ সা'দ সালমান (মৃত্যু ৫১৫ হি./১১২১ খ্রি.), খাকানি (মৃত্যু ৫৯৫ হি./১১৯৮ খ্রি) ও নিযামি গানযুভি (মৃত্যু ৫৯৯ হি./১২০২ খ্রি) প্রমুখ।

ফারসি কাব্যরীতির তৃতীয় যুগ :

হিজরি সপ্তম, অষ্টম ও নবম হিজরী (খ্রিষ্টীয় ত্রয়োদশ, চতুর্দশ, ও পঞ্চম শতাব্দি) এ যুগের অন্তর্ভুক্ত। সপ্তম শতাব্দির শুরুর দিকে মোঙ্গলদের অক্রমনের ফলে ইরানের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অঙ্গনে ব্যাপক বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা দেখা দেয়। যা প্রত্যেক্ষ ও পরোক্ষভাবে ফারসি সাহিত্যকে, দারুণভাবে প্রভাবিত করে।

ফারসি সাহিত্যের তৎকালীন যুগের প্রাণকেন্দ্র খোরাসান, এ যুগের পূর্বেই সেলজুক ও গাজানদের দ্বারা আক্রমনের সম্মূখীন হয়েছিল কিন্তু মোঙ্গোলদের আক্রমনের ফলে খোরাসান একেবারে ধংস্তুপে পরিনত হয়। এ অঞ্চলের যে সমস্থ কবি সাহিত্যিকগণ ইতপূর্বে ফারসি সাহিত্যে কাব্য দ্যেতি ছড়িয়ে দিয়েছিলেন, তাদের মধ্যে কেউ কেউ নিহত হন অথবা এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েন। কবি সাহিত্যিকদের পৃষ্ঠপোষকতা দেওয়ার মত উল্লেখযোগ্য কোন শাসকও এ যুগে ছিল না। কেবলমাত্র হাতে গোনা কয়েকটি পরিবার যারা এ কাজ সম্পাদন করেছিল তারা হলো আলে মুযাফ্ফার ও আলে জালায়ার পরিবার। তারা ফারস, ইয়াযদ, বাগদাদ, ও ইরাকে বসবাস করত। (নাফিসি[৩৯], পৃ: ১৮২)

এ পর্যায়ে ফারসি কবিতায় দার্শনিক চিন্তাধারা মন্থর ও শিথিল হয়ে পড়ে এবং এক প্রকারের কুসংস্কার ও দায়িত্বহীনতার প্রচলন ঘটে। এমনিভাবে মানুষ ভাগ্যের ওপর সব কিছু সোপর্দ করত এবং এ দুনিয়া ও জগতের বিপরীতে প্রশান্ত আত্মাকে শক্তিমান করে তুলত। এমনি পরিস্থিতিতে অগত্যা আধ্যাত্মিক ও সুফীবাদী চেতনা উন্নতি লাভ করে এবং তা বিশেষ অবস্থা থেকে সাধারণ ও জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এতে বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা , মাযহাবের (ধর্মমতের) সৃষ্টি হয় ও সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশে বিস্তার লাভ করে। ভাষার ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে মোঙ্গলীয় শব্দের প্রচলন ঘটে। যেহেতু কবিরেদর সাহায্য-সহযোগিতার জন্য কার্যকরী কোন কেন্দ্র ছিল, কিছু খ্যাতনামা কবি ব্যাতীত অন্যান্য কবিরা সাধারণত হিজরী ষষ্ঠ ও সপ্তম শতকের কবিদের কাব্যশৈলী অনুসরণ করতেন। মূলত ঃ হিজরী অষ্টম শতকে একটি এলোমেলো সাহিত্যশৈলী প্রভুত্ব লাভ করে। এই দিক থেকে তাঁদের দৃষ্টি ছিল শুধু অনুকরণের প্রতি। কোন সৃজনশীলতা বা কোন আবিস্কারের প্রতি তারা মনোযোগ দিতে পারেনি। এই শূন্যতা তাদেরকে শিল্পহীন, গুরুত্বহীন ও ব্যর্থ সাহিত্যের দিকে নিয়ে গেছে। (তামিমদারী[৩২], পৃ: ৫৬)

হিজরি আষ্টম শতাব্দির শেষের দিকে তৈমুরদের উত্থানের মাধ্যমে ফারসি সাহিত্যের মোড় ঘুরে যায়। তৈমুরীয় শাসকেরা শিল্প সাহিত্যের বিশেষ অনুরাগী ও পৃষ্টপোষক ছিলেন। বিশেষ করে তৈমুর লঙের পুত্র শাহজাদা শাহ্রুখ ও তার সন্তানেরা ইরানি শিল্প সাহিত্যের উন্নতির জন্য বিশেষ উদ্যগ গ্রহণ করেন। যার বিশদ বর্ননা ডঃ সাফা তার গন্থে উল্লেখ করেছেন। (সাফা[৬৯], চতুর্থ খন্ড, পৃ: ১৮৫)

সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতার কারণে এই যুগে কবি সাহিত্যিকদের সংখ্যা অধিকহারে বৃদ্ধি পায়। অষ্টম হিজরীর শেষভাগ থেকে শুরু করে দশম হিজরির শুরু পর্যন্ত সাহিত্য গবেষকগন পাঁচশত চুহাত্তর জন কবির নাম উল্লেখ করেছেন। (সাফা[৬৯], চতুর্থ খন্ড, পৃ: ২৫৭) এই কবিতার ভেতর দু'টি ধারা লক্ষ্য করা যায়। একটি দুর্বোধ্য ও নব সৃষ্ট আলংকারিক (شعر مصنوع) অপরটি গতিশীল ও সাধারণ (شعر ساده) (সাফা[৬৯], চতুর্থ খন্ড, পৃ: ২৬১) । হিজরি সপ্তম, অষ্টম ও নবম শতাব্দিতে সাবকে এরাকী বা ইরাকী রচনাশৈলী ফারসি কবিতায় বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল। ভাষাতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে সাবকে এরাকীর

শব্দগুলোর একটি স্বাতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদা রয়েছে। এতে বিপুল পরিমানে আরবী, তুর্কী ও মোঙ্গলীয় শব্দ রয়েছে। তবে প্রাচীন ও পুরাতন শব্দাবলীর ব্যাবহার খুব কমই দেখা যায় এবং ধীরে ধীরে এ রচনশৈলী বিস্মৃত হয়ে যায়। কবিতার ছন্দগুলো সীমাবদ্ধ ও কাঙ্ক্ষিত ছন্দের দিকে ধাবিত হয়। এর রূপলঙ্কার সাধারণত দূর্লভ ও মনোমুগ্ধকর। এ সাহিত্যশৈলীতে প্রচুর পরিমানে ঈহাম বা দ্ব্যর্থবোধক বক্তব্য রয়েছে, বিশেষ করে কিছুসংখ্যক কবির কবিতায় একে শৈলীগত বৈশিষ্ট্যের অংশ বলে মনে করা হয়। কবিরা শব্দ নির্বাচনের ক্ষেত্রে দ্বিধা ও সংশয়ের সম্মুখীন হন, যেমনিভাবে হফেয ও সা'দীর মত কবিদের কবিতায় এ বৈশিষ্ট্য পূর্ণমাত্রায় অনুভূত হয়েছে। এটা এ কারণেই যে, কবিরা ছিলেন আরবদের সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রভাবাধীন। আরবী সাহিত্যের পরোক্ষ ইঙ্গিতসমূহ, কাহিনী ও প্রবাদসমূহ ফারসি কাব্যে প্রচলন ঘটে এবং সাহিত্য জগতে অধ্যাত্মবাদের আধিপত্য বৃদ্ধির ফলে পবিত্র কুরআনের আয়াত, হাদীস এবং আধ্যাত্মিক বিষয়গুলো বিস্তৃত আকারে এ রচনাশৈলীতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এরাকি রচনাশৈলীতে লেখা, সানায়ির ধর্মীয় কবিতা, মাওলানা রুমি ও শেখ ফরিদুদ্দিন আত্তারের আধ্যাত্মিক কবিতায় পরিণত হয়। অন্যকথায় বলা যায় যে, সুফি ভাবধারার কবিতা এদের মাধ্যমেই পূর্ণতা লাভ করে। মাওলানা রুমি এ রচনাশৈলীতে আধ্যাত্মিক গযল এবং সা'দি প্রেমময় গযলকে উচ্চ স্তরে নিয়ে যান। হাফেয এ দু'টিকে সমন্বিত করে 'গাযালে রেনদা'নে' রচনা করেন, যা কেবল তাঁর নিজের নামের সাথে সংশ্লিষ্ট রয়েছে। (ফারশিভারদ, ২য় খন্ড, পৃ: ৭৬৪)

এ যুগের উল্লেখযোগ্য কবিরা ছিলেন ফরিদুদ্দিন আত্তার নিশাপুরি (মৃত্যু ৬২৭ হি./১২২৯ খ্রি.), সা'দি (মৃত্য ৬৯১ হি./ ১২৯১ খ্রি.), মাওলানা জালালুদ্দিন রূমি (মৃত্যু ৬৭২ হি./ ১২৭৩ খ্রি.) আমীর খসরু দেহলাভি (মৃত্যু ৭২৫ হি./১৩২৪ খ্রি.), হাফেয শিরাযি (মৃত্যু ৭৯৩ হি./১৩৯০ খ্রি.) প্রমুখ।

ফারসি কাব্যরীতির চতুর্থ যুগ :

হিজরি দশম শতক এ যুগের আন্তর্ভক্ত। এ যুগে ফারসি কবিতায় সাবকে ওয়াকু বা সংগঠিত কাব্যরীতি প্রচলিত ছিল। মূলত : এ কাব্যরীতিটি ইরাকী ও ভারতীয় কাব্যরীতির মধ্যবর্তী একটি কাব্যরীতি যা দীর্ঘ এক শতাব্দি ধরে ফারসি চর্চার আঞ্চলগুলোতে, বিশেষ করে ভারতীয় ও ইসফাহান অঞ্চলে প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। এই 'সাবক' কে বিভিন্ন নামে নামকরণ করা হয় যেমনঃ মাকতাবে ওয়াকু, দাবেস্তানে ওয়াকু, তরাযে ওয়াকু, যবানে ওয়াকু বা ওয়াকু গুয়ি ইত্যাদী।

সাবকে ওয়াকুর শাখা হিসেবে এই যুগে সাবকে ভাসুখত নামে অপর আরেকটি সাবক অস্তিত্ব লাভ করে। এর উদ্ভাবক ছিলেন ভাহ্শি বাহফকি। ভাসুখত শব্দটি ভাসুখতান মাসদার থেকে উৎসারিত যার অর্থ হলো দগ্ধীভূত হওয়া। এই 'সাবক' এ চিন্তা ও অনুভূতির দিক থেকে প্রেমিক প্রেমিকার অবস্থান পরিবর্তন হয়। প্রচলিত ধারার সাহিত্যে সাধারণত দেখা যায়, আশেক-মাশুককে পাওয়ার জন্য ব্যাকুল থাকে এবং তাকে খুঁজে বেড়ায়, কিন্তু প্রচলিত ধারার বিপরীথে এই 'সাবক' এ প্রেমিক প্রেমিকার কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং অপর প্রেমিকার দিকে ধাবিত হয়।

সাবকে এরাকির সাথে এই বর্ণনার পাথক্য এই যে, সাবকে এরাকিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সামগ্রিক বর্ণনা প্রায়শই বিদ্যমান থাকে, এরপর আংশিক বা বিষয়ভিত্তিক বর্ণনার অবতারণা হয়। অনেকে বিশ্বাস

করেন, সাবকে ওয়াকু, সাবকে হিন্দির একটি শাখা। এ জন্য একে সাবকে হিন্দিয়ে রৌশান বা ভারতীয় উজ্জ্বল রচনাশৈলী নামেও নাম করণ করা হয়। (ফারশিভারদ, ২য় খন্ড, পৃ: ৭৮০)

ফারসি কাব্যরীতির পঞ্চম যুগ :

হিজরি একাদশ শতাব্দী ও দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ এ যুগের অন্তর্ভুক্ত। এ সময়ে যে রচনাশৈলী ফারসি কবিতায় প্রভাব বিস্তার করেছিল তাকে সাবকে হিন্দি বা ভারতীয় রচনাশৈলী বলা হয়। ইরানি ও ভারতীয় উপমহাদেশের লোকদের পারস্পরিক পরিচয়ের ইতিহাস কয়েক হাজার বছরের পুরোনো। এর সূচনা খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতিয় সহস্রাব্দ, যখন আর্য জাতিসমুহ একত্রে বসবাস করত। (আমেরী[৯], পৃ: ১) খ্রিস্টপূর্ব পাচশত বছরে, সম্রাট দারয়ূস সিন্ধু বিজয় করলে ইরানি ও ভারতীয়দের পারস্পরিক সাংস্কৃতিক সম্পর্ক আরো জোড়ালো হয়। (অব্দুল্লাহ[৭], পৃ: ২১) ৫৩১-৫৯৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সম্রাট খসরু আনোশিরওয়ানের সময়ে সিন্ধু, পাঞ্জাব ও হিমালয়ের সিমান্তবর্তী এলাকা সাসানি সম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত হয়। (আব্দুল্লাহ[৭], পৃ: ২৬) এর ফলে ইরানি ও ভারতীয়দের জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক বিনিময় আরো জোড়ালো হতে থাকে। (বাহার[৪৬], ২য় খন্ড, পৃ: ১৩৫) এ সময়ে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত সম্রাট আনুশিরওয়ানের দরবারে উপহার স্বরূপ দাবা খেলার সরঞ্জমাদি নিয়ে আসেন এবং বুরজুয়ে তাবিব নামে একজন ইরানি চিকৎসাবিদ পঞ্চতন্ত্র নামের একটি সংস্কৃত বই ইরানে নিয়ে আসেন ও কালিলা ভা দিমনা নামে পাহলবি ভাষায় বইটির অনুবাদ করেন। (আহমাদ[১৪], পৃ: ২৭)

এভাবে ভারতীয় সংস্কৃতি, ইরানি সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার পাশাপাশি, ইরানি সংস্কৃতিও ভারতীয় সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত হতে থাকে। বিশেষ করে সম্রাট অশোকার সময়ে বৌদ্ধ ধর্ম এই উপমহাদেশে বিস্তার লাভ করে এবং সাসানি সম্রাজ্যের পৃষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধ ধর্ম যরতুস্ত্রিদের ধর্মকে বেশ প্রভাবিত করে । এই সময়ে ইরানিদের মধ্যে এমন অনেক শিল্প-সংস্কৃতির প্রচলন দেখা যায় যেগুলোর উৎপত্তিস্থল ছিল ভারত। (বিরশাক[৪৮], পৃ: ১৪১) সাসানি সম্রাজ্যের পতনের পর বিপুল সংখ্যক ইরানি যরতুষ্ট পশ্চিম ভারতে পাড়ি জমায় ও স্থায়ীভাবে বসবাস আরম্ভ করে। পারস্যের সেই জরতুষ্টদের বড় একটি অংশ আজো ভারতে বসবাস করছে। এই সমস্ত দেশ ত্যাগী ইরানিদের মাধ্যমেই সর্বপ্রথম ভারতীয়রা ইরানিদের ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে ব্যাপকভাবে জানার সুযোগ লাভ করে। (আমেরি[৯], পৃ: ৩)

হিজরি একাদশ শতাব্দির দিকে ইরানে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণে ইরানি কবিগণ ভারতীয় উপমহাদেশের সাহিত্যচর্চার অঞ্চলগুলেতে অধিকহারে যাতায়াত করতেন এবং ভারতীয় শাষকগণ তাদেরকে সাদরে গ্রহণ করে পৃষ্টপোষকতা দান করতেন। যার ফলে ভারতীয় উপমহাদেশে অবস্থানকারী এই সমস্ত কবি সাহিত্যিকদের মাধ্যমে ফারসি কবিতায় নতুন রচনাশৈলীর জন্ম হয়, যা পরবর্তীতে সাবকে হিন্দি নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

এ যুগের ইরানি কবিদের ভারতের প্রতি আগ্রহের আরেকটি কারণ সম্পর্কে বলা হয় যে : ''ইরানে এ সময়ে সফাবি সম্রাটগন শাসন করছিলেন। তারা শিয়া মাজহাবকে রাষ্ট্রীয় ধর্মের মর্যাদা দেন। ধর্মীয় কবিতা ছাড়া অন্যান্য ধরণের কবিতার প্রতি তারা নিরুৎসাহিত ছিলেন এবং সেগুলোর প্রতি পৃষ্টপোষকতা করতেন না। যে কারণে ইরানের কবিরা ভারতে পারি জমান''।

এ রচনাশৈলীতে অস্পষ্টতা ছিল একটি মূলনীতি। যেমন : অল্প শব্দে অধিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণকে পুঞ্জীভূত করা এবং ইজাযে মুখিল (সংক্ষিপ্ততা বর্জিত উক্তি) সৃষ্টি করা। স্মরণশক্তির বাইরে কতগুলো বিষয় তুলে ধরার প্রতি জোর দেয়া। অপরিচিত উপমা ও সাদৃশ্যগুলো তুলে ধরা, ইত্যাদি অনুষঙ্গ আলোচ্য স্টাইলে অন্তর্ভুক্ত ছিল। (ফারশিভারদ, ২য় খন্ড, পৃ: ৭৮০)

একটি পর্যায়ে এ রচনাশৈলীতে দুটি ধারার সৃষ্টি হয়। ইরান অঞ্চলে বসবাসকারী কবিদের কাব্যশৈলীকে সাবকে সাফাভিয়ে ইরানি বা এস্পাহানি এবং ভারতে বসবাসকারী কবিদের কাব্যশৈলীকে সাবকে সাফাভিয়ে হিন্দি নামে নামকরণ করা হয়। এ যুগের বিখ্যাত কবিগণ ছিলেন তা'লেব অ'মুলি (মৃত্যু ১০৩৬ হি/১৬২৬ খ্রি), গানি কাশ্মিরি (মৃত্যু ১০৭৯ হি/১৬৬৮ খ্রি), কালিম কাশানি (মৃত্যু ১০৬১ হি/১৬৫০ খ্রি), সায়েব তাবরিযি (মৃত্যু ১০৮০ হি/ ১৬৬৯ খ্রি)।

ফারসি কাব্যরীতির ষষ্ঠ যুগ :

হিজরি দ্বাদশ শতকের গোড়া থেকে ত্রয়োদশ শতকের শেষভাগ পর্যন্ত অর্থাৎ খ্রিষ্টিয় অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ভাগ থেকে ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ পর্যন্ত এ যুগের অন্তর্ভূক্ত। এ যুগকে ফারসি কবিতার প্রত্যাবর্তন বা পুনঃপ্রতিষ্টার যুগ বলা হয়।

১১৪৮ হিজরিতে সাফাভি রাজবংশের পতনের পর ফারসি কবিতার পট পরিবর্তন হয়। কাজার বংশীয় রা এই সময়ে ইরানের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্টিত হয়। ইল কাজার ছিল তুর্কি জনগোষ্ঠির অন্তর্ভুক্ত একটি যাযাবর গোত্র। শাহ ইসমাইল সাফাভি কতৃক ইরানে সাফাভি রাজবংশের প্রতিষ্ঠাকালে বিভিন্ন যাযাবর গোত্র তাকে সহায়তা করে, ইল কাজার ছিল তাদের অন্যতম। কাজার বংশ থেকে পরম্পরায় সাত জন শাহ ইরানের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়ে রাজত্ব করেন। তাদের মধ্যে সর্বপ্রথম ছিলেন আগা মোহাম্মদ খান এবং সর্বশেষ আহম্দ শাহ। (মজিদি[৫৬], পৃ: ২১) এই সময়ে এসে সাবকে হিন্দির কদর কমে যেতে থাকে এবং কবিগণ পুরোনো সাবকের দিকে ঝুকতে থাকে। এ এ যুগের বিশিষ্ট কবিগণ যেমন : মোশতাক, হা'তেফ, অ'যার এ ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। তারা সাবকে এরাকী কে নতুনভাবে কবিতার মধ্যে উপস্থাপন করেন। মুলত : দুই ধরণের কাব্যরীতি এ যুগের কবিদের কবিতায় দেখা যায়। প্রথমত ঃ কাসিদা লেখার ক্ষেত্রে সালজুকি যুগের কবি সাহিত্যিকদের কবিতাকে অনুস্বরণ করেন। এই কাব্যশৈলীকে যারা অনুস্বরণ করতেন তারা ছিলেন সাবা, কায়ানি, সোরুশ, সায়েবানি প্রমুখ। দ্বিতীয়ত ঃ গযল লেখার ক্ষেত্রে কোন কোন কবি এরাকি রচনাশৈলীকে অনুস্বরণ করেন। এ ক্ষেত্রে যারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন তাদের মধ্যে মোজমার ইস্ফাহা'নি, ফোরুগে বাস্তা'মি ও নেশাত ইস্ফাহা'নি প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। (নাযাদ[৪০], পৃ: ৬)

সপ্তম যুগ সাংবিধানিক আন্দোলনের যুগ বা আধুনিক কবিতার সূচনার যুগ :

১৩২৪ হি: কা: তে ইরানের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ব্যাপক পরির্তন দেখা দেয়। রাষ্ট্রীয় সংবিধানের জন্য ইরানি জনগণ সেচ্চার হয়ে ওঠে। রাজনৈতিক অঙ্গনের এই পরিবর্তন ইরানি সাহিত্যকে প্রভাবিত করে। ফারসি কবিতার মধ্যে নতুন নতুন বিষয় স্থান পেতে থাকে। এভাবেই ফারসি কবিতা আধুনিকতার দিকে মোড় নেয়। যে সমস্থ উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ফারসি কবিতার মধ্যে দেখা দেয় সেগুলো ছিল :

প্রথমত : সে সময়ে ইরানের অনুবাদ সাহিত্যের ব্যাপক প্রচলন দেখা দেয়। বিভিন্ন ভাষার সহিত্য ফারসি ভাষায় অনুদিত হতে থাকে। বিশেষ ফরসি সাহিত্যের অনুবাদের প্রাতি ইরানি লেখাকদের বিশেষ মনোযোগ লক্ষ্য করা যায়। এর ফলে ফরাসি অনেক শব্দ ফারসি ভাষায় প্রবেশ করে এমনকি একটি পর্যায়ে ফরাসি রচনাশৈলী ফারসি সাহিত্যকে প্রভাবিত করে।

দ্বিতীয়ত : সাংবিধানিক আন্দোলনের পূর্ববর্তী যুগের কবিতার বিষয়বস্তু ছিল রাজা-বাদশাদের প্রশংসা, প্রেম, আধ্যাত্মিকতা, নৈতিকতা, যুদ্ধ বিগ্রহের বর্ণনা, প্রাকিতিক সৌন্দর্যের বর্ণনা ইত্যাদি। এ যুগের এসে অনেক নতুন নতুন বিষয় ফারসি কবিতায় যুক্ত হয়। যেমন : স্বাধীনতার চেতনা, সামাজিক ও রাজনৈতিক সমালোচনা, দেশপ্রেম, সমাধিকার, ব্যক্তি স্বাধীনতা, নারীর অধিকার ইত্যাদি।

তৃতীয়ত : মাশরুতিয়াত পূর্বযুগের সাহিত্য কেবলমাত্র অভিজাত শ্রেণির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। সাহিত্যের বিষয়বস্তুয় ছিল অভিযাত শ্রেণিকে নিয়ে। সাধারণ মানুষের চাওয়া পাওয়া, আবেগ অনুভূতি পুরোপুরি উপেক্ষিত ছিল। মাশরুতিয়াত যুগে সাহিত্যের সেই ধারা অভিযাত শ্রেণি থেকে নিচে নেমে এসে সাধারণ মানুষের সাথে মিশে যায়। সাধারণ, কর্মজীবি ও নিম্নশ্রেণির মানুষের জীবন নিয়ে সাহিত্য রচিত হতে থাকে। এর ফলে নতুন কিছু বিষয় সাহিত্যে স্থান পায়। শুদ্ধ ভাষার সাথে সাথে আঞ্চলিক ভাষাও ফারসি সাহিত্যে যুক্ত হয়।

চতুর্থত : মাশরিয়াত যুগেই ইরানে পত্রিকা ও ছাপাখানার ব্যাপক প্রচলন ঘটে। এর ফলে সাহিত্য চর্চারও বিস্তৃতি ঘটে। ফারসি সাহিত্যে সমালোচনাধর্মী সাহিত্যের প্রচলন এ শুরু হয়। বিশেষ করে পূর্ববর্তী কবি সাহিত্যিকদের সাহিত্যকর্ম নতুন করে সম্পাদনার একটি ঝোঁক সাহিত্যিকদের মধ্যে দেখা যায়।

পঞ্চমত : কাব্য অলংকার ব্যাবহারের ক্ষেত্রে এ যুগে পরিবর্তণ লক্ষ্য করা যায়। পুরোনো তাশবিহ, এস্তেয়ারাহ, কেনায়ার পরিবর্তে নতুন নতুন এবং অপেক্ষাকৃত সহজ উপমার ব্যাবহার কবিতার মধ্যে লক্ষ্য করা যায়।

এ যুগের বিশিষ্ট্য কবিগণ ছিলেন : অদিবুল মামা'লেক, ইরা'জ মিরর্যা, আদিব পেশা'ভারি, আরেফ কাজভিনি, পারভীন এহতেসামি, রাশিদ ইয়াসমি, মোহাম্মাদ বাহার, আলী আকবর দেহখোদা, সাইয়্যেদ আশরাফ উদ্দিন প্রমুখ।

অষ্টম যুগ বা সমকালীন যুগ :

ইরানে কাজার শাসনামলের শেষ দিকে ইরানি জনগন অল্প অল্প করে পশ্চিমা সংস্কৃতির সাথে পরিচিত হতে থাকে। ইরনি বুদ্ধিজীবিরা ইউরোপিয় ভাষা ও সাহিত্যের সাথে অধিকহারে পরিচিত করতে থাকে এবং ইউরোপীয় সাহিত্যের আদলে ছোটগল্প, উপন্যাস, নাটক ইত্যাদি লেখার প্রতি বিশেষ নজর দেন। পরিবর্তণের এই হাওয়া ফারসি কবিতকেও বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। ইউরোপীয় আধুনিক কবিতার অনুস্মরণ করে ফারসিতেও আধুনিক কবিতার চর্চা শুরু হয়। সনাতনি ছন্দ রীতি আর আরুয কাফিয়ার নিয়ম ভেঙ্গে ফারসি কবিতায় নিমা ইউশিয সর্বপ্রথম আধুনিক কবিতার দৃষ্টান্ত তুলে ধরেন। তাকে ''আধুনিক ফারসি কবিতার জনক'' বলা হয়। কারণ ফারসি কাব্যাকাশে নিমার আর্বিভাবের পূর্বেই

ফারসি কবিতায় নব্য সামাজিকতা, বাস্তবতা, লোক কথা পরীলক্ষিত হলেও কবিতা রচনারীতি বা ষ্টাইলে তেমন কোন পরিবর্তন আসেনি। কারণ মাশরুতিয়াত যুগের কবিদের রচনায় পাশ্চাত্য ভাষা বা শব্দের প্রয়োগ এবং বিষয়বস্তুগত পরিবর্তন পরীলক্ষিত হলেও তারা সেই পুরোনো ধারায় যেমন : মাসনাবি, কাসিদা, গজল, মহাকাব্যিক ধারা প্রভৃতিতেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু নিমা ইউশিয প্রথমবারের মত প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, আরুয ও কাফিয়ে (ছন্দ ও অন্তমিল) কবিতার মূল অংশ নয়-সহজ সাবলীল ভাষায় সমকালীন কবিতা আবেগ ও অনুভুতির বাচনভঙ্গির উপর ভিত্তিশীল হওয়ার কারণ হয়। তার এই '' শেরে সেপিদ'' তথা সাদা কবিতার কোন ছন্দ বা তাল কানে বাজে না এবং এর অধিকাংশই গদ্যের যুক্তিকে অনুসরণ করে। সনাতন ধারার কবিতার মত অতিরিক্ত উপকরণ প্রয়োগ হ্রাস পেয়েছিল। এক্ষেত্রে প্রচলিত ভাষা অর্থাৎ মৌখিক চলিত ভাষা কবিতায় স্থান করে নেয়। এতে করে কবিগণ নিজের মৌখিক ভাষা-প্রকৃতি ব্যবহার করে কবিতায় রোমান্টিকতা এবং আত্মচেতনাবোধ প্রভৃতির অনুপ্রবেশ ঘটে। কিছুটা মনোবৈজ্ঞানিক ভাবাধারাও যেন কবিতায় অবলীলায় স্থান করে নেয়। লৌকিক ও চলমান জীবনধারা যেন মুখের ভাষায় বর্ণিত হয়। ১৯২২ খ্রি. প্রকাশিত ' আফসানে' , ' কেস্‌সেয়ে রাং পারীদে' ' খানেভাদেয়ে সারবায' ইত্যাদি কবিতা নতুন অবয়বে রচনা করেন নিমা ইউশিয। নিমা ইউশিযের প্রচলিত রীতিতে তিনটি আঙ্গিক পরীলক্ষিত হয়,

(১) মুক্ত কবিতা (Free Verse)- যার রয়েছে ছন্দ শাস্ত্রের অনুমোদিত ছন্দরীতি।

(২) সেপিদ কবিতা (Blank Verse)- ÔÔঅমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত কবিতা। যদিও এধরনের কবিতাগুলো সুরেলা ও সংগীতধর্মী; কিন্তু এতে ছন্দের পুনরাবৃত্তি ও ধারাবাহিকতা নেই। যেমন '' আহমেদ শামলুর'' কবিতা।

(৩) নতুন আঙ্গিকের বা ঢেউয়ের কবিতা যার কেবল ছন্দ নেই এমনও নয়; বরং সংগীতধর্মী স্পন্দনও নেই এবং অন্তমিলও নেই। এ হচ্ছে ছন্দশাস্ত্রীয় রীতি বর্হিভূত এক প্রকারের বর্ণনাধর্মী কবিতা''

এর মধ্যে প্রথম পর্যায়ের কবিতা ব্যাপক সমাদৃত হয়েছে। (লি[৬২], পৃ: ১১-১৯)

শাহরিয়ারের দৃষ্টিতে ফারসি কবিতার **مکتب** বা লেখনি পদ্ধতি :

শাহরিয়ার ফারসি কবিতার মাকতাব বা লেখনি পদ্ধতিগুলোকে চার ভাগে বিভক্ত করেছেন।(শাহরিয়ার[৬৬], ১ম খন্ড, পৃ: ৪৭)

প্রথমত ঃ মাকতাবে নিযামি বা আযারবাইযানি। এই লেখনি পদ্ধতিতে প্রাকৃতিক বিষয়াবলীর প্রাধান্য লক্ষ করা যায়। প্রাচীন ইতিহাস, ঐতিহ্য, সভ্যতা, সমাজ ব্যবস্থা ও বিশেষ করে আযারবাইযানের পাহাড়ি অঞ্চলের বর্ণনা এই লেখনি পদ্ধতিতে অধিক স্থান পেয়েছে। সাবকে এরাকী ও সাবকে তুর্কিস্তানির মিশ্রিত সাবক বা রচনাশৈলী ছিল এই যুগের অনুস্মৃত রচনাশৈলী। মূলত : এটাই ফারসি কবিতার মৌলিক রচনশৈলী। শাহরিয়ার ফারসি কবিতার ক্ষেত্রে তিনটি রচনশৈলীকে মৌলিক রচনাশৈলী মনে করেন। সেগুলো হলো সাবকে তুর্কিস্তানি, আযার বাইযানি ও সাবকে এরাকী। তিনি বলেন :

‘‘ যেহেতু আমি নিজে আযারবাইযানের অধিবাসি, এবং পূর্ববর্তী কেউ আযারবাইযানি নামে পূর্ণ সাবকের নাম প্রকাশ করেননি তাই আমিও এটিকে শুধুমাত্র একটি লেখনি পদ্ধতি বলবো, পরিপূর্ণ সাবক বলবো না।’’ (শাহরিয়ার[৬৬], ১ম খন্ড, পৃ: ৪৭)

নিযমির সাহিত্য কর্ম ও কবির شب ي افسانه। কবিতার মধ্যে এই ধরণের লেখনি পদ্ধতি দেখতে পাওয়া যায়।

দ্বিতিয়তঃ মাকতাবে হিন্দি বা ভারতীয় লেখনি পদ্ধতি। যে সমস্ত ইরনি কবিরা, ভারতীয় রাজ দরবার গুলোতে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন, তাদের মাধ্যমে এই লেখনি পদ্ধতি গড়ে উঠে। সায়েব তাবরিযি, কলিম কাশা’নি, ফেইজি প্রমুখ ছিলেন এই লেখনি পদ্ধতির উল্লেখযোগ্য কবি। ক্ল্যাসিক বিষয়বস্তু, গভীর চিন্তা দর্শন ও জটিল চিত্রকল্পের মাধ্যমে এই লেখনি পদ্ধতি গড়ে ওঠে। মাকতাবে হিন্দি, মাকতাবে আযারবাইজানির একটি শাখা হিসেবেও অনেকে মনে করে। সায়েব তাবররিযির অনুসারীরাই মূলত ঃ এই সাবক গড়ে তুলেন। সর্বশেষ পাকিস্তানের আল্লামা ইকবাল ছিলেন এই লেখনি পদ্ধতির উল্লেখযোগ্য কবি।

তৃতীয়তঃ মাকতাবে মাহাল্লি বা আঞ্চলিক লেখনি পদ্ধতি। ইরানের প্রত্যেকটি অঞ্চল যেমনঃ খোরাসান, গিলান, আযারবাইযান, কুর্দিস্তান, লরেস্তান, ফার্‌স ও কেরমান প্রভৃতির নিজস্ব সাহিত্য কর্ম রয়েছে। তাদের নিজস্ব ভাষায় গল্প, গান, গযল, কাসিদা, খন্ড কবিতা, দু বেইতি প্রচুর পরিমানে রয়েছে। কিন্তু পরবর্তী সময়ে অঞ্চলগুলো ইরান থেকে আলাদা হয়ে যাবার কারণে এই সাহিত্যগুলো ইরানি সাহিত্য থেকে হারিয়ে গেছে। এই সাহিত্যগুলোকে সঠিকভাবে লালন করতে পারলে ফারসি সাহিত্যের বিস্তৃতি আনেক বৃদ্ধি পেত। যেমন : আযারবাইযান অঞ্চলের অনেক কবি আছেন যারা আঞ্চলিক ভাষায় কবিতা লিখেছেন। শাহরিয়ার সমকালীন যুগের এই ধরণের কয়েকজন কবির নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। তারা হলেন

প্রথমত : মরহুম মীর্যা আব্দুল হোসাইন খাজান, যিনি মাশরুতিয়াত যুগের প্রথম দিকে কবিতা লিখতেন। মাশরুতিয়াত আন্দোলনের সময় তিনি নিজস্ব ভাষায় অনেক দেশত্ববোধক গযল লিখেছেন, কিন্তু দারিদ্রতা ও অর্থাভাবের কারণে সেগুলোকে প্রকাশ করতে পারেননি। শাহরিয়ার বলেন : ‘‘যদি তাকে পৃষ্টপোষকতা দেওয়া যেত তাহলে তিনি এই সময়ের হাফিয হতে পারতেন’’। (শাহরিয়ার[৬৬], প্রথম খন্ড, পৃ: ৪৮) আযারবাইযানি ভাষায় তার তিনটি বেইত কবির মনে ছিল, সেই বেইত তিনটি হলো :

ایاقدان دوشمشم ساقي الیمدن دوت ایاغیله
النده ساغر زرین گوروم همواره وار اولسون
قزیل گل غنچه سن تک لخته لخته قان اولان گوگلوم
آچیلماز بیرده عالمده اگر یوز مین تهار اولسون
نه شه دن چاره وار بیز ملته یاران نه مجسدن
بیزه هر کیمسه یه اولسا اونالله یار اولسون

(শাহরিয়ার[৬৬], ১ম খন্ড, পৃ: ৪৭)

যার ফারসি তরজমা হলোঃ

از پا افتاده ام ساقي دستم را با ياغي بگير
الهي كه ساغر زرين همواره در دستت باشد
دل چون غنچه ي گل سرخم كه لخته لخته خون است
ديگر در عالم باز شدني نيست اگر صد هزار بهار باشد
نه از شه چاره يي براي ما ملت است ياران نه از مجلس
هر كسي كه يار ما باشد الهي كه خدا يارش باشد

উচ্চারণ ঃ

আয পা' ওফতা'দে আম সাক্বী দাস্তাম রা' বা' ইয়াগী বেগীর,
এলাহী কে সা'গেরে যারীন হামওয়ারে দার দাস্তাত বা'শা'দ।
দেল চোন গোনচেয়ে গোল সারখাম কে লাখতে লাখতে খূন আস্ত,
দিগার দার আ'লাম বা'য শোদানী নীস্ত আগার সাদ হেযা'র বাহা'র বা'শাদ।
না আয শা'হ চা'রে ঈ বারা'য়ে মা মেল্লাত আস্ত ইয়ারা'ন না আয মাজলেস,
হার কাসী কে ইয়া'রে মা বা'শাদ এলাহী কো খোদা' ইয়া'রাশ বা'শাদ।

(শাহরিয়ার[৬৬], ১ম খন্ড, পৃ: ৪৭)

অর্থ ঃ

আমি নিঃশেষ হয়ে গেছি ওহে সাকি, আমার এ বিদ্রহী হাতকে ধর,
হে খোদা, সোনালি জামবাটি তোমার হতেই থাকুক।
আমার হৃদয় যেন ফুটন্ত গোলাপ ফুল পিন্ড পিন্ড জমাট বাধা রক্ত সেখানে,
যদি হাজার বসন্তও পায় তবুও সে অন্য কোন জগতে প্রষ্ফুটিত হতে পারবে না।
বন্ধুরা, না শাহের কাছ থেকে আমাদের কোন উপায় আছে না মন্ত্রী সভার কাছ থেকে,
তাই যারাই আমাদের বন্ধু হয় হে খোদা তুমি তাদের বন্ধু হয়ে যাও ॥

দিতীয়ত ঃ মরহুম হাজী রেজা সার্‌রাফ। তিনি আযারবাইযানের কবি ছিলেন। তার দিভান আযারবাইযানে প্রকাশিত হয়েছে এবং আযারবাইযানে তার কবিতা এখনো প্রচলিত অছে।

তৃতীয়ত ঃ হাকিম লালি। তিনি মরহুম ইরাজ মির্যার সমসাময়িক কবি ছিলেন। ইরাজ মির্যার রচনাশৈলী তার কবিতায় লক্ষ্য করা যায়। পেশায় তিনি একজন ডাক্টার ছিলেন । নিজের উপাধীর ক্ষেত্রে কোরআনের আয়াত انه لعلي حكيم ব্যাবহার করেছেন।

চতুর্থ ঃ মরহুম আব্বাস আলী মাযহার। তিনি মোহাম্মদ শাহ ও নাসিরুদ্দিন শাহ এর শাসন আমলের কবি ছিলেন। সৌন্দর্যের জন্য তিনি বিখ্যাত ছিলেন। তার কাব্য সংকলন প্রকাশিত হয়েছে তবে সেটি বর্তমানে দুস্প্রাপ্য। তার গযলেন কিছু অংশ নিম্মরুপঃ

نه غم از كفر و نه انديشه از ايمان دارم
باز عشقت كشي اي مغبچه تا جان دارم
كودكان از پي و زنجير كشانم از پيش
طرفه جمعيت از آن زلف پريشان دارم
مظهر اين طرفه غزل خواند و چو معشوق شنيد
گفت من نيز يكي چامه بدين سان دارم

(শাহরিয়ার[৬৬], ১ম খন্ড, পৃ: ৫০)

উচ্চারণ ঃ

না গাম আয কোফর ভা না আন্দিশে আয ঈমান দা'রাম,
বা'য এশক্বাত কেশী এই মোগবেচে তা' জা'ন দা'রাম।
কুদেকা'ন আয পেই ভা যানজীর কেশা'নাম আয পীশ,
ত্বারফেয়ে জামইয়াত আয অ'ন যোলফে পেরেশা'ন দা'রাম।
মাযহারে ঈন ত্বাফেয়ে গযল খা'ন্দ ভা চো মাশূক্ব শানীদ,
গোফত মান নীয একী চা'মে বেদীন সা'ন দা'রাম।

অর্থ ঃ

না কুফুরির কোন বেদনা আছে, না ঈমানের কোন চিন্তা,
ওগো জীবন থাকতে তোমার প্রেমকে হত্যা করব না।
শিশুরা এখনো পূর্ববর্তীদের শিকল টেনে বেড়াচ্ছে,
সমজের এই সৌন্দর্যতার কারণে দুশ্চিন্তার জুলফি চুল রয়ে গেছে।

সেই সৌন্দর্য প্রকাশের জন্য গযল গেয়ে যাচ্ছে যেন প্রেমিকা তা শুনে,

তখন সে বলছে আমারো এমন একটি কবিতা আছে ॥

পঞ্চম ঃ মরহুম বাহা'র শিরভানি। অত্যন্ত প্রতিভাবান কবি ছিলেন। মরহুম ইরায মির্যা তার কবিতার কিছু অংশ মুখস্ত করেছিলেন। শাহরিয়ারেরও দু একটি বেইত মুখস্ত ছিল। যেমন :

زهد زاهد همه را رهبر و خود گمراه است

چون چراغي كه در كف نا بينايي

(শাহরিয়ার[৬৬], ১ম খন্ড, পৃ: ৫০)

উচ্চারণ ঃ

যোহদে যা'হেদ হামে রা' রাহবার ভা খূদ গোমরাহ আস্ত,

চোন চেরা'গী কে দার কাফে না' বীনা'য়ী।

অর্থ ঃ

সুফি দরবেশ নিজেরা গোমরাহ হয়ে অপরকে পথ দেখাচ্ছে,

কারণ তাদের হাতে যে প্রদীপ রয়েছে সেটি অন্ধ হয়ে গেছে ॥

***

اشک رياي زاهدان ريخت به خانه ي خدا

قحبه به مسجد افكند طفل حرام زاده را

(শাহরিয়ার[৬৬], ১ম খন্ড, পৃ: ৫০)

উচ্চারণ ঃ

আশকে রিয়া'য়ী যা'হেদা'ন রীখত বে খা'নেয়ে খোদা',

ক্বোহবে বে মাসজেদ আফকান্দ ত্বেফলে হারা'ম যা'দে রা'।

অর্থ ঃ

ভন্ড সুফিরা লোক দেখানো অশ্রু খোদার ঘরে ফেলছে,

পতিতা যেমন তার অবৈধ সন্তানকে মসজিদে পাঠাচ্ছে ॥

তিনি কুর্দিস্তানে সফর করেছিলেন। সেখানে অনেক শিষ্য তৈরী হয়। জীবনের শেষ সফর খেরাসানে করেন এবং সেখানেই ইন্তেকাল করেন। তার দিভান বা কাব্য সংকলনটি সবসময় নিজের সাথে রাখতেন। ফরাসি থেকে ফারসিতে একটি অভিধান সংকলন করেন।

চতুর্থ : মাকতাবে গোরবি বা পশ্চিমা রচনাশৈলী। গদ্য সাহিত্যের পাশাপাশি ফারসি পদ্য সাহিত্যেও মাকতাবে গোরবি বা পশ্চিমা রচনাশৈলীর প্রচলন ঘটে। এই রচনশৈলী প্রচলনের কয়েকটি কারণ নির্দেশ করা যায়। প্রথমত ঃ সমকালীন বিশ্ব সাহিত্যে, ফারসি সহিত্যের পূর্ণতা ও বিকাশের জন্য যুগপোযোগী এই রচনাশৈলীর প্রয়োজন ছিল। দ্বিতীয়ত ঃ ইরানি যুবকদের ফারসি সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট করতে এই ধরণের রচনাশৈলীর প্রয়োজন ছিল। তৃতীয়ত ঃ ফারসি সাহিত্যে বিদেশি শব্দের আগ্রাশন রোধে এবং বিদেশি শব্দের প্রতিশব্দ তৈরীতে এই রচনাশৈলীর প্রয়োজন ছিল।

প্রায় ষাট বছর ধরে এই রচনশৈলী ফারসি সাহিত্যে প্রবেশ করে। গদ্য ও পদ্য সাহিত্যে অনন্য কিছু সাহিত্য তৈরীর মাধ্যমে, ফারসি সাহিত্যে এই মাকতাব তার অবস্থানকে পাকা পোক্ত করে নিয়েছে। এর পাশাপাশি মাকতাবে রোমান্টিক বা রোমান্টিক রচনাশৈলী নামে আরেকটি রচনাশৈলীর প্রচলন ঘটায়। রোমান্টিক রচনাশৈলী মূলত : গদ্য সাহিত্যের 'রোমান' বা উপন্যাসের মাধ্যমে শুরু হয়। ইউরোপীয় চিন্তাধারায় রোমান্টিক রচনাশৈলী বলতে যা বোঝায় তা হলো শিল্পের স্বাধীনতা, অনুভূতির যতার্থ প্রকাশ, কল্পনা ও শৌখিনতা, নতুন নতুন চিত্রকল্পের সৃষ্টি প্রভৃতি। গদ্য সাহিত্য থেকে কিছু বৈশিষ্ট্য নিয়ে আস্তে আস্তে করে রোমান্টিক রচনাশৈলী, ফারসি কবিতাতেও প্রবেশ করে। বৈশিষ্ঠগুলো ছিল নিম্নরূপ :

শিল্পের স্বাধীনতা, অর্থাৎ ক্ল্যাসিক যুগের বাক বহুলতা ও নিয়মের অনর্থক দায়বদ্ধতা থেকে মুক্তি পাওয়া। রোমান্টিক রচনাশৈলীতে এর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। উদাহরণ স্বরুপ বলা যায় কাফিয়ার ক্ষেত্রে দাল ও যাল অক্ষরের নিয়মাবলী, ইয়ায়ে মা'রুফ ও মাযহুলের শর্তবলীতে রক্ষা করা, প্রভৃতি বর্তমান সাহিত্যের ক্ষেত্রে অনর্থক হয়ে দাড়িয়েছে। যেমনঃ رسيد ، شنيد ، خريد এই শব্দ তিনটিতে কাফিয়া হিসেবে د শব্দটি ব্যাবহার করা হয়েছে। এই তিনটি শব্দের সাথে অরবী لذيذ শব্দটিকে কাফিয়া হিসেবে ব্যাবহার যায়, কারণ নিয়ম অনুযায়ী এক সময়ে ذ শব্দটি د হিসেবে ব্যাবহৃত হত। আবার بگزيني ও بنشيني শব্দ দু'টির সাথে مسكيني শব্দের কাফিয়া যতার্থ নয়, কারণ প্রথম ي দু'টি ইয়ায়ে মা'রুফ ও শেষের ইয়াটি ইয়ায়ে মাসদারি। কিন্তু রেমান্টিক রচনাশৈলীতে এই সমস্থ নিয়ম অনর্থক ও পরিত্যাজ্য।

অনুভূতির যতার্থ প্রকাশ, বা বাস্তবভিত্তিক চিন্তা ও কল্পনার প্রয়োগ। ফারসি ক্ল্যাসিক সাহিত্যে সাধারণত অতিরঞ্জিত কল্পনা ও চিন্তাধারার প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু রোমান্টিক রচনাশৈলী বাস্তব ভিত্তিক কল্পনা ও সঠিক চিন্তাধারা প্রকাশের দাবিদার।

চিত্রকল্প, ক্ল্যাসিক কবিতার চিত্রকল্প ও রোমান্টিক রচনশৈলীর চিত্রকল্পের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। উদাহরণ স্বরুপ শেখ সা'দীর নিম্নোক্ত কবিতাটি

شنيدم كه وقت نزع روان
به هرمز چنين گفت نو شيروان

উচ্চারণ ঃ

শেনীদাম কে ভক্বতে নাযয়ে রাভা'ন,

বে হোরমোয চোনীন গোফত নু শীরভা'ন।

(শিরাজী[৬৭], ১ম অধ্যায়, পৃ: ১২)

অর্থ ঃ

শুনেছি, যুদ্ধ বিগ্রহের সময়ে,

হরমুয আনুশিরভান কে এই কথা বললেন ॥

এই কবিতায় যে চিত্রটি ফুটে উঠেছে তা হলো সম্রাট আনুশিরওয়ান তার বিছানায় বসে সন্তানকে উপদেশ দিচ্ছেন। এখানে কবি শুধুমাত্র আনুশিরওয়ানের কথা উল্লেখ করেই চিত্রের পরিসমাপ্তি টেনেছেন, বিশদভাবে আর কোন বর্ণনা দেননি। কিন্তু আধুনিক ও রোমান্টিক রচনাশৈলীতে এই সমস্থ ক্ষেত্রে বিষদ বর্ণনার দাবিদার। এই চিত্রটি তুলে ধরলে হলে আনুশিরওয়ানের ঘরের আসবাব পত্রের বর্ণনা, তার পোষাক আষাক ও পরিবেশের বর্ণনা তুলে ধরতে হতো। সেজন্য বলা যায় রেমান্টি কবিতার চিত্রকল্প ব্যাপক ও সূক্ষ।

রোমান্টিসিজম এর চিন্তা চেতনার মধ্যে কিছু নতুনত্ব এনে নিমা ইউশিয এর পাশাপাশি ইম্প্রেসিজম নামে নতুন এক রচনাশৈলীর আবির্ভাব ঘটান। নিমার আফসানে কবিতার মাধ্যমে এই রচনাশৈলীর পরিচয় ফুটে উঠে। ইম্প্রেসিজম, রোমন্টিসিজম থেকে আলাদা নয় বরং এটিকে রোমন্টিসিজম এর সারমর্ম বলা যায়। আরো সহজভাবে বলা যায় রোমান্টিসিজম হলো কোন চিত্রের বিষদ বর্ণনা, আর ইম্প্রেসনিজমে ততটুকু বর্ণনা তুলে ধরা হয়, যতটুকুতে পাঠকের বিরক্তি না এসে যায়। শাহরিয়ারের اي واي مادرم، حيدر بابا، هذيان دل، دو مرغ بهشتي প্রভৃতি কবিতাগুলো ইম্প্রেসনিজম এর অন্তর্ভুক্ত।

ইউরোপীয় রচনাশৈলী

ইউরোপে পশ্চিমা রচনশৈলীতে এরকম আরো অনেক মাকতাব বা রচনাশৈলীর পরিচয় পাওয়া যায়, যেগুলো ফারসি আধুনিক সাহিত্যে অনুসৃত হয়েছে। নিম্নে সেগুলোর কিছু সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরা হলো :

রিয়েলিজম যা রোমান্টিসিজম এর একটি শাখা কিন্তু এর আবেগ অনুভূতিগুলো পুরোপুরি বাস্তব ভিত্তিক। ফারসি ক্ল্যাসিক কবিতায়ও রিয়েলিজমের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ করে হাফিয ও সা'দির কবিতাকে রিয়েলিস্ট কবিতা বলা যায়।

ন্যাচারালিজম উনিশ শতকের গোড়ার দিকে ফ্রেঞ্চ সাহিত্য থেকে এই লেখনি পদ্ধতির উদ্ভব ঘটে এবং আস্তে আস্তে পৃথিবীর অন্যান্য সাহিত্যে ছড়িয়ে পড়ে। লেখনি পদ্ধতিটি জর্মান দার্শনিক কান্ট

ও স্পেন্সার এর প্রভাবপুষ্ট। চিন্তা চেতনার দিক থেকে এটি অদৃষ্টবাদ মতাদর্শের কাছাকাছি। কেউ কেউ এই লেখনিপদ্ধতির মতাদর্শকে কুফুরি মতাদর্শ বলে উল্লেখ করেছেন।

সিম্বোলিজম এই লেখনি পদ্ধতির রীতি হলো মূল বিষয়টিকে গোপন রেখে সাদৃশ্যপূর্ন অন্য কোন বিষয়ের মাধ্যমে সেটিকে বর্ণনা করা। ফারসি সুফি সাহিত্য এই লেখনি পদ্ধতিতে লেখা। বিশেষ করে হাফিযের পুরো সাহিত্য এই লেখনি পদ্ধতিতে লেখা।

আর্ট ফর আর্ট যেটিকে ফারসিতে هنر براي هنر বলা হয়। নৈতিক ও সামাজিক বিষয়াবলী শিল্পের মাধ্যমে এই লেখনিপদ্ধতিতে আলোচনা করা হয় ও নৈতিকতা বৃদ্ধিতে মানুষকে উপদেশ দেওয় হয়। th gautier এই লেখনি পদ্ধতির উদ্ভাবন করেন। পরবর্তীতে ফারসি আধুনিক সাহিত্যে সেটি প্রবেশ করে।

পর্নোসিজম উনিশ শতকের শেষের দিকে ফ্রান্সে এই লেখনি পদ্ধতির উদ্ভব ঘটে। এর উদ্ভাবক ছিলেন ফ্রান্সের কয়েক জন তরুণ কবি সাহিত্যিক। তারা এই লেখনি পদ্ধতিকে পার্নাস নামে অবহিত করেন। ১৮৬৬–১৮৭৬ সালের মধ্যে এই লেখনি পদ্ধতি প্রকাশ পায়। এর অনুসারীদেরকে পার্নাসিস্ট বলা হয়। তাদের বিশ্বাস মতে কবিতায় কবিত্বের আবেগ প্রকাশ পাওয়া ঠিক নয় বরং ইতিহাস, দর্শন সামাজিক সমস্যাবলী প্রভৃতি বাস্তবধর্মী বিষয়াবলী নিয়ে কবিতা লেখা উচিত। (সাদেকি, পৃ: ১৬৭)

ন্যাচারিজম জর্জ বায়লা ও ইউজিন মুনফুর ছিলেন এই লেখনিপদ্ধতির প্রবক্তা। তারা পার্নাসদের রস বিহিন ও সিম্বেলিকদের কল্পনাপ্রবন সাহিত্যের বিপরীথে জীবন, জগত, প্রকৃতি, প্রেম, সৌর্য বীর্য প্রভৃতি বিষয়াবলী নিয়ে ন্যাচারিজম লেখনি পদ্ধতি গড়ে তুলেন।

শাহরিয়ারের দৃষ্টিতে নতুনত্ব :

আধুনিক কবিতার স্বরুপ সম্পর্কে শাহরিয়ার বলেন :

نكته ي قابل ذكر ديگر اين كه سالهاست در كشور ما صحبت از شعر تازه و كهنه است غالبا از من من پرسند كه عقيده ي شما درباره ي اشعار جديد چيست ؟ اينكه جواب بنده چيزي كه مسلم تنها تازگي كافي نيست كه چيزي را قبول خاطر همه بسازد. در هز چيزي شرط اول خوبي و زيبا يي است، بعد چيز هاي ديگر از جمله تازگي

(শাহরিয়ার[৬৬], ১ম খন্ড, পৃ: ৩৭)

অর্থাৎ ঃ আমাদের দেশে, আধুনিক ও পুরনো কবিতা সম্পর্কে যে আলোচনা কয়েক বছর ধরেই চলছে, যদি সে সম্পর্কে আমাকে প্রশ্ন কর যে, ''আধুনিক কবিতা সম্পর্কে তোমার বিশ্বাস কি?'' সে ক্ষেত্রে আমার উত্তর হবে, ''আধুনিকতার জন্য সকলের কাছে গ্রহণযোগ্যতাই যথেষ্ট শর্ত নয়, বরং

সর্বপ্রথম শর্ত হলো কবিতাটি মানসম্মত ও সুন্দর হওয়া। তারপর নতুনত্বের অন্যান্য শর্তাবলী এক্ষেত্রে প্রযোয্য হবে''। তিনি দুটো খন্ড কবিতার দৃষ্টান্ড় পেশ করে বলেন ঃ ''একটি কবিতার বিষয়বস্তু অত্যন্ত পুরোনো যুগের কিন্তু সে বিষয়টি এক দিকে যেমন উপকারী, অন্য দিকে তার প্রভাব মানুষ ও সমাজের উপর রয়েছে। অপর আরেকটি কবিতা রচনাশৈলীর দিক থেকে আধুনিক কিন্তু বিষয়বস্তুটি উপকারী নয়, তোমরা এই দুটোকে যদি কোন অন্ধের সামনেও পেশ কর তবে সেও বলবে প্রথমটি কবিতা, দ্বিতীয়টি কবিতা নয়।

কোন কবিতার আধুনিকতার শর্ত সম্পর্কে কবি বলেন :

فرض كنيد بنده قطعه يي ساخته ام كه الان جلو چشم شماست. اين قطعه مدعي است كه من هم شعر هستم و هم تازه. شروع مي كنيم به خواندن. اگر هيچ تاثيري در ما نكرد. كه اصلا شعر نيست و موضوع منتفي است. اما اگر ثابت شد كه شعر است، از نظر تازگي تجزيه و تشريح مي كنيم. (শাহরিয়ার[৬৬], ১ম খন্ড, পৃ: ৩৮)

অর্থাৎ ঃ মনে কর আমি একটি কবিতা লিখেছি যা তেমাদের সামনে আছে। এই কবিতাটি দাবি করে যে, এটি একটি আধুনিক কবিতা। কবিতাটি পড়তে শুরু করলাম। যদি কবিতাটি আমাদের উপর কোন প্রভাব বিস্তার না করে, তাহলে বুঝতে হবে সেটি কোন কবিতাই নয় এবং এর বিষয়বস্তুও অর্থহীন। কিন্তু এর বিপরীথে যদি প্রমানিত হয় যে এটি একটি কবিতা, সেক্ষেত্রে আধুনিকতার জন্য কি শর্ত প্রজোয্য পারে, সেগুলো সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলো :

প্রথমত : যদি কবিতাটির মধ্যে কোন ছন্দ না থাকে, সেক্ষেত্রে এটিকে আমরা شعر منظوم বা ছন্দবদ্ধ কবিতা বলবো না। যদিও ছন্দ থাকাটা কবিতার জন্য কোন বাদ্ধতামূলক শর্ত নয়।

দ্বিতীয় : যদি একটি কবিতায় কয়েক ধরণের ছন্দ ব্যবহার করা হয় তাহলে এই ধরণের কবিতা কবিতা অনেক আগে থেকেই থিয়েটারে ব্যবহৃত হয়ে আসছে, এতে নতুনত্বের কিছু নেই।

তৃতীয়ত : যদি সবগুলো মেসরাতে কাফিয়া বা অন্তমিল না থাকে তবে তাতেও নতুনত্বের কিছু নেই, কারণ এই ধরণের কবিতা প্রাচীন ফারসি সাহিত্যে ব্যবহৃত হতো, যাকে بحر طويل বলা হয়। বাহরে তা'ভীলে সাধারণত এক- দুই পাতা বক্তব্যের পর অন্ড্রমিল দেওয়া হতো।

চতুর্থত : যদি মেসরা গুলো সব সমান না হয় বরং তা ছোট বড় হয় তাহলে তাতেও নতুনত্বের কিছু নেই, কারণ এই ধরণের কবিতাকে মোস্তাযাদ কবিতা বলা হয় যা ফারসি ক্ল্যাসিক সাহিত্যে বিদ্যমান। আমর অনেক সময় বিদেশি মুক্ত কবিতাকে অনুকরণ করে সেটিকে আধুনিক কবিতা মনে করে থাকি।

পঞ্চমত : যদি ইউরোপিয়ান কোন রচনাশৈলীকে অনুস্বরণ করে কবিতা লেখা হয় তাহলে সেটিকেও আধুনিক কবিতা বলা যায় না। কারণ ইউরোপিয়ান সাহিত্যে সাধানণত মাকতাবে রোমান্টিক কে

সবচেয়ে বেশী অনুকরণ করা হয়েছে, তা নতুন কোন রচনাশৈলী নয় বরং সেটি বর্তমানে পৃথিবীর প্রায় সব সাহিত্যের নিজস্ব রচনাশৈলী হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। ফারসিতেও এর প্রচলন প্রায় ৫৭ বছর আগে থেকেই শুরু হয়েছে। আজ থেকে প্রায় ত্রিশ বছর আগে নিমা ইউশিয তার سه افسايه ي نيما و تابلوي عشق। কবিতা দুটো এই রচনা শৈলীতে লিখেছিলেন। তবে রোমান্টিক রচনাশৈলীর একটি শাখা আধুনিকতার দাবিদার।

ষষ্ঠত : যদি কবিতার মধ্যে বাক্য বিভ্রাট বা মোসনাদ মোনাদ ইলাইহির স্থানকে পরিবর্তন করে দেওয়া হয়, সেক্ষেত্রে এটিকে চিন্তার অবক্ষয় বলা যায়। এতে করে কবিতার প্রকৃত অর্থকে বুঝতে একটু জটিল হয়। কিন্তু এতেও নতুনত্বের কিছু নেই।

সপ্তমত : যদি কবিতায় বিদেশী শব্দ ব্যবহার করা হয় তবে সেটি মোঘল যুগের কবিতার পোষাক বদলানোর সাথে তুলনা করা যায়। অর্থাৎ : মুগল যুগে কবিতায় আরবি শব্দের ব্যবহার হয়েছে, আর বর্তমানে আরবির পরিবর্তে ইউরোপীয় শব্দের ব্যবহার হচ্ছে। এতেও নতুনত্বের কিছু নেই যেহেতু এই ধরণের ব্যবহার অনেক আগে থেকেই ফারসি সাহিত্যে ছিল।

এখন প্রশ্ন হলো নতুনত্ব বা আধুনিকতা কাকে বলে?

শাহরিয়ারের মতে :

حالا مي آييم به سراغ روحيه و موضوع و مطلب، كه تازگي اينها شرط اصلي تازگي شعر است. اگر قطعه يک روحيه ط كيفيت تازه و يک موضوع و مطلب تازه پيدا كرديم كه واقعا مال مطلق من بودند، آن وقت به اين قطعه كه شعر بود مي توانيم بگوييم تازه هم هست(শাহরিয়ার[৬৬], ১ম খন্ড, পৃ: ৩৮)

অর্থাৎ ঃ একটি কবিতার বিষয়বস্তু ও মানষিকতার নতুনত্ব সেই কবিতার আধুকতার জন্য মূল শর্ত। যদি একটি কবিতার ধরণ, বিষয়বস্তু ও উপস্থাপনার ভেতর নতুনত্ব দেখতে পাওয়া যায় এবং সেটি যদি আমার মুক্ত ও সাহিত্যকর্ম হয় তবে সেটি কবিতা ও তার ভিতরে নতুনত্বও আছে।

কবিতার ধরণ ও মানষিকতার নতুনত্বকে আস্বাদন করতে হয়, এটি বর্ণনা বা বিশ্লেষণের বিষয় নয়। আস্বাদন বলতে এখানে সঠিক মান নির্ধারণের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো সবসময়ে সঠিক মান নির্ধারণটি সম্ভব হয়ে উঠে না। যেমন খায়ু কেরমানি বলেছেন اي سخن شناس نه جان من خطا اينجاست অর্থাৎ প্রিয় আমার তুমি কথার মানকে নির্ধারণ করতে পারনা, ভুলটাতো এখানেই।

এখন প্রশ্ন হলো যখন নতুনত্বে জন্য প্রধান দুটি শর্ত অর্থাৎ বিষয়বস্তু ও ধরণের নতুনত্ব পাওয় যাবে, তখন নতুনত্বের জন্য এই দুটো শর্তই কি যথেষ্ট হবে না আরো কিছু শর্ত পূরণ করার প্রয়োজন আছে ? এই প্রসঙ্গে শাহরিয়ার বলেন :

Dhaka University Institutional Repository

آن وقت مي آييم سر وقت شرايط فرعي، که تکميل کننده تازگي هستند و در يک قطعة کاملا تازه انيها هم بايد رعايت شده باشند (শাহরিয়ার[৬৬], ১ম খন্ড, পৃঃ ৩৮)

অর্থাৎ ঃ সে সময়ে অতিরীক্ত কিছু বৈশিষ্ট্যের দিকে আমাদেরকে নজর দিতে হবে যা আধুনিকতার জন্য পরিপূরক। একটি আধুনিক কবিতায় সে শর্তগুলোকে পূরণ করতে হবে। শাহরিয়ারের মতে শর্তগুলো নিম্নরূপ :

সাবক বা রচনাশৈলী : ফারসি সাহিত্যে সবছেয়ে আধুনিক রচাশৈলী হলো সাবকে সাদেহ বা সহজ রচনাশৈলী, যাকে সাবকে মোতাজাদ্দেদও বলা হয়। এই সাবক কে সাধারণ মানুষের মনের কথা সহজ সরল ভাষায় বর্ণনা করা হয়।

মাকতাব বা লেখনি পদ্ধতি : সবচেয়ে আধুনিক লেখনিপদ্ধতি হলো মাকতাবে রোমান্টিক। সংক্ষেপে যাকে ইম্প্রেসিজম বলা হয়।

কবিতার প্রকার : পুরনো কবিতার বাহরে তা'বীল ও মোস্তাযাদকে বা এই দুটোর মিশ্র রূপকে মাকতাবে রোমান্টিকে, বর্তমান যুগের ভাবপ্রকাশের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। আধুনিক কবিতার প্রকার হিসেবে ফারসি সাহিত্যে প্রচলিত সমস্থ প্রকার কে অন্তরর্ভুক্ত করা যায়, কিন্তু সেক্ষেত্রে নতুনত্ব ও কর্মের স্বাধীনতা হলো মুখ্য বিষয়।

কবিতার স্তর : আধুনিকতা সবকিছুতেই নতুনত্বের দাবিদার। পুরোনো কোন কিছু ফিরিয়ে আনা আধুনিকতার জন্য ক্ষতিকারক। কবিতার এই স্ড়রকে ঠিক রাখার জন্য দুটো বিষয়ের স্তরের দিকে আমাদের নজর রাখা দরকার।

প্রথমত : শব্দের স্তর। কবিতায় ব্যবহৃত শব্দগুলোর আধুনিকতার জন্য শর্ত হলো, শব্দগুলো কোনভাবেই নিম্নমানের, অবশিষ্ট্য, দূর্বল, অশ্লীল ও অত্যন্ত পুরোনো হওয়া চলবে না। বরং এমন শব্দকে চয়ন করতে হবে, যা আধুনিক যুগের বিষয়বস্তু ও পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্যশীল।

দ্বিতীয়ত : বিষয়বস্তুর স্তর। বিষয়বস্তুর নতুনত্বের জন্য শর্ত হলো : এমন বিষয় বস্তুকে নির্বাচন করতে হবে যা সামাজিক, চারিত্রিক বা আধ্যাত্মিক বিষয়ের হবে এবং সেখানে ইতিবাচক উপস্থাপনা থাকতে হবে যাতে পাঠক সেখান থেকে উপকৃত হতে পারে। এমন কোন বিষয়কে নির্বাচন করা যাবে না যা ক্ষতিকারক।

আধুনিক কবিতা ও শাহরিয়ার :

নতুনত্বের প্রতি শাহরিয়ারের প্রচন্ড আগ্রহ ছিল। তিনি তার কবিতাগুলোকে নতুন ভাষা, চিত্রকল্প, বিষয়বস্তু ও চিন্তা-চেতনার দ্বারা নতুন আঙ্গিকে সাজাবার চেষ্টা করেছেন। নব যৌবনের উদ্দিপনা ও আধুনিক ভাবনা তার কবিতার সর্বোত্র প্রতিফলিত হয়েছে। دکتر غلامحسين يوسفي বলেন :

Dhaka University Institutional Repository

اين شاعر با اين كه سي سال بيشتر ندارد البته در زمان گفتار گوينده ليكن اشعرش در كمال پختگي است و مي توان گفت فكر رسا، ظرفت الفاظ، لطافت معاني و نفوذي كه يک شعر خوب بايد داشته باشد، در اشعار او هست» (শাহরিয়ার[৬৬], ১ম খন্ড, পৃ: ৫০)

আর্থাৎ ঃ তার বয়স ত্রিশ বছরের বেশী ছিলনা কিন্তু তার কবিতা গুলো ছিল পরিপক্ক, এক কথায় বলা যায়, একটি সার্থক কবিতার জন্য যে সমস্থ শর্ত প্রয়োজন, যেমন : সুস্পষ্ট চিন্তা, সূক্ষ শব্দচয়ন ও বিষয়বস্তুর প্রভাব, সবকিছুই তার কবিতায় পাওয়া যায়।

শাহরিয়ারের মত যারা নতুনত্বকে ভালবাসতেন তাদেরকে সাথে নিয়ে آزاديستان ও دانشكده পত্রিকায় লেখালেখি শুরু করেন। শাহরিয়ারের পূর্বে جعفر شمس كسمايي، تقي رفعت ও خامنه اي প্রমুখ। তাদের ঐকান্তিক চেষ্টার ফলে ফারসি সাহিত্যে আধুনিক কবিতার কিছু দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত হয়। কিন্তু দীর্ঘ জীবন না পাওয়ার কারণে তাদের এই চেষ্টা অকালেই থেমে যায়। নিমা ইউশিয তাদের এই চেষ্টাকে আরো এগিয়ে নিয়ে যান এবং افسانه কাব্যগ্রন্থের মাধ্যমে ফারসি কবিতায় নতুন যুগের সূচনা করেন। কিন্তু কেউ কেউ নিমা ইউশিযের এই চেষ্টাকে ভালভাবে গ্রহণ করেন, আবার কেউ কেউ তার প্রচন্ড সমালোচনা করেন। বিশেষ করে যুবকরা নিমার এই চেষ্টায় অনুপ্রাণিত হয়ে আধুনিক কবিতার নতুন নতুন দৃষ্টান্ত তৈরী করেন।

নিমার সমালোচকগণ তার প্রচন্ড সমালোচনা ও ছন্দবিহীন কবিতাকে ব্যঙ্গ করতে থাকেন। শাহরিয়ার সে সময়ে ক্ল্যাসিক রীতি আনুসারে গযল ও কাসিদা লিখতেন। কিন্তু তা সত্বেও সে সময়ে নিমার আধুনিক নিয়মের কবিতার পক্ষ অবলম্বন করেন। তার شاعر افسانه নামক গযলে নিমাকে উদ্দেশ্য করে বলেন :

نيما، غم دل گو كه غريبانه بگريم

سر پيش هم آريم و دو ديوانه بگريم

(শাহরিয়ার[৬৬], ১ম খন্ড, পৃ: ৩৩৫)

উচ্চারণ ঃ

নিমা', গামে দেল গু কে গারীবা'নে বেগারীম,

সারে পীশ হাম অ'রীম ভা দো দিভা'নে বেগারীম ॥

অর্থ ঃ

নিমা, মনের দুঃখ বল যা দিয়ে আমরা সজ্জিত হব,

আমাদের কাছে সেটিকে নয়ে আসব ও এই দুই পাগল সজ্জিত হব ॥

তিনি আরো বলেন :

بگذار به هذیان تو طفلانه بخندید

ما هم به تب طفل طبیبانه بگریم

(শাহরিয়ার[৬৬], ১ম খন্ড, পৃ: ৩৩৬)

উচ্চারণ ঃ

বোগযা'র বে হাযইয়া'নে তো তেফলা'নে বেখান্দীদ,

মা' হাম বে তাবে ত্বেফ্ল ত্বাবীবা'নে বেগারীম ॥

অর্থ ঃ

চালিয়ে যাও তোমার প্রলাপ বাক্য বাচ্চারাতো হাসবেই,

আমারাও বাচ্চাদের জ্বরের মূহুর্তে ডাক্টার সেজে যাব ॥

ফারসি আধুনিক কবিতার জনক নিমা ইউশিযের সাথে শাহরিয়ারের বন্ধুত্ব ও সখ্যতা ছিল। শাহরিয়ার কখনোই নিমা ইউশিজকে ব্যাপকভাবে অনুস্বরণ করেন নাই, তবে নিমার উদ্ভাবিত মুক্ত কবিতার অনুসরণে কিছু কবিতা রচনা করেন। শাহরিয়ারের پیام به انیشتن কতিাটি তার একটি উদাহরণ যেমন :

انیشتن صدهزار احسن و لیکن صد هزار افسوس

حریف از کشف و الهام تو دارد بمب مي سازد

انیشتن اژدهاي جنگ

جهنم کام وحشتناك خود را باز خواهد کرد

. . .

انيشتن نامي از ايران ويران هم شنيدستي

حكيما محترم مي دار مهد ابن سينا را

به اين وحشي تمدن گوشزد كن حرمت ما را

(শাহরিয়ার[৬৬], ২য় খন্ড, পৃ: ৮৫৮)

উচ্চারণ ঃ

আনিশতান সাদ হেযা'র আহসান ভালীকান সাদ হেযা'র আফসুস

হারীফ আয কাশফো এলহামে তো দা'রাদ বোম্ব মিসা'যাদ

আনিশতান আম্বদাহা'য়ে জাঙ্গ

জাহান্নামে কা'ম ও ভহশাতনা'কে খূদ রা' বা'য খা'হাদ কারদ ॥

...

আনিশতান না'মি আয ইরা'নে ভিরা'ন হাম শানিদাস্তি

হাকিমা' মোহতারাম মী দা'রাদ মাহদে ইবনে সীনা' রা'

বে ঈন ভহশিয়ে তামাদ্দুন গুশযাদ হোরমাতে মা' রা' ॥

অর্থ ঃ

আইনেস্টাইন, শত সহস্র ধন্যবাদ কিন্তু শত সহস্র আফসোস তোমার জন্য

তোমার জ্ঞান ও আবিষ্কারের অপব্যবহার করে আজ বোমা বানানো হচ্ছে

আইনেস্টাইন যুদ্ধের অজগর সাপ

তার নরকীয় কামনা ও ভয়াবহতাকে উম্মুক্ত করছে ॥

...

আইনেস্টাইন, তুমি ধ্বংস প্রাপ্ত ইরানের নাম শুনেছ

Dhaka University Institutional Repository

আমাদের একজন সম্মানিত বৈজ্ঞানিক আছেন যার নাম ইবনে সিনা'

সভ্যতার এই হিংস্রতা আমাদের সম্মান কে ভুলণ্ঠিত করছে ॥

তার ' اي واي مادرم ' কবিতাটিও আধুনিক কবিতার একটি চমৎকার উদাহরণ। তিনি বলছেন :

آهسته باز از بغل پله ها گذشت
در فکر آش و سبزي بيمار خويش بود
او مرده است و باز پرستار حال ماست
در زندگي ما همه جا او ول مي خورد
هر کنج خانه صحنه اي از داستان اوست
در ختم خويش هم به سر کار خويش بود

بيچاره مادر من
او مرد و در کنار پدر زير خاک رفت
ديشب لحاف رد شده بر روي من کشيد
ليوان آب از بغل من کنار زد ،
در نصفه هاي شب.
يک خواب سهمناک و پريدم به حال تب
نزديک هاي صبح
او زير پاي من اينجا نشسته بود
آهسته با خدا ،
راز و نياز داشت
نه ، او نمرده است

(শাহরিয়ার[৬৬], দ্বিতীয় খন্ড, পৃ: ৮৬৩)

উচ্চারণ ঃ

অ'হেস্তে বা'য বাগালে পেল্লেহা' গোযাশত

দার ফেক্বরে অ'শ ভা' সাবযিয়ে বিমা'রীয়ে খূদ বূদ

উ মোরদে আস্ত বা'য পারাস্তা'রে হা'লে মা'স্ত

দার যেন্দেগিয়ে মা' হামে জা উ ভল মীখূরাদ

হার কোনজে খা'নে সাহনে ই আয দা'স্তা'নে উস্ত

দার খাতমে খীশ হাম বে সারে কা'রে খীশ বূদ

বীচা'রে মা'দারে মান

উ মোরদে আস্ত ভা দার কিনা'রে পেদার যীরে খা'ক রাফত

দিশাব লাহাফ রাদ শুদে বার রূয়ে মান কোশীদ

লিভানে অ'ব আয বাগালে মান কিনা'র যাদ

দার নেসফ্ হা'য়ে শাব

এক খা'বে সাহামনা'ক পারীদাম বে হা'লে তা'ব

নাযদিক হায়ে সুবহ

উ যীরে পায়ে মান ইনজা' নেশাস্তে বূদ

অ'হেস্তে বা' খোদা'

রা'যো নিয়া'য দা'শ্ত

না, উ না মোরদে আস্ত ॥

অর্থ ঃ

আস্তে করে সিড়ির কিনারা দিয়ে চলে গেছেন

নিজের অসুস্থতার সুপ আর সব্জি নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন

তিনি মরে গেছেন কিন্তু আমাদের অবস্থা নিয়ে এখনো ব্যস্ত আছেন

আমাদের জীবনের প্রতিটি প্রান্তে নাড়া দিচ্ছেন

আমাদের ঘরের প্রতিটি কোনে তার গল্পের মঞ্চ

নিজেকে শেষ করে দিয়েও দায়িত্বগুলো সব করে গেছেন

Dhaka University Institutional Repository

বেচারা আমার মা

তিনি মারা গেছেন, আমার বাবার পাশে কবরস্ত হয়েছেন

গত রাতে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে ছিলাম

পানির গ্লাস আমার পাশে রাখা ছিল

ঠিক মধ্য রাতে

এক ভয়ঙ্কর স্বপ্ন জ্বরের মত আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল

ভোরের দিকে সে আমার পায়ের নিচে ঠিক এই যায়গায়

খোদার শপথ করে বলছি, আস্তে করে বসেছিল

কি প্রয়োজন আর রহস্য নিয়ে সে এসেছিল

না সে মরে নাই ॥

পরবর্তীতে শাহরিয়ার নিজ গ্রাম তোসেনে আধুনিক কবিতার দৃষ্টান্ত স্বরুপ افسانة شب، هذيان دل، موميايي، سهند و شعر آذري প্রভৃতি কবিতাগুলো লিখেন। যারা আধুনিক গদ্য কবিতাকে বেদআত বলে আখ্যায়িত করতেন, তাদের কথার জবাবে শাহরিয়ার বলেন :

اين نوع شعر كه (آزاد) نام اوست

جمع ميان بحر طويل است و مستبزاد

(শাহরিয়ার[৬৬], ১ম খন্ড, পৃ:)

উচ্চারণ ঃ

ঈন নো শে-র কে (অ'যাদ) না'মে উস্ত,

জাময়ে মিয়া'নে বাহরে ত্বাভীল আস্ত ভা মুসবেযা'দ ॥

অর্থ ঃ

এই ধরণের কবিতা যাকে আধুনিক বলা হয়,

Dhaka University Institutional Repository

সেটি মূলত দীর্ঘ মাত্রা ও সপ্তপদী কবিতার মিশ্রন মাত্র ॥

কিন্ড়যারা আধুনিকতার আযুহাতে ফারসি কবিতায় ছন্দের ব্যাবহারকে অপ্রয়োজনিয় মনে করেন, তাদেরকে শতর্ক করে দিয়ে কবি বলছেন ঃ

كلام نثر بود گر كه وزن از او دور است

كه نثر گر همه شعر است، شعر منثور است

چرا كه شعر به تلفيق و موسيقي است

به غير نثر چه ماند اگر نه بلفيقي است

(শাহরিয়ার[৬৬], ১ম খন্ড, পৃ:)

উচ্চারণ ঃ

কালা'মে নাসর বুদ কে ভযন আয ঊ দুরাস্ত,

কে নাসর গার হামে শে-র আস্ত শে-র মানসুর আস্ত।

চেরা' কে শে-র বে তালফিক ও মোওসীকী আস্ত,

বে গাইরে নাসর চে মা'ন্দ আগার না তালফীকী আস্ত ॥

অর্থ ঃ

গদ্য তাকে বলা হয় ছন্দ থেকে যা দূরে রয়,

যদি সব গদ্যকে কবিতা হয় তাহলে গদ্যই কবিতা।

কেন কবিতা ছন্দের মাধ্যমে সুবিন্যস্ত হয়,

গদ্যকে বাদ দিলেও কি হবে যদি তা সুবিন্যস্ত না হয় ॥

শাহরিয়ার বিশ্বাস করতেন, ছন্দের মাধ্যমেও কবিতায় আধুনিকতা আনা সম্ভব। শাহরিয়ারের আধিকাংশ কবিতায় ছন্দ দেখতে পাওয়া যায়। তিনি বিশ্বাস করতেন ছন্দবদ্ধ কবিতায় আধুনিকতা আনা সম্ভব। তিনি বলেন :

« اول باید در شعر عروضي مسلط بود، بعد رفت سراغ
شعر نو و الاآدم شکست مي خورد. مطالعه ي اشعار
کلاسیک براي هر شاعر لازم است. (শাহরিয়ার[৬৬], **১ম** খন্ড, পৃ:)

অর্থাৎ ঃ কবিদের প্রথমেই ছন্দ কবিতার উপর দক্ষ হওয়া প্রয়োজন, এরপর অধুনিক কবিতার জন্য চেষ্টা করা উচিত। ক্ল্যাসিক কবিতা অধ্যায়ন করা প্রত্যেক কবিদের জন্য আবশ্যক।

গযল লেখার ক্ষেত্রে শাহরিয়ার অনন্য দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেন। নিজস্ব মেধা, মননশীলতা, স্বকীয়তা ও রচনাশৈলীর দ্বারা গযলকে আধুনিক করে তুলেন। নতুনভাবে গযলকে পাঠকদের সামনে তুলে ধরেন। তার এই উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে ফারসি সাহিত্যে নতুন রচনাশৈলীর উদ্ভব ঘটে যা مکتب شهریار বা শাহরিয়ার রচনাশৈলী নমে পরিচিত। শাহরিয়ারের « ساز صبا»، « گوهر فروش»، « غزال و غزل»، « سه تار من»، « غزل رمیده»، « مرغ بهشتي» গযল সমূহ ফারসি সাহিত্যে অনন্য শিল্পকর্ম হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে।

শাহরিয়ারের কিছু আধুনিক কবিতাকে مکتب شهریار বা শাহরিয়ারের নিজস্ব রচনাশৈলীতে লেখা আধুনিক কবিতা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। তার راز و نیاز، سرنوشت عشق، دو مرغ بهشتي، شاهد شعر، قهرمان استالینگراد، مومیایي، زفاف شاعر، سرود راه آهن، شیون شهریور، دختر آسمان প্রভৃতি কবিতা মাকতাবে শাহরিয়ারে লেখা।

আধুনিক কবি হিসেবে শাহরিয়ারের মূল্যায়ন :

আধুনিক কবি হিসেবে কাউকে মূল্যায়ন করতে হলে আধুনিক কবিতা সম্পর্কে আমাদের ধারণা থাকা প্রয়োজন। উপরোক্ত আলোচনা এটা প্রমানিত যে গদ্য কবিতা মানেই আধুনিক কবিতা নয়। আধুনিক কবিতার লক্ষণ সম্পর্কে হাসান হাফিজুর রহমান বলেন :

আধুনিক কবিতার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য সম্ভবত : এই যে, এইটে কারোর অতি অভ্যস্ত বিহবলতাকে এড়িয়ে একটা সজ্ঞান পৌরুষে মন্ডিত হয়ে উঠতে চায়। সচেতন তীক্ষ্ণধী এবং নিজের অস্তিত্বকে খুব স্বাভাবিকভাবেই জানে বোঝে। রুচির দিক থেকে এ classics-এর পর্যায়ের। তবে classics-এর vision-শুধুই বাহ্যিক, এর vision-মনের। বহিরঙ্গ মহিমাকে ঋজু মেজাকে জানার সাধনা classics-এর। মনের বিপুল জটিল পরিসরের অন্তরঙ্গতায় ব্যাপকতার বহির্বিশ্বকে সেই মৌলিক মানবিক ঋজু স্বভাবে অবিমিশ্রভাবে আগ্রত করার ধ্যান আধুনিকতার। বস্তুগত কিংবা নীতিগত কিংবা ভাবগত কোনো

নির্ধারিত standard কে সামনে রেখে মে- romantic-অর্চনার উজ্জীবত তা থেকে আধুনিক কবিতার প্রকৃতি নিশ্চিতরূপে স্বতন্ত্র। কেননা, এর ভাবনার জাগৃতি হচ্ছে বস্তু বা নীতির নির্ণয় বা নিরূপণের মধ্যে, যাকে আমরা বলি সত্যের অনুসন্ধিৎসা, সত্য নির্ধারণের প্রায়াস। অন্যদিকে classics-এর প্রকৃতি মূলতঃ বস্তুর আকার-নির্ভর মহৎ বর্ণনায়। ক্লাসিক বস্তুকে রূপান্তড়িত করে, নিও ক্লাসিক স্বভাবকে সন্ধান করে। তবে এ দুইয়ের মিল এইখানে যে, উভয়েই বাস্তবতা আশ্রয়ী এবং মেজাজে ঋজু এবং উন্মার্গতাবিমুখ। স্বভাবের এই ঋজু দিকটার পুনঃঅন্বেষণ প্রজেষ্টার মূল্য অপরিসীম। এই প্রেক্ষিতে তাই বলা যেতে পারে, আধুনিক কবিতা মানব সভ্যতার অগ্রসরমান ঐতিহ্যের নিবিড়তম সত্য, সেই সত্যের যথার্থতম মূল্যায়ন এবং তার সার্থক প্রতিষ্ঠা ও বিপুলতর বিকাশের দিকেই প্রসারিত। এইটে কাব্য-চেতনার বিবর্তনের দিক এবং এ প্রমাণ কছে আধুনিক কবিতা ভুইফোড় নয় এবং এর রুচি, রস ও অভিজ্ঞান আকস্মিক বা বিজাতীয় চীৎকারে বিদীর্ণও নয়। বিশেষ করে পরতন্ত্র তো নয়ই। এর যা নতুন তা কেবলই গতিশীল পৃথিবীর বিরামহীন আহরণ এবং তার অনায়াস ব্যবহার-প্রয়াসের বিচিত্র বিস্ময়কর কলাকুশলতা। যা এ কঠিন অহস্কার ছাটাই করেছে, তা কাব্য শরীরের ভঙ্গুর-বিহবল আবরণ, দীর্ঘকাল ধরে কাব্যিকতার অহেতুক প্রতীক হিসাবে যাকে আমরা প্রায় অন্ধ বিশ্বাসের মত মেনে নিয়েছি। শাদা কথায় আধুনিক কবিতা romantic-গীতিকবিতার অলৌকিক স্বভাব থেকে আলাদা। এই রুচি romantic-মানস ও বুদ্ধি মহতীকরণ স্বভাব থেকে একে সরিয়ে নিতে চায়। এর চারিত্রা তাই অবিমিশ্রিভাবে লোকজ। জীবনের সাংসারিকতায়, লোকবুদ্ধির হিসাবী প্রত্যাহে আধুনিকতার উৎস, যেখানে মানবীয় বা বস্তুগত সম্পর্ক সর্বত্র আপেক্ষিক হয়ে উঠেছে। দৃশ্য এবং বুদ্ধি, জাগতিক গতি এবং প্রতিক্রিয়াপন্ন মন-এই উভয়ত : মিলনের গূঢ় পটভূমিতে আধুনিক কবিতা তাই হীনমন্যতা তেকে উচ্চাভিলাষে, অবক্ষয়ের করুণ আর্ত উপলব্ধি থেকে সময় ও বিষয়ের মাত্রিক বিচারে স্বতোৎসারিত। তাই এ কোথাও সংক্ষিপ্ত নয়; দ্রৌপদীর শাড়ীর মত কেবলই নিজের এক আয়তনকে নতুনতর আরেক আয়তনের মধ্যে সঞ্চালিত করে দেয়, কিছুতেই সঞ্চরণশীল ঘটনা ও তার অনিঃশেষ প্রক্ষেপকে এড়াতে পারে না। পলায়ন থেকে, ব্যতিক্রমবাদী স্বাতন্ত্রী ভূমিকা থেকে দায়িত্বের নায়কের আসরে নেমে এসেছে এ এবং সময়ের অন্তহীন বিষয় ও তার প্রতিফলনকে অবিমিশ্র করে তুলছে ক্রমান্বয়ে। আধুনিক কবিতা তাই স্পষ্টতই নিবিষ্ট।(রহমান[৫৮], পৃ: ১৯-২০)

কবিতার গুন বিচারে ও নিম্নোক্ত কারণে আমরা শাহরিয়ারকে সন্দেহাতীতভাবে একজন সফল আধুনিক কবি হিসেবে মূল্যায়ন করতে পারি।

প্রথমত : যুগের বিচারে শাহরিয়ার ছিলেন আধুনিক কবি। তিনি জন্মগ্রহণ করেন ১২৮৫ হি: শা: মেতাবেক ১৯০৬ খ্রিষ্টাব্দে। প্রথম কাব্য গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৩১০ হি: শা: বা ১৯৩১ খ্রিষ্টাব্দে। অর্থাৎ কবি হিসেবে শাহরিয়ারের আত্মপ্রকাশ ঘটে ১৯৩১ খ্রিষ্টাব্দে। শাহরিয়ারের জন্মগ্রহণের আগে থেকেই বা মাশরুতিয়াত অন্দেলনের পূর্বযুগ থেকেই ফারসি কবিতার আধুনিকতার যুগ শুরু হয়। যে সময় তিনি কবি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন সে যুগ ফারসি সাহিত্যের পূর্ণ আধুনিক যুগ। তাই বলা যায় জন্মগত ভাবেই শাহরিয়ার ছিলেন অধুনিক কবি।

দ্বিতিয়ত : শাহরিয়ারের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব ছিল তিনি ফারসি সাহিত্যে আধুনিক গযলের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেন। নতুন করে গযলের চাহিদা পাঠকদের মনে তৈরী করেন। তার এই প্রচেষ্টায় ফারসি গযল নতুন প্রাণ পায় এবং গযল রচনার ক্ষেত্রে নতুন যুগের সূচনা হয়। তাই গযলের বিচারে শাহরিয়ার ছিলেন আধুনিক কবি।

তৃতীয়ত : ফারসি কবিতায় আধুনিকতা শুরু হয় বিষয়বস্তু পরিবর্তনের মাধ্যমে। মাশরুতিয়াত পূর্ব যুগে কবিগণ এমন কিছু বিষয়বস্তু নিয়ে কবিতা লিখতেন, যেগুলো ফারসি সাহিত্যে অনপুস্থিত ছিল। যেমন : স্বাধীনতার চেতনা, সামাজিক ও রাজনৈতিক সমালোচনা, দেশপ্রেম, সমধিকার, ব্যক্তি স্বাধীনতা, নারীর অধিকার প্রভৃতি। শাহরিয়ার নতুন নতুন বিষয়াবলীকে নতুনভাবে পাঠকদের কাছে উপস্থাপন করেন। সূতরাং বিষয়বস্তুর দৃষ্টিতে তিনি আধুনিক কবি ছিলেন।

চতুর্থত : শাহরিয়ারের কবিতার ভাষা ছিল সহজ, সরল ও জটিলতা মুক্ত। কিছু কিছু সময় তার কবিতা পড়লে মনে হতো দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত মানুষের মুখের ভাষাকে তিনি কবিতায় ব্যবহার করেছেন। তার কবিতায় আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহারও দেখতে পাওয়া যায়। এগুলো সবই আধুনিক কবিতার ভাষাগত বৈশিষ্ট। ভাষার বিচারে আমরা শাহরিয়ারকে সফল আধুনিক কবি বলতে পারি।

পঞ্চমত : কাব্যলংকার ব্যবহারের ক্ষেত্রে শাহরিয়ার স্বকীয়তার পরিচয় দিয়েছেন। এমন কিছু তাশবীহ, এস্তেয়ারা, কেনায়া ব্যবহার করেছেন যা ইতপূর্বে ফারসি সাহিত্যে দেখতে পাওয়া যায়না। কাব্যলংকারের বিচারে শাহরিয়ারকে আধুনিক কবি বলা যায়।

ষষ্ঠত : শাহরিয়ারের অধিকাংশ কবিতা ছিল ছন্দবদ্ধ। ছন্দবদ্ধ কবিতায় আধুনিকতা আনা সম্ভব সে দৃষ্টান্ত তিনি দেখিয়েছেন। তাই ছন্দবদ্ধ আধুনিক কবিতার জনক হিসেবে আমরা শাহরিয়ারকে মূল্যায়ন করতে পারি।

সপ্তমত : নিমা ইউশিজকে ফারসি আধুনিক কবিতার জনক বলা হয়। কারণ তিনি ফারসি কাব্যে শে-রে অ'যাদ বা মুক্ত কবিতার প্রবর্তক ছিলেন। শাহরিয়ার, নিমা ইউশিজের ভাব শিষ্য ছিলেন। নিমার শে-রে অ'যাদের আদলে তিনিও মুক্ত কবিতা রচনা করেন। শাহরিয়ারের দিভানে বেশ কিছু মুক্ত কবিতা দেখতে পাওয়া যায়। এই ক্ষেত্রে আধুনিক কবি হিসেবে আমরা তাকে মূল্যায়ন করতে পারি।

অষ্টমত : শাহরিয়ারের কবিতায় ব্যবহৃত চিত্রকল্পগুলো ছিল জীবন্ত ও প্রাণবন্ত। চিত্রকল্প উপস্থাপণে নতুনত্ব ছিল চোখে পড়ার মত। চিত্রকল্প ব্যবহারের ক্ষেত্রে তিনি আধুনিক মন মানুষিকতার পরিচয় দেন।

নবমত : ফারসি সাহিত্যে শাহরিয়ার নতুন মাকতাব বা লেখনি পদ্ধতির জন্ম দেন, যা মাকতাবে শাহরিয়ার বা শাহরিয়ারের লেখনি পদ্ধতি হিসেবে প্রসিদ্ধি পায়। এই কৃতিত্বের কারণে নিঃসন্দেহে আমরা শাহরিয়ারকে আধুনিক কবিদের কাতারে দাড় করাতে পারি।

চতুর্থ অধ্যায়

শাহরিয়ারের জীবনে অধ্যাত্মবাদের সূচনা :

ফারসি সাহিত্যের সাথে অধ্যাত্মবাদের সম্পর্ক অত্যন্ত প্রাচীন। সুফি কবিরাই ফারসি সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধনে বিশেষ ভূমিকা রেখেছেন। সালজুকি যুগ থেকেই ফারসি সাহিত্যে অধ্যাত্মবাদের সূচনা হয়। সে সময়ে ইরানে অনেক খানকাহ প্রতিষ্ঠিত হয়। ষষ্ঠ শতকের প্রসিদ্ধ কবিগণ যেমন : খাকানি, সানায়ি ও নিজামি গানযুবির কবিতায় ধর্ম, আধ্যাত্মিকতা, নিতি-নৈতিকতা প্রভৃতি বিষয়াবলী ব্যপক ভাবে দেখতে পাওয়া যায়। (শামিসা[৬৩], পৃঃ ১৯৫)

ফারসি সাহিত্যের প্রথম সুফি কবি ছিলেন আবু সাঈদ আবুল খায়ের । আধ্যাপক লেভি এই প্রসঙ্গে বলেন :

the first poet of note in the Sufi movement was Abu said ibn Abil Khair (A.D 968-1049), who revived and popularized quatrain as a verse form and established its position as a common vehicle of mystical thought (Levy, p: 36)

মোগলদের হামলার পর ইরানের রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে ব্যপক অস্থিরতা দেখা দেয়। এই অস্থিরতার ফলে আধ্যাত্মিক সাধনার প্রতি মানুষের মনোযোগ আরো বৃদ্ধি পায়।

১৩০৭ হিঃ শাঃ থেকেই তিনি আধ্যাত্মিক সাধনার সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। ১৩০৭ থেকে ১৩০৯ হিঃ শাঃ ১৯২৮-১৯৩০ খ্রিঃ পর্যন্ত মরহুম ডক্টর সাকফির খানকায় নিয়মিত যাতায়াত করতেন। সেখান থেকে তিনি আধ্যাত্মিক জ্ঞান অর্জন করেন এবং নিজের জীবনে সেই শিক্ষাকে কাজে লাগানোর চেষ্টা অব্যাহত রাখেন। তিনি বলেন :

روح يكي از اولياء با من مرتبط شد و مشكلاتي را كه
در راه حقيقت و عرفان داشتم و براي من مبهم و
مجهول بود گشود. (শাহরিয়ার[৬৬], ১ম খন্ড, পৃঃ)

অর্থাৎ ঃ একজন আল্লাহর ওলির সাথে আমার রুহানি সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এর দ্বারা আধ্যাত্মিক সাধণার পথে যে সমস্ত সমস্যাবলী আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল, সেগুলো খোলাসা হয়ে যায়।

শাহরিয়ারের সাহিত্য রচনার সমস্থ অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে তার প্রেম। জীবনে প্রথম প্রেম আসে এম, বি, বি, এস পড়াকালীন সময়ে। সহপাঠি সুরাইয়ার প্রেমে তিনি আসক্ত হয়ে পরেন। সুরাইয়া

সেনাবাহিনির কর্নেলের মেয়ে ছিলেন । অসাধারণ রূপের কারণে কবি তাকে পরী বলে ডাকতেন। পরিকে নিয়ে অনেক কবিতা লিখেছন। প্রথম জীবনের পুরো সাহিত্যকর্ম জুড়েই ছিল পরির আবস্থান। খুব ভালভাবেই চলছিল তাদের প্রণয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই সম্পর্ক করুণ পরিণতির দিকে গড়ায়। সুরাইয়ার জন্য শাহরিয়ারকে তেহরান ছেড়ে চলে যেতে হয়। সুরাইয়ার বিয়ে হয় রেজা শাহ পাহলভীর দরবারের তরুণ মন্ত্রী আব্দুল হোসাইন তৈইমুরতশের সাথে। (পৃ: ৫-১৩ এর দ্রষ্টব্য)

জাগতিক প্রেমের ব্যর্থতা কবিকে আধ্যাত্মিক প্রেমের অনুপ্রেরণা জোগায়। জীবনের বড় একটি সময় ব্যায় করেন আধ্যাত্মিক সাধনার পিছনে। কবি-বন্ধু জনাব যাহেদি বলেন :

"شهريار در سالهاي 1307 تا 1309 در مجالس احضار ارواح كه توسط مرحوم دكتر ثقفي تشكيل مي شد شركت مي كرد ، شهريار در آن مجالس كشفيات زيادي كرده است و آن كشفيات او را به سير و سلوكاتي مي كشاند . در سال 1310 كه به خراسان مي رود تا سال 1314 كه در آن صفحات بوده دنباله اين افكار را داشته است و در]از[سال 1314 كه به تهران مراجعت مي كند تا سال 1319 اين افكار و اعمال را با شدت بيشتري تعقيب مي كند. تا اينكه در سال 1319 داخل جرگه فقر و درويشي مي شود و سير و سلوك اين مرحله را به سرعت طي مي كند و در اين طريق به قدري پيش مي رود كه بر حسب دستور پيرمرشد قرار مي شود كه خرقه بگيرد و جانشين پير شود. تكليف اين عمل شهريار را مدتي در فكر و انديشه عميق قرار مي دهد و چندين ماه در حال ترديد و حيرت سير مي كند تا اينكه متوجه مي شود پير شدن و احتمالا" وزر و وبال جمع كثيري را به گردن گرفتن براي شهريار كه منظورش معرفت الهي و كشف حقايق است عملي دشوار و خارج از خواست و دلخواه اوست"(http://epiran.blogfa.com/8806.aspx)

অর্থাৎ ঃ ১৩০৭ হি: শা: থেকেই কবি আধ্যাত্মিক সাধনার সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। ১৩০৭ থেকে ১৩০৯ হি: শা: তিনি মরহুম ডক্টর সাকফির খানকায় নিয়মিত যাতায়াত করতেন। সেখান থেকে কবি আধ্যাত্মিক জ্ঞান অর্জন করেন ও নিজের জিবনে সে শিক্ষাকে কাজে লাগানোর চেষ্টা অব্যাহত রাখেন। ১৩১০ হি: শা: তে কবি খোরাসানে যান এবং সেখানেও আধ্যাত্মিক জ্ঞানের পূর্ণতার জন্য সাধনা করতে থাকেন। ১৩১৪ হি: শা: তেহরানে ফিরে আসার পর শাহরিয়ার পুরোপুরি দরবেশি হালত ধারন করেন এবং কঠিনভাবে আধ্যাত্মিকতার সাধনা করতে থাকেন। তিনি সিদ্ধান্ত

নিয়েছিলেন যে খেরকা ধারণ করে তার পিরের স্থলাভিষিক্ত হবেন। (শাহরিয়ার[৬৬], ১ম খন্ড, পৃ: ২৩)

কিন্তু এই সাধনা করতে গিয়ে তিনি মানুষিক ভাবে অসুস্থ হয়ে পরেন। ১৩২০ হি: শা:/ ১৯৪১ খ্রি: থেকে কবির জীবনে মানসিক অস্থিরতার অধ্যায় শুরু হয়। মানুষিকভাবে প্রচন্ড হতাশায় ভূগতে থাকেন। ১৩২৬ হি: শা:/ ১৯৪৭ এর পর এই মানষিক অস্থিরতা আরো বৃদ্ধি পায়। কবিকে দেখাশোনার জন্য তার মা তেহরানে চলে আসেন। জীবনের এই পর্যায়ে তার চিন্তা-চেতনার জগতে নতুন দিগন্ত উম্মোচিত হয়। দুনিয়াবী প্রেমের যে জ্বালা-যন্ত্রনায় কবির হৃদয় জর্জরিত ছিল, সেই প্রেমের পরিবর্তে আধ্যাত্মিক প্রেমের আলোতে হৃদয় আলোকিত হয়ে উঠে। অধিকাংশ সময়ে তিনি যিকির-আযকার ও কোরআন তেলোয়াত নিয়ে ব্যাস্ত থাকতেন। এই সময় থেকেই তিনি আধ্যাত্মিক গযল গুলো লিখতে শুরু করেন।

কবির বন্ধু জনাব যাহেদি আরো বলেন :

> ''সেই মূহুর্তগুলোতে তিনি খুব অসংলগ্ন কথাবার্তা বলতেন ও অস্বাভাবিক আচরণ করতেন। যা সবার জন্য বুঝতে সমস্যা হয়ে যেত। অধিকাংশ সময় সেতারা নিয়ে গান বাধতেন। কবিতা লেখা ছেড়ে দিয়েছিলেন। প্রায় সময় দুচোখে পানি থাকত। নিজের কাজে কাউকে সাহায্য করতে দিতেন না। এই সময়ে তিনি প্রায় এই কথাটি আওরাতেন (مرد خدا و مومن حقيقي (باید امتحان بدهد و امتحان من بسیار سخت است অর্থাৎ প্রকৃত মুমিনদেরকে পরিক্ষা দিতে হয়, আমার পরিক্ষা বরই কঠিন। ১৩৩১ হি: শা: তে তিনি মানুষিক অস্থিরতা থেকে মুক্তি পান। এ সময়ে বলতে থাকেন (امتحان من تمام شده است و علم قرآن را یافته ام) অর্থাৎ আমার পরীক্ষা শেষ হয়েছে এবং আমি কোরআনের জ্ঞান অর্জন করেছি।'' (কাভইয়ানপুর[২১], পৃ: ৬৭)

১৩২০ হি: শা:/১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দের পর থেকে শাহরিয়ারের কবিতার বিষয়বস্তুতে ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এই সময়ের আগ পর্যন্ত তিনি জাগতিক প্রেমের কবিতাগুলো লিখেছিলেন, যা ছিল সুরাইয়ার প্রেম বা বিরহ নিয়ে লেখা। এরপর থেকে জাগতিক প্রেমের পরিবর্তে আধ্যাত্মিক প্রেমের প্রতি অন্তরের ঝোঁক অনুভব করতে থাকেন। এই সাধণায় বিশেষভাবে মনোনিবেশ করেন। চিন্তার জগতের এই পরিবর্তন সম্পর্কে শাহরিয়ার বলেন :

> گرچه یاد آن عشق با من بود. اما دیگر آن عشق نبود. چیزي دیگر شده بود، شده بود عشق الهي. شاعر عرفان مي بایست الهام داشته باشد و الهام، تشعشي از نور الهي است، چیزي مثل وحي. اما اهام الهام پائین ترین ترین مرحله ي وحي است. وحي از آن انبیاء و الهام از آن شاعر هنرمند است. من دیگر فکر و تعقل مني کنم، به من الهام مي شود و فکر و تعقل مرا زنده مي کند. (শাহরিয়ার[৬৬], ১ম খন্ড, পৃ:)

অর্থাৎ ঃ যদিও সেই প্রেমের স্মৃতি আমার সাথেই ছিল, কিন্তু একসময়ে সেই প্রেম ছিল না বরং সেটি অন্য কিছুতে পরিণত হয়েছিল আর সেটি ছিল খোদাপ্রেম। একজন আধ্যাত্মিক কবির অবশ্যয়ই এলহাম থাকা প্রয়োজন। এলহাম হলো নুরে এলাহির বিচ্ছুরণ, যা অনেকটা ওহির মত। ওহি আল্লাহর নবীদের উপর হয়ে থাকে আর কবিদের উপর হয়ে থাকে এলহাম । আমি কখনো গভীর চিন্তা করি না বরং আমার উপর যে এলহাম হয় সেটি আমার চিন্তার জগতকে জাগ্রত করে দেয়।

কবির দাবি আনুযায়ী এর পরবর্তী সময়ের কবিতাগুলো তিনি এলহামের ভিত্তিতে লিখতে থাকেন। তার লিখিত মোনাজাত কবিতায় তিনি বলেন :

تو از دريچة دل مي روي و مي آيي
ولي نمي شنود کس صداي پاي تو را

(শাহরিয়ার[৬৬], ১ম খন্ড, পৃ: ৬৭)

উচ্চারণ ঃ

তো আয দারীচেয়ে দেল মী রাভী ভা মী অ'য়ী,

ভালি নেমি শানভাদ কাস সেদায়ে পায়ে তো রা' ॥

অর্থ ঃ

তুমি হৃদয়ের জানালা দিয়ে আসা যাওয়া কর,

কিন্তু কেউ তোমার পায়ের আওয়াজ শুনতে পায় না ॥

ইরানের একজন বিখ্যাত আলেম আয়াতুল্লাহ গার্‌রাশির একটি স্বপ্নের ঘটনা থেকে শাহরিয়ারের এলহামের বিষয় অনুধাবন করা যায়। আয়াতুল্লাহ গার্‌রাশি ১২৮৬ হি: কা: তে নাজাফে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৩৭৯ হি: শা: তে ৯৩ বৎসর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন। তিনি বলেন :

''এক রাতে আল্লাাহর একজন ওলিকে স্বপ্নে দেখলাম এবং তার সাথে স্বপ্নের জগতে ঘুরে বেড়ালাম। মসজিদে কুফায় গিয়ে দেখলাম সেখানে একটি মাহফিল হচ্ছে যে মাহফিলে হযরত আলি (রাঃ) সেই মাহফিলে উপস্থিত আছেন। তিনি বলেলেন : ফারসি কবিদেরকে আমার কাছে নিয়ে আস। তখন মোহতাশেম কাশানি সহ অন্যান্য কবিরা মাহফিলে উপস্থিত হলেন। হযরত আলী রাঃ তখন বলেলে মোহাম্মদ হোসেন শাহরিয়ার কে আমার কাছে নিয়ে আস। শাহরিয়ার আসলেন এবং হযরত আলি (রাঃ) খেদমতে নিম্নোক্ত কবিতাটি পেশ করলেন :

علي اي همای رحمت تو چه آيتي خدا را
که به ما سوا فکندي همه سايه ي هما را
دل اگر خدا شناسي همه در رخ علي بين
به علي شناختم من به خدا قسم خدا را

(শাহরিয়ার[৬৬], ১ম খন্ড, পৃঃ)

উচ্চারণ ঃ

আলী এ্যায় হোমা'য়ে রাহমাত তো চে অ'য়াতি খোদা' রা',

কে বে মা' সাভা' আফকান্দি হামে সা'য়িয়ে হোমা' রা'।

দেল আগার খোদা' শেনা'সি হামে দার রোখে আলী বিন,

পব আলী শেনা'খতাম মান বে খোদা' কাসাম খোদা' রা' ॥

অর্থ ঃ

হে! আলি তুমি সৌভাগ্যময় রহমতের পাখি, তুমি খোদার কি অনুপম নিদর্শন,

তুমি আমাদের জন্য সকল সৌভাগ্যের আলো-ছায়া কে ছড়িয়ে দিয়েছ।

হে হৃদয় যদি খোদাকে চিনতে চাও তবে সবাই আলির মুখের দিকে তাকাও,

খোদার শপথ করে বলছি আমি আলির মাধ্যমেই খোদাকে চিনেছি ॥

আয়াতুল্লাহ গাররাশি বলেন :

kvnwiqv‡ii KweZv cov †kl n‡ZB Awg Ng †_‡K D‡V †Mjvg| †h‡nZ Awg Av‡M †_‡K kvnwiqvi‡K wPbZvg bv, †m‡nZ Abmvix‡'i ck Kijvg Kwe kvnwiqvi †K? Zviv ej‡jv wZwb Zvei‡Ri Awaevmx Ges GLb †mLv‡bB emevm K‡ib| AvqvZjøvn ej‡jb Avgvi c¶ †_‡K Zv‡K †Kv‡g Avmvi Rb¨ 'vIqvZ Ki| K‡qKw'b ci kvnwiqvi †Kv‡g Avm‡j Awg wPb‡Z cvijvg, ¯‡c hv‡K †'‡LwQ GB e¨w³B wZwb| Awg wRÁvmv Kijvg Awj GB †nvgv‡q ingvZ KweZwU K‡e wj‡LQ| ck ï‡b kvnwiqvi AevK n‡q ej‡jb Avcwb GB KweZvi K_v wKfv‡e Rvb‡jb? †jLvi ci GB KweZwU bv Awg KvD‡K w'‡qwQ, bv Kv‡iv mv‡_ KweZwU wb‡q Avjvc K‡iwQ| Gici AvqvZjøvn Mviiwk Zvi Kv‡Q c‡iv NUbwU eYbv Ki‡jb|(*http://www.hosein1389.blogfa.com/cat-21.aspx)*

শাহরিয়ারের প্রেমত্ত্ব :

শাহরিয়ার তার প্রেমকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন। প্রথমটিকে عشق مجازي বা দুনিয়াবী প্রেম এবং দ্বিতীয়টিকে عشق حقيقي বা অধ্যাত্ম প্রেম নামে নামকরণ করেছেন। যেমন তিনি বলছেন :

عشق مجاز غنچه عشق حقيقت است
گل گوشكفته باش اگر بوش مي كني
از من خدايرا غزل عاشقي مخواه
كز پيريم چو طفل قلمدوش مي كني

(শাহরিয়ার[৬৬], ১ম খন্ড, পৃ: ৪২৩)

উচ্চারণ ঃ

এশক্বে মাজা'য গোনচেয়ে এশক্বে হাক্বিক্বাতাস্ত,
গোল গু শেকোফতে বা'শ আগার বূশ মী কোনি।
আয মান খোদ'ায়ী রা' গাযালে আশেক্বি মাখ'াহ,
কায পীরীম চো ত্বেফলে ক্বালামদূশ মী কোনী ॥

অর্থ ঃ

রূপক প্রেম অধ্যাত্ম প্রেমের কলি স্বরুপ,
ঝোপঝাড় করলেও সেখানে যেমন ফুল ফুঁটে থাকে।
আমার কাছ থেকে ঐশ্বরিক প্রেমের গযল শুনতে চেয়ো না,
শিশুদের মত এই বৃদ্ধের কাধে কেন চড়ে বসছ ॥

মাযায শব্দের অর্থ রূপক, তাই এশকে মাযাযি শব্দের অর্থ রূপক প্রেম। সূফিদের মতে পার্থিব জীবন আখেরাতের জীবনের রূপক প্রতিচ্ছবি মাত্র। তাই পার্থিব জগতের জাগতিক প্রেমই রূপক প্রেম। শাহরিয়ারের সাহিত্যকরের্মর বড় একটি অংশ জুড়ে এই রূপক প্রেমের আলোচনা দেখতে পাওয়া যায়। জাগতিক প্রেম তার জীবনে এক জ্বালাময় অধ্যায়ের জন্ম দিয়েছে। এই প্রেমকে তিনি ব্যার্থ, দূর্ভাগ্যময় ও জ্বালাময় বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলছেন :

ندار عشقم و با دل سر قمارم نيست
كه تاب و طاقت آن مستي و خمارم نيست
دگر قمار محبت نمي برد دل من
كه دست بردي از اين بخت بدبيارم نيست

(শাহরিয়ার[৬৬], ১ম খন্ড, পৃ: ১২৮)

উচ্চারণ ঃ

নাদা'রে এশক্বাম ভা বা' দেল সারে ক্বোমা'রাম নিস্ত,
কে তা'বো ত্বা'কাতে অ'ন মাস্তি ভা খোমা'রাম নিস্ত।
দেগার ক্বোমা'রে মোহাব্বাত নেমী বোরদ দেলে মান,
কে দাস্ত বোরদী আয ঈন বাখ্ত বাদ বিয়া'রাম নিস্ত ॥

অর্থ ঃ

আমার প্রেম ব্যর্থ এবং আমার হৃদয়ের ভাগ্যে তা নেই,
প্রেমের জ্বালা যন্ত্রণা ও এর মাদকতা সহ্য করার ক্ষমতা আমার নেই।

অন্য কোন প্রেম আর আমার হৃদয় সহ্য করবে না,
এই দূর্ভাগ্যকে বয়ে নিয়ে বেড়াবার ক্ষমতা আমার নেই ॥

حق শব্দ থেকেই حقیقی শব্দের উৎপত্তি এর আর্থ সত্যময়। চিরন্তন সত্যের প্রতি যে প্রেম সে প্রেমকেই এশক্বে হাক্বিক্বি বা অধ্যাত্ম প্রেম বলা হয়। শাহরিয়ারের মতে এই প্রেম ইন্দ্রিয়াতীত আধ্যাত্মিক জগতের পরম সৌন্দর্যের কাছে মানুষকে পৌঁছে দেয়। জীবনের আসল কাজ হলো ক্রমান্বয়ে এগিয়ে যাওয়া, অপূর্ণতা থেকে পূর্ণতায় উন্নীত হওয়া। অধ্যাত্ম প্রেম জীবনকে ক্ষুদ্রতা, তুচ্ছতা ও সকল সংকীর্ণতার উর্ধ্বে ওঠাতে সক্ষম। এই প্রেমের আবেগে পরম সৌন্দর্যের সন্ধান পাওয়া যায়। তাতে পরম সৌন্দর্যের সাথে এক মহামিলন ঘটে। সমগ্র সৃষ্টির মধ্য দিয়ে অনন্ত গতিতে প্রবাহিত যে মহাপ্রেরণা ছুটে চলছে পরম উৎসের পানে, এ প্রেররণারই অন্য নাম অধ্যাত্ম প্রেম। অধ্যাত্ম প্রেমের অর্থ যে বুঝে সে সৃষ্টির নিগূঢ় তত্ত্ব বুঝে তার আধ্যত্মিক দৃষ্টির সামনে প্রকৃত তত্ত্ব উন্মোচিত হয়। সত্যের পরিচয় লাভের জন্য এক উপলব্ধি শক্তির সৃষ্টি করে এবং এ শক্তি মানুষকে সহত্ত্ব, মানবত্ত্ব প্রভৃতি গুণে গুণান্বিত করে। আর আধ্যাত্মিক প্রেম শাহরিয়ারকে নতুন করে বেচে থাকার অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। এশ্‌কে এলাহি বা খোদা প্রেমের মাঝে তিনি নতুন জীবনের সন্ধান পেয়েছেন। তিনি বলেন :

به مرگ چاره نجستم که در جهان مانم
به عشق زنده شدم تا که جاودان مانم
چو مردم از تن و جان وا رهاندم از زندان
به عشق زنده شوم جاودان به جان مانم
به مرگ زنده شدن هم حکایتي است عجیب
اگر غلط نکنم خود به جاودان مانم

(শাহরিয়ার[৬৬], ১ম খন্ড, পৃ: ৩১৩)

উচ্চারণ ঃ

বে মারগ চা'রে নাজুস্তা'ম কে দার জাহা'ন মা'নাম,
বে এশ্‌ক্ব যেন্দে শোদাম তা' কে জা'ভেদা'ন মা'নাম।
চো মোরদাম আয তান ও জা'ন ভা রেহা'ন্দাম আয যেন্দা'ন,
বে এশ্‌ক্ব যেন্দে শাভাম জা'ভেদা'ন বে জা'নে মা'নাম।
বে মারগ যেন্দে শোদান হেকা'ইয়া'তিস্ত আজাব,
আগার গালাত নাকোনাম খোদ বে জা'ভেদা'ন মা'নাম ॥

অর্থ ঃ

মৃত্যুর মাঝে উপায় খুঁজিনি কারণ এই জগতেই থেকে যাব,
প্রেমের দ্বারাই জীবিত হয়েছি তাই অবিণশ্বর হয়ে থাকব।
যদি মরে যেতাম দেহ আর প্রাণের এই জেলখানা থেকে মুক্তি পেতাম,
আমি প্রেমের মাধ্যমে জীবিত হবো আর অমর প্রাণ হয়ে থাকব।
মৃত থেকে জীবিত হওযার গল্পটি বড় অদ্ভুত,

Dhaka University Institutional Repository

যদি ভুল না করি তাহলে অমর হয়ে থাকব ॥

শাহরিয়ার অধ্যাত্ম প্রেমের তিনটি স্তর নির্দিষ্ট করেছেন-১. স্বাভাবিক প্রেম তথা মানবীয় প্রেম ২. আধ্যাত্মিক প্রেম. ৩. ঐশী প্রেম ।

মানবীয় প্রেম, সার্বজনিন প্রেম। এই প্রেমই বিশ্বতাত্ত্বিক নীতি বা সবকিছুর পরিচালনা শক্তি। এ প্রেম সকল বস্তু ও সত্ত্বাকে পরম সৌন্দর্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। এই ক্ষেত্রে শাহরিয়ারের সাথে প্লেটোর দর্শনের কিছু মিল পাওয়া যায়। তাঁর প্রেম-দর্শন নতুন কিছু নয়। প্লেটোর মতে, পরম সত্তা অতীন্দ্রিয় জগতের সত্তা, ধারণার উৎস-পরম ধারণা এবং "এরস' বা প্রেম বিশ্বের মূলনীতি। একত্রীকরণ, মিলন, সাদৃশ্যকরণ, উন্নতি সাধন, পুনরুৎপাদন ইত্যাদি প্রেমের বিভিন্ন প্রকাশ বলে প্লেটো উল্লেখ করেন এবং ইবনে সিনা এগুলোর ব্যাখ্যা প্রদান করেন (সরকার[৭৩], পৃ:২৯৩)।

এরপর ইবনে রুশদ তাঁর প্রেম-দর্শনে সার্বজনীন ধর্মের কথা বলেন। তিনি বলেন, সকল ধর্ম একই মহাসত্যের বহিঃপ্রকাশ মাত্র। তিনি ধর্মের দুটি দিক নির্দিষ্ট করেন- অভ্যন্তরীণ সত্য বা প্রেমময় দিক ও বাহ্যিকরূপ। প্রেমের অভ্যন্তরীণ দিক হলো ধর্মের প্রাণ, আর বাহ্যিকরূপ হলো তার দেহ। প্রেমের অভাবে ধর্মের বাহ্যরূপ আচার-অনুষ্ঠানে পরিনত হয়। বৈচিত্রময় বিশ্বে সৃষ্ট সবকিছুই স্রষ্টার নিদর্শন। বিশ্বে যে মহাশক্তির স্পন্দন অনুভূত হয় তার প্রতি প্রেমাকর্ষণই চরম ধর্ম; আর এটাই সার্বজনীন ধর্ম, এটাই মহীয়ান ও গরীয়ান ধর্ম। মানুষের অন্তরে যিনি বিরাজ করেন, যাঁর চেতনায় মানবাত্মা সতত সচেতন থাকে তাঁকে সন্ধান করার জন্য মন্দির, মসজিদ বা গীর্জার প্রয়োজন নেই। অন্তরের ধনকে অন্তরের প্রেমাকর্ষণ দ্বারা সন্ধান করা প্রয়োজন (হাযারী[৭৫], পৃ:৩৭) ।

এরপর ইবনুল আরাবি প্রেমতত্ত্বের যে দার্শনিক ব্যাখ্যা প্রদান করেন তা ইবনে রুশদ, প্লেটো, স্পিনোজা, বার্গস ও ইবনে সিনার মূল বক্তব্যের অনুরূপ।

এই উপমহাদেশের মরমী সাধকদের মধ্যে লালনের প্রেম দর্শনের সাথে শাহরিয়ারের প্রেম দর্শনের কিছুটা মিল পাওয়া যায়। লালনের মরমী দর্শনের মূল কথা প্রেম। তাঁর মতে, প্রেম সংজ্ঞাতীত ও বর্ণতাতীত। রুমী ও অন্যান্য দার্শনিকগণের মতোই তিনি বলেন যে, প্রেমই সারবস্তু , প্রেম-পদার্থ সাধনার চূড়ান্ত লক্ষ্য, আত্মিক বিবর্তনের চরম পরিণতি, মানবত্মার সকল ব্যধির মহৌষধ, বিশ্বের সকল কিছুর মূল সত্তা, সকল জ্ঞান-বিজ্ঞান সাধনার প্রেরণা, মরমী চিত্তের পরম অভিজ্ঞতা, পরমাত্মার জ্ঞান লাভের সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় এবং আত্মার অমরতা লাভের পরশ পাথর। তিনি এই ক্ষেত্রে আপ্ত তত্ত্বের কথা বলেন। অর্থাৎ আত্ম পরিচয় জানার মাধ্যমে পরমাত্মা বা স্রষ্টার সন্ধান লাভ করা সম্ভব। তিনি বলেন :

আপ্ততত্ত্ব যে জেনেছে
দিব্য জ্ঞানী সে-ই হয়েছে
কু বৃক্ষে সুফল পেয়েছে
আমার মনের ঘোর গেল না ॥
(শাহ[৬৪], পৃ: ৮৭)

শাহরিয়ারের মতে আত্ম পরিচয় উদঘাটনের মাধ্যমে আল্লাহর পরিচয় উদঘাটন করা সম্ভব। রাসুলে পাক (সাঃ) এর বাণী من عرف نفسه فقد عرف نفسه যে তার নিজেকে চিনেছে সে তার প্রভুকে চিনেছে, সক্রেটিসের know thyself বা নিজেকে জান এবং ফরিদুদ্দিন আত্তারের সি মোরগ তত্ত্ব একই দর্শনের বাহক। শাহরিয়ার বলেন :

دل شکستة من گفت شهریارا بس
که من به خانة خود یافتم خداي تو را

(শাহরিয়ার[৬৬], ১ম খন্ড, পৃ: ৬৮)

উচ্চারণ ঃ

দেলে শেকাস্তেয়ে মান গোফ্ত শাহরিয়া'রা' বাস,
কে মান বে খা'নিয়ে খূদ ইয়া'ফতাম খোদা'য়ে তো রা' ॥

অর্থ ঃ

আমার ভগ্ন হৃদয় বলেছে হে শাহরিয়ার, এটাই যথেষ্ট,
যে আমি নিজ আপন গৃহেই তোমার প্রভুকে পেয়েছি ॥

আধ্যাত্মিক দ্বিতীয় পর্যায়ে আল্লাহর প্রতি বান্দার সন্তুষ্টি প্রকাশ পায় ও ভালবাসা তৈরী হয়। দুনিয়ার সকল কাজ-কর্ম আল্লাহর প্রতি ভালবাসা দৃঢ় করার উপলক্ষ মাত্র। আল্লাহর ভালবাসা অর্জনই মানুষের সর্বোচ্চ মর্যাদার সম্বল। যদিও এক শ্রেণীর আলেম আল্লাহর প্রতি মোহাব্বত অসম্ভব বলেছেন। তাদের ধারণা মানুষ যেহেতু জড় দেহি সুতরাং সে জড় পদার্থকেই ভালবাসতে পারে। তবে তাদের এই মত গ্রহনিয় নয় কারন আল্লাহ নিজেই বলেঝেন যারা ঈমান দার তারাই আমাকে বেশী ভালবাসে। এই পর্যায়ে বান্দাহ এবাদত বন্দেগীর মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জনে চেষ্টায় ব্রত হয়।

অধ্যাত্ম প্রেমের সর্বোচ্চ রূপ হলো ঐশী প্রেম। শাহরিয়ারের মতে ঐশী প্রেমই পরম সত্তার প্রেম বা আল্লাহর প্রেম। এ প্রেমই সবকিছুর উৎস-সৃষ্টির মূল। পরম সত্তা নিঃসঙ্গ অবস্থায় নিজেকে নিজে ভালবাসেন । ফলে নিজেকে প্রকাশ করার বাসনা জাগে। তাই সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করেছেন। প্রেমই ও প্রেমাস্পদ তথা মানবত্মা ও পরমাত্মার মিলন ঘটায়। প্রেমক তখন বুঝতে পারে সবকিছু মিলে এক এবং সবকিছুর মূলেও এক। আর তিনিই পরমাত্মা, পরম সত্তা বা আল্লাহ নামে অভিহিত। প্রেমিক যখন কোন বিশেষ আকারকে ভালোবাসে তখন সে আকারের মধ্যেই আল্লাহর প্রকাশ দেখতে পায়। শাহরিয়ার বলছেন :

به زلف گو ازل تا ابد کشاکش تست
نه ابتداي تو را دیدم نه انتهاي تو را

(শাহরিয়ার[৬৬], ১ম খন্ড, পৃ: ৬৭)

উচ্চারণ ঃ

বে যোলফ গু আযল তা' আবাদ কাশা'কাশে তোস্ত,
না এবতেদা'য়ে তু রা' দিদাম না এন্তেহা'য়ে তো রা' ॥

অর্থ ঃ

জালাল উদ্দিন রুমিও তাঁর মসনাভি কাব্যের মাধ্যমে প্রেমতত্ত্ব তুলে ধরেন। মসনভির মর্মকথা প্রেম আর বিরহ তথা মানবাত্মা ও পরমাত্মার শ্বাশত ঐক্য। রুমির মতে প্রেম সকল ব্যধির মহৌষধ। প্রেম মনকে মলিনতা ও পাপসক্তি হতে মুক্ত করে নির্মল, পবিত্র ও উন্নত করে। প্রেমের বলেই মাটির দেহ আকাশে উন্নীত হয়েছিল । প্রেমের স্পর্শে পর্বত সচল হয়েছিল। প্রেম তুর পর্বতে প্রেমোন্মত্ততা এনেছিল এবং মুসা মুর্ছিত হয়ে পড়েছিল। রুমি বলেন যে, তাঁর সত্তার ওপর-নিচ সব দিক প্রভুর সত্তার মধ্যে লুকিয়ে আছে। সে গোপন রহস্য প্রকাশ করলে সমগ্র বিশ্ব ওলট-পালট হয়ে যাবে। ডঃ খলিফা আব্দুল হাকিম বলেছেন যে, মসনাভিতে বর্ণিত প্রেম সকল যৌক্তিক বিশ্লেষণ ও বর্ণনার উর্ধ্বে এবং এ প্রেম জীবনের এক গোপন রহস্য । রুমির প্রেমতত্ত্ব প্লেটো ও ইবনে সিনার মতবাদের অনুরূপ। তাঁর মতে বুদ্ধি বা প্রজ্ঞা কার্যের ভালো-মন্দ, লাভ-ক্ষতি, ইত্যাদি বিচার করে দেখে । কিন্তু প্রেমের ক্ষেত্রে এসব হিসাব-নিকাশ নেই। প্রেমিক কোন প্রকার বাছ-বিচার ছাড়াই প্রেমাস্পদের কাছে আত্মসমর্পণ করে। শাহরিয়ারের মতে ঐশি প্রেমের প্রথম সোপান হলো মানবীয় প্রেম। সৃষ্টির প্রতি যার প্রেম না থাকে সে কখনো খোদার প্রেমিক হতে পারে না। পরমাত্মার প্রেমিক হতে হলে প্রথমে তার অস্তিত্বকে অনুভব করতে হবে। পুরো সৃষ্টি জগতের মধ্যে পরমাত্মার অস্তিত্বকে অনুভব করেছেন এবং সেখানে থেকেই পরমাত্মার পরিচয় উদঘাটন করার চেষ্টা করেছেন। তিনি বলছেন :

افق چشم و سیه مشق شبان یلداست
همه چون زلف تو در نقش چلیپا گشتن
جلوه اي کن سخن با تو کنم چون موسي
سینه ام سوخته در حسرت سینا گشتن

(শাহরিয়ার[৬৬], ১ম খন্ড, পৃ: ৭১)

উচ্চারণ ঃ

উফক্বে চাশম ভা সিয়ে মেশক্বে শাবা'নে ইয়ালদা'স্ত,
হামে চোন যোলফে তো দার নাক্বশে চালিপা' গাশ্তান।
জালভা কোন কে সোখান বা' তো কোনাম চূন মূসা,
সীনে আম সূখ্তে দার হাসরাতে সীনা' গাশতান ॥

অর্থ ঃ

চোখ সম্মুখে এই দিগন্ত আর দীর্ঘ রাতের কালো অন্ধকার,
এ সবি ক্রুশের চিত্রে অবস্থিত তোমার চুলের বেণী।
প্রকাশিত হও তোমার সাথে মূসার মত কথা বলব,
তুর পাহারের আফসোসে আমার হৃদয় পুড়েছে।

পুরো ফারসি সাহিত্য জুড়েই পার্থিব প্রেম ও অপার্থিব প্রেমের তূলনামূলক আলোচনা দেখতে পাওয়া যায়। কুরআন, হাদিস ও মরমী সাধকদের এ ভাবধারা থেকেই আল্লাহ ও রাসুলের প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে আসহাবে সুফফার সদস্যগণ প্রায় সংসার ত্যাগী হয়ে মসজিদে নবিন বারান্দায় পড়ে থাকতেন। কিন্তু তাঁদের সে প্রেম দার্শনিক পর্যালোচনার মাধ্যমে সূত্রাবদ্ধ রূপ লাভ করেনি। তাঁদের অনেক পরে সুফি সাধক মনসুর হাল্লায ও বায়যিদ বোস্তামি, প্রেমতত্ত্ব বিষয়ে আলোচনার সুত্রপাত ঘটান যা পরবর্তিতে দার্শনিকদের উপজীব্য হয়। হাল্লায আল্লাহকে পরম প্রেম এবং বিশ্বকে প্রেমনীতির বহিঃপ্রকাশ বলে মনে করতেন। তিনি বলেন যে, প্রেমই পরম বস্তু, পরম ধন ও সাধকের পরম কাম্য ।

রুমির দৃষ্টিতে পার্থিব প্রেম তরিকতের দৃষ্টিতে অপ্রয়োজনীয় নয়। পার্থিব প্রেমকে এক বিশেষ পন্থায় এশক্বে এলাহি বা ঐশী প্রেম রাপান্তরিত করা হলে তা তরিকত পন্থীকে আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছে দেয় । রুমি বলেন :

عاشقي گر زين سر و گر زان سر است
عاقبت ما را بدان سر رهبر است

(মাওলাভি[৪৯], পৃ: ১০)

উচ্চারণ ঃ

আশেক্বী গার যেইন সার ভা গার যা'ন সারাস্ত,
আ'ক্বেবাত মা' রা' বেদা'ন সার রাহবারাস্ত।

অর্থঃ

আশেকের প্রেম জাগতিক বস্তুর জন্য হোক আর আল্লাহর জন্য হোক,
পরিণামে তা আমাদেরকে রাহবারের মাধ্যমে আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছে দেবে ॥

সাধক কবি নিযামি তার লাইলি-মজনু কাব্য গ্রন্থে একই ভাবধারা প্রকাশ করেন। মজনু-লাইলির প্রেমে উন্মত্ত হয়ে পড়েছিল কিন্তু তাকে পাবার সকল আশা যখন নিরাশায় পর্যবসিত হলো তখন মজনু চিনদিনের জন্য মানব-সমাজের সংশ্রব ত্যাগ করেছিল, লাইলির বিরহ-বেদনায় মজনু নিজেকে অন্তরে সংবদ্ধ করে অন্তর্দৃষ্টিতে জগতকে লাইলিময় দেখতে লাগলো এবং লাইলির ভেতর দিয়ে সে অনন্ত সৌন্দর্যময় রূপের ঝলক নীরীক্ষণ করতে করতে তার বাহ্য দৃষ্টি সুপ্ত হয়ে পড়লো। অনেক ক্লেশ সয়ে লাইলি মজনুর কাছে গিয়ে উদ্বেলিত অশ্রুধারায় তাকে নিষিক্ত করেছে, কিন্তু মজনু তার অন্তরলব্ধ চিন্ময়ের রূপের ধ্যানে মগ্ন। একবার চোখ খুলে লাইলির দিকে তাকায় নি (কাইউম১৮, পৃ: ১৭০-৭১)।

শাহরিয়ারও জাগতিক প্রেমের মাধ্যমেই আধ্যাত্মিক প্রেমের সন্ধান পেয়েছেন। তার মতে জাগতিক প্রেম তার জীবনে না আসলে আল্লাহ প্রেমিক তিনি হতে পারতেন না। তিনি বলছেন :

عشق اگر عمر نه پيوست به زلف ساقي
غالب آنست كه خوابي و خيالي كرديم
شهريار غزلم خوانده غزالي وحشي
بد نشد با غزلي صيد غزالي كرديم

(শাহরিয়ার[৬৬], ১ম খন্ড, পৃ: ৩২৫)

Dhaka University Institutional Repository

উচ্চারণ ঃ

এশক্ব আগার উমর না পেইভাস্ত বে যোল্‌ফে সা'কী,
গা'লেব অ'নাস্ত কে খা'বি ভা খেয়া'লী কারদীম।
শাহরিয়া'র গাযালাম খা'ন্দে গাযা'লিয়ে ভহশী,
বাদ নাশুদ বা' গাযালি সেইদে গাযা'লি কারদীম ॥

অর্থ ঃ

এ জীবনে যদি সাকির[i] জুলফির[ii] প্রতি প্রেম না জন্মাতো,
তাহলে জীবনে পুরোটাই স্বপ্ন আর কল্পনার মধ্যে ডুবে থাকত।
ওহে শাহরিয়ার বন্য হরিণেরা আমার গযল পড়েছে,
খারাপ হয়নি যে এই গযল দিয়েই আমি হরিণ শিকার করেছি ॥

এতদসত্ত্বেও পার্থিব প্রেম বিপজ্জনক। কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে পার্থিব প্রেম রিপুর প্রবনতা প্রবল থাকে। সেক্ষেত্রে পার্থিব প্রেম মানুষকে শরিয়তের সীমালঙ্ঘন করতে প্রলুব্ধ করে এবং তাতে মানুষ ধ্বংস হয়ে যায়। এমন পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য সিদ্ধ গুরু বা কামেল পিরের প্রয়োজন যিনি স্বীয় শিষ্য বা মুরিদকে প্রেমের পবিত্রতা এবং মুরাকাবা পদ্ধতি শিক্ষা দিয়ে পার্থিব প্রেমের মোড় ঘুরিয়ে ঐশী প্রেমে রূপান্তরিত করেন। অনেকে মনে করেন ঐশী প্রেমের পূর্বশর্ত হলো পার্থিব প্রেম। তারা বলেন, যে মূর্তকে প্রেম পারে না তার অমূর্তে প্রেম বাতুলতা মাত্র। রূপের মাধ্যমে স্বরূপে পৌঁছা যতটা সহজ, সরাসরি স্বরূপে পৌঁছা ততটা সহজ নয় বরং হোঁচন খাবার আশঙ্কা অনেক বেশি। কাজেই পার্থিব প্রেম সঠিক পথে পরিচালিত হলে তা ঐশী প্রেমে রুপান্তরিত হয়। শেক্সপিয়র কী সুন্দরভাবে বলেছেন :

আমার এ প্রেম যেন শুধু প্রতিমার উপসনা না হয়,
আমার প্রেমিকা যেন শুধু সাজানো পুতুল না হয়।
আমার সমস্ত গান যে প্রেমের দিব্য মূর্ছনা,
শুধু তার যশ গেয়ে যাই যার কোন সমতুল্য পাই ॥
(রুদ্র[৬০], পৃঃ ৫৪৭)

পার্থিব প্রেম থেকে ঐশী প্রেমে উত্তরণের প্রক্রিয়া হিসাবে তরিকতে চারটি স্তর সাব্যস্ত করা হয়েছে। (চিশতি[২৮], পৃ:১১৩) এ স্তরগুলো হলো- তুহেব্বুশ শায়েখ, তুহেব্বুর রাসুল, তুহেব্বুল্লাহ ও বাকাবিল্লাহ অথবা ফানাফিশ শায়েখ, ফানাফির রাসুল, ফানা ফিল্লাহ ও বাকা বিল্লাহ। প্রথমে স্বীয় পির বা মুর্শিদের প্রেমে নিজেকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। পির সে প্রেমকে রাসুল প্রেমে রূপান্তরিত করে মুরিদের প্রেমকে আরো গভীরতর করে দেবেন। তারপর সে প্রেম আরো গভীরতম রূপ ধারণ করে ঐশী প্রেম রূপান্তরিত হয়ে এক স্বর্গীয় অনুভূতির সৃষ্টি করে। এ অনুভূতি স্থায়ীত্ব লাভ করলে তাকে বাকা (one with Allah)

---

[i] মদশালায় যিনি মদ বিতরণ করেন তাকে সাকী বলা হয়। ফারসি আধ্যাত্মিক সাহিত্যে শব্দটি মোর্শেদ বা আধ্যাত্মিক গুর"র এস্ড়েয়ারা হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। হাফিজের কবিতায় এর বিশেষ ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

[ii] অলক বা চুলের ছোট ছোট কু ঞ্চন য া সামনের দিকে ঝুলে থাকে।

প্রাকৃতিক বৈচিত্রের মাঝে বিভিন্ন ধরণের যে সব প্রকাশ পরিলক্ষিত হয় তা পরম সত্তারই প্রেম-প্রকাশের প্রতীক।

আল্লাহকে ভালবাসা তথা প্রেম করার নির্দেশ পবিত্র কুরআনেও রয়েছে। আল্লাহ বলেন, "বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস তবে আমাকে অনুসরণ কর, আল্লাহ্ তোমাদেরও ভালোবাসবেন"(৩ঃ৩১)। পবিত্র কুরআনে বেশ ক'টি আয়াতে বলা হয়েছে যে, রাসুল(সঃ) তাঁর মিশন পরিচালনার জন্য কারো কাছে কোন পারিশ্রমিক চান না তবে তাঁর কার্যক্রমের বিনিময়ে মানুষ যেন তাঁকে ও তাঁর আহ্লুল বাইতকে ভালোবাসে (৬ঃ৯০,১১ঃ২৯, ১১ঃ৫১, ১২ঃ১০৪, ২৩ঃ৭২, ২৫ঃ৫৭)। তদুপরি আল্লাহ ও রাসুলের আনুগত্য করার জন্য বহু আয়াতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে (৪ঃ১৪, ৪ঃ৪২, ৪ঃ৫৯, ৪ঃ৬৯, ৯ঃ৭১, ২৪ঃ৫৪, ২৪ঃ৫৬, ২৪ঃ৬৩)। এসব ক্ষেত্রে আনুগত্য মানেই গভীর ভালোবাসা। ভালোবাসার প্রবল উচ্ছাস হলো প্রেম, যেমন করে ঢেউ এর প্রবলতাকে জলোচ্ছ্বাস বলা হয়।

শাহরিয়ারের প্রেম দর্শনের গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো হুব্বে রাসুল বা রাসুলে পাক (সাঃ) এর ভালোবাসা। রাসুলে পাক (সাঃ) বলোছেন ' তোমরা ততক্ষন পর্যন্ত ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষন পর্যন্ত আমি মোহাম্মদ (সাঃ) তোমাদের কাছে, তোমাদের পিতা, মাতা, ভাই, বোন ও দুনিয়ার সমস্থ মানুষের চাইতে প্রিয় না হবো। তিনি আরো বলেছেন " যে আমাকে ভালোবাসলো সে আল্লাহকে ভালবাসলো।

যেহেতু রাসুলের প্রতি ভালবাসাকে আল্লাহ তাঁর প্রতি ভালোবাসারে মাপকাঠি হিসাবে ঘোষণা করেছেন সেহেতু রাসুল-প্রেমই আল্লাহ প্রাপ্তির পূর্বশর্ত। যার ভেতর রাসুলের প্রতি ভালোবাসা নেই সে মোমিন হতে পারে না। অনেকেই বাহ্যিক কতিপয় সুন্নাত পালন করাকে রাসূল প্রেম মনে করে আত্মতৃপ্তির ঢেকুর ছাড়েন। এ রকম সুন্নাত পালনে রাসুলের সময়কার মুনাফিকরাও পিছিয়ে ছিল না। তারপরও তারা মুনাফিক আখ্যা লাভ করেছে। এতে বুঝা যায় যে, শুধু বাহ্যিক সুন্নাত পালন রাসুল-প্রেম নয় । বহ্যিক সুন্নাহর সাথে আন্তরিক ও আত্মিক সম্পর্ক থাকতে হবে এবং এ আত্মিক সম্পর্কের ফলে প্রেমিকের দৃষ্টিতে শুধু প্রেমাস্পদই বিরাজ করে। ইমাম আবু হানিফা বলেন :

বিকা লি কুলায়বুন মুগরামুন ইয়া সায়্যিদি ওয়া হুশাশাতুন মাহশুওয়াতুন বি হাওয়াকা।
ফা-ইজা সাকাতুত ফাফিকা সামতি কুলুহু ওয়া ইজা নাত্কতু ফা-মাদিহান উলইয়াকা।
ওয়া ইজা সামিতু ফাআনকা কাওলান তাইয়্যিবান ওয়া ইজা নাজার্তু ফামা আরা ইল্লাকা।

অর্থঃ হে আমার সরদার! আমার হৃদয় শুধু আপনার প্রতিই আসক্ত; আমার প্রাণ শুধু আপনার ভালোবাসায় পরিপূর্ণ। যখন আমি চুপ থাকি, তখন শুধু আপনাকেই চিন্তা করি; যখন আমি কথা বলি, তখন আপনারই প্রশংসা করি। যখন আমি কিছু শুনি তখন আপনারই উত্তম বাণী শুনি, যখন আমি কিছু দেখি, তখন শুধু আপনাকেই দেখি।

একইভাবে ইকবাল বলেন :

বে মোসতাফ বেরেস'ন খীশ কে দীন হাম'নাস্ত আগার বে উ নারেসীদী তামাসীব'লাহাবী আস্ত
হারকে এশ্ক্বে মোস্তাফ' সাম' নে উস্ত বাহ্রো দার গোশ'য়ে দাম'নে উস্ত ॥

অর্থঃ মোস্তফার পাক চরণে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সঁপে দাও, তা না হলো তুমি আবু লাহাব হয়ে যাবে। মোস্তফার প্রেম যাদের পথের পাথেয় হয়েছে, স্থলভাগ ও জলভাগ তাদের হাতের মুঠোয় ধরা দিয়েছে(চৌধুরী[২৯], পৃ: ১৯৭-২০০, ২৭৭-২৭৮)।

শাহরিয়ার এই বিশ্বজগতের সৃষ্টি, লয়, গতিময়তার পেছনে কারণ হিসেবে মোহাম্মদ (সঃ) প্রেম কে জেনেছেন। তার মতে নূরে মোহাম্মদ (সাঃ) না থাকলে পাখিও তার পাখা নাড়াতে পারত না। তিনি বলছেন :

ستون عرش خدا قائم از قيام محمد
ببين كه سر به كجا مي كشد مقام محمد
به جز فرشتة عرش آشيان وحي الهي
پرنده پر نتواند زدن به بام محمد

(শাহরিয়ার[৬৬], ১ম খন্ড, পৃ: ৬৮)

উচ্চারণ ঃ

সোতূনে আরশে খোদা কা'য়েম আয কিয়া'মে মোহাম্মদ,
বেবীন কে সার বে কুজা মী কূশাদ মাকা'মে মোহাম্মদ।
বে জুয ফেরেশতেয়ে আরশে অ'শিয়া'নে ওহিয়ে এলা'হি,
পারান্দে পার নাতাভা'ন্দ যাদান বে বা'মে মোহাম্মাদ ॥

অর্থ ঃ

মোহাম্মদ (সাঃ) এর স্থিতির দ্বারা আল্লাহর আরশের খুঁটি দাড়িয়ে আছে,

চেয়ে দেখ মোহাম্মদের মর্যাদা কোথা থেকে কোথায় মাথা তুলে দাড়িয়েছে ॥

রাসুলকে ভালবাসার জন্য তার আত্মীয় স্বজন বা আহলে বেইতের প্রতি মহব্বত আহলে বেইতের প্রতি থাকা প্রতিটি উম্মতে মোহাম্মাদীর জন্য অবশ্য কর্তব্য। রাসুলে পাক (সাঃ) ইরশাদ করেন الله في اهل بيتي আর্থাৎ আমার পরিবার পরিজন সম্পর্কে আল্লাহকে ভয় কর এবং তাদের হকসমূহ আদায় কর। (রেফায়ী[৬১], পৃ: ৩৫)

শাহরিয়ারের মতে : আল্লাহ পাক যার মঙ্গনল চান, তাকেই আহলে বাইতের ব্যাপারে রাসূলে পাক (সাঃ) এর ওসিয়ত পালনের তাওফীক দিয়ে থাকেন। সে-ই তাদের প্রতি ভালবাসা এবং শ্রদ্ধাশীল হয়, তাদেরকে উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করে, তাদের প্রতি সাহায্য সহানুভূতি দেখায়, তাদের বড়ত্বের গুরুত্ব উপলব্ধি করে, তাদের সম্মান রক্ষায় ব্রতী হয়, তাদের প্রতি উদার হয় এবং সাহাবাদের জন্য রাসূলে পাক (সাঃ) এর যে হক উম্মতে মোহাম্মাদির উপরে রয়েছে তা যথাযথ আদায় করে। শাহরিয়ারের মতে আহলে বেইতের সদস্যদের আদেশ নিষেধ কোরআনের আদেশ নিষেধের সমপর্যায়ের। তিনি বলেন :

توسل چارده معصوم را كن

كه قرآن خواندشان سبع المثاني

(শাহরিয়ার[৬৬], ১ম খন্ড, পৃ: ৪১৭)

উচ্চারণ ঃ

তাভাস্‌সোলে চা'রদাহে মা-সুম রা' কোন,

কে কোরঅ'ন খা'ন্দে শা'ন সাবউল মাসা'নী ॥

অর্থ ঃ

নিষ্পাপ চৌদ্দ ইমামের শরণাপন্ন হও,

কারণ তাদের কথাই সাবউল মাসানি কোরআন ॥

আহলে বেইতের প্রতি ভালবাসা ও শ্রদ্ধা নিবেদনের মাধ্যমে বিশেষ করে আলী (রাঃ) মাধমেই আল্লাহকে পাওয়া সম্ভব। তিনি বলছেন :

دل اگر خدا شناسي همه در رخ علي بين
به علي شناختم من به خدا قسم خدا را

(শাহরিয়ার[৬৬], ১ম খন্ড, পৃ: ৬৯)

উচ্চারণ ঃ

দেল আগার খোদা' শেনা'সী হামে দার রুখে আলী বীন,
বে আলী শেনা'খতাম মান বে খোদা' ক্বাসাম খোদা' রা' ॥

অর্থ ঃ

হে হৃদয় যদি খোদা কে চিনতে চাও তাহলে সবাই আলীর মুখের দিকে তাঁকাও
খোদার শপথ করে বলছি আলীর মাধ্যমেই আমি খোদা কে চিনেছি

কারো কারো মতে জ্ঞান প্রেমর পূর্ব শর্ত। অজ্ঞানীর প্রেম সঠিক পথে চালিত নাও হতে পারে। জ্ঞানীর প্রেম পথ পরিক্রমার স্তরসমূহ সঠিকভাবে অতিক্রম করে যেতে পারে। এটা সাধারণবাবেই বলা হয়ে থাকে যে, অবুঝের প্রেম পাগলামি মাত্র। প্রেমিক হতে হলে জ্ঞানী হতে হয়। জ্ঞানীর প্রেমের গভীরতা প্রগাঢ়। স্রষ্টা ও সৃষ্টি সম্পর্কে কোন চিন্তাশীল ধারণা না থাকলে প্রেমের উদ্দীপনা জন্মায় না। তাই তো লালন বলেন 'না জেনে লালন প্রেমের উদ্দীপন/পিরীত করে মিছে'। জ্ঞানীর প্রেম তার আত্মাকে শক্তিশালী করে ক্রমাগত উর্ধ্ব দিকে নিয়ে যায় এবং পরিশেষে প্রেমাস্পদের সাথে মিলন ঘটায়। এ জন্যই খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতি বলেছেন, প্রেম হুমা পাখীর মতো সর্বোচ্চ শিখরে অবস্থান করে এবং মজ্জুব (অর্থাৎ যারা ঐশী প্রেমে আত্মহারা) মজলিশ মহামিলনের মহানন্দে ভরপুর থাকে। আর দিওয়ান-ই-শামস তাব্রিজে বলা হয়েছে। প্রেম হচ্ছে আকাশ অভিমূখে উড্ডীয়মান হওয়া, প্রতি মুহুর্তে শত যবনিকা ছিন্ন করা । প্রথম

মূহুর্তে জীবন বাসনা ত্যাগ করা, শেষ ভাগে বিনা পদে চলা । এ জগতকে অদৃশ্য বিবেচনা করা এবং যা কিছু দৃশ্যমান তা দর্শন না করা" (উদ্দিন[১৬], পৃ: ৩৩৩)।

পাশ্চাত্য দর্শনের প্রেমতত্ত্বে ভাব-ভক্তি-প্রেম অপেক্ষা বুদ্ধির প্রাধান্য বেশী। মুসলিম দর্শনে তথা রুমী ও লালনের দর্শনে প্রেম বুদ্ধিগ্রাহ্য উপলব্ধি নয়। এটা বুদ্ধির অতীত স্বজ্ঞাজাত। সুফি দর্শনে বুদ্ধিজাত জ্ঞানকে ইলমে সফিনা' এর্ব স্বজ্ঞাজাত জ্ঞানকে ইলমে সিনা বলা হয় । মুসলিম দার্শনিকগণ ইলমে সাফিনা অপেক্ষা ইলমে সিনার ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। শাহরিয়ারো এলমে সাফিনার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন তিনি বলছেন :

برو كه خرده گرفتن به عاشقان نه رواست
كه علم و عقل تو از آنچه عشق ماست، سواست
قماش عشق به مقياس علم و عقل مسنج
كه بارگاه دل از كارگاه مغز، جداست

(শাহরিয়ার[৬৬], ১ম খন্ড, পৃ: ১১১)

উচ্চারণ ঃ

বোরো কে খোরদে গেরেফ্তান বে আ'শেকা'ন না রাভা'স্ত,
কে এলম ও আক্বলে তু আয অ'নচে এশকে মা'স্ত, সেভা'স্ত।
ক্বোমা'শে এশক্ব কে মাক্বইয়া'শে এলম ও আক্বল মাসান্জ,
কে বা'রগা'হে দেল আয কা'রগা'হে মাগ্য, জোদা'স্ত ॥

অর্থ ঃ

চলে যাও, কারো দোষ ধরা প্রেমিকদের জন্য সমুচিত নয়,
তোমার জ্ঞান-বুদ্ধি আর আমাদের প্রেম এক জিনিস নয়।
প্রেমের পোষাক কে জ্ঞান-বুদ্ধির পাল্লায় মেপোনা,
কারণ হৃদয়ের মজলিস আর জ্ঞানের কারখানা এক জিনিস নয় ॥

শাহরিয়ারের মতে যারা খোদা প্রেমের অধিকারি হতে পারেনা বা এই প্রেমের মর্ম যারা বোঝেনা তারাই জ্ঞান নিয়ে বেশী বাড়াবাড়ি করে। এই দু'টির পার্থক্য বোঝাতে গিয়ে তিনি বলেন :

يک شعر، عاشقي وديگر شعر، عاقلي
سعدي يکي سخنور و حافظ قلندر است

(শাহরিয়ার[৬৬], ১ম খন্ড, পৃ: ১০৫)

উচ্চারণ ঃ

এক শে-র, আ'শেকি ভা দিগার শে-র, আ'ক্বেলি,
সা'দী একি সুখানভার ভা হা'ফেজ ক্বালান্দার আস্ত ॥

অর্থ ঃ

একটি হলো প্রেমের কবিতা, আরেকটি হলো জ্ঞানের কবিতা,
যেমন সা'দী একজন বক্তা ছিলেন আর হাফেয ছিলেন খোদা প্রেমিক ॥

শাহরিয়ারের মত লালনও তার প্রেমতত্ত্বকে দুভাগে ভাগ করেছেন -১. প্রাকৃতিক প্রেম বা ভবের পিরীতি , ২. ঐশী প্রেম বা খোদার পিরীতি। মানুষ প্রাকৃতিক কারণেই ধন-সম্পদ, টাকা-পয়সাম স্ত্রী-পুত্র-পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন ইত্যাদি কামনা করে। যে শক্তি বা বৃত্তি মানুসের মনকে এসব পার্থিব বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট করে তা লালনের মতে, ভবের পিরীতি। জড়-জগতের প্রতি আকর্ষণই পার্থিব প্রেম, ভালোাসা, দয়া-মায় , মোহ-মমতা, পরোপকার, বদান্যতা, মানব কল্যাণ ইত্যাদির ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। ঐশী প্রেমের সোপান হিসেবে প্রাকৃতিক প্রেম বা মানবিক প্রেমের যাথেষ্ট মূল্য আছে। ঐশী প্রেমে উন্নীত হতে হলে মানবিক প্রেমের মাধ্যমে স্তরে স্তরে উন্নীত হতে হয়। যারা নিয়ম না মেনে একলাভে আকাশে উঠতে চায় তারা লালনের ভাষায় অবিশ্বাসী কাফের এবং তার কামনা-বাসনার পূজারী, ভোগ বিলাসে মত্ত, আত্ম-স্বার্থে নিয়োজিত , পার্থিব বা প্রাকৃতিক প্রেমে মগ্ন। প্রেমাগ্নিতে কুপ্রবৃত্তিসমূহকে দগ্ধীভূত করে মানুষ প্রাকৃতিক প্রেম বা 'কাম' থেকে নিস্কাম-প্রেম বা ঐশী প্রেমে উন্নীত হতে পারে।

শাহরিয়ারও জ্ঞানকে একেবারে অপ্রয়োজনীয় মনে করেননি, বরং আল্লাহকে চেনার জন্য কিছুটা হলেও জ্ঞানের প্রয়োজন। বিশেষ করে যারা খোদা প্রেমকে অর্জন করতে পেরেছেন তাদের কথা আলাদা। তাদের জগৎ স্বাভাবিক জ্ঞানের উর্দ্ধে, কিন্তু যারা প্রেমের মর্মকে এখনো উপলব্ধি করতে পারেননি পথ চলতে গেলে কিছুটা হলেও জ্ঞান তাদের প্রয়োজন। তিনি বলেন :

عقل نا محرم عشق است، نيازي به ميان
با وي از عهد ازل آنچه ميان من و تست

(শাহরিয়ার[৬৬], পৃ: ১১৫)

উচ্চারণ ঃ

আক্বল না মাহরামে এশক্ব আস্ত, নিয়া'যি বে মিয়া'ন,
বা' ভই আয আহদে আযল অ'নচে মিয়া'নে মান ও তোস্ত ॥

অর্থ ঃ

জ্ঞান, প্রেমকে পছন্দ না করার ফল, যা আমাদের মাঝে দরকার,
সৃষ্টির শুরু থেকেই আমার আর তোমার মাঝে এর একটি সম্পর্ক রয়েছে ॥

হাফিয প্রভাবিত শাহরিয়ার :

শাহরিয়ারের একটি প্রসিদ্ধ মন্তব্য ছিল هرچه دارم از دولت حافظ دارم অর্থাৎ যা কিছু অর্জন করেছি হাফিযের সম্পদ থেকে অর্জন করেছি। হাফিয ও শাহরিয়ারের জীবন যেন একই সূত্রে বাঁধা ছিল। তাই শাহরিয়ারের কবিতার ছত্রে ছত্রে কবি হাফিয শিরাযির স্পষ্ট প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।(মোহাম্মদি[৫৩], পৃ: ২৯)

কবির বয়স যখন সাত বছর, তিনি তার চাচার বাসায় ছিলেন, সবেমাত্র বর্ণমালা শিখেছিলেন সেই সময়ে দু'টি বই হাতে পেয়েছিলেন, একটি কোরআন শরীফ অপরটি দিভানে হাফিয। তিনি আরো বলেন বলেন :

مي رفتم بازي مي كردم و مي آمدم يک بار قرآن را مي خواندم و يک دفعه حافظ را. از اول مغزم پر شد با اين كلمات موزيكال آسماني قرآن مجيد و اشعار حافظ

অর্থাৎ ঃ কখনো খেলা করতাম, খেলা থেকে ফিরে এসে কিছু সময় কোরআন পরতাম আবার কিছু সময় দিভানে হাফিয পড়তাম। সে সময় থেকেই ঐশ্বরিক ছন্দময় কোআন ও হাফিযের কবিতার মাধ্যমে আমার বিবেক পরিপূর্ণ হয়েছিল। (মোহাম্মদি[৫৩], পৃ: ২৯)

হাফিযের প্রতি গভীর প্রেমের কারণে কবি তার কাব্য নামটিও দিভানে হাফিয থেকে থেকে নির্বাচন করেছেন । (পৃ-২ এর দ্রষ্টব্য)

শাহরিয়ার চেয়েছিলেন জীবনের শেষভাগটি হাফিযের কবরের পাশে কাটাবেন, কিন্তু পরবর্তীতে তার এই ইচ্ছাকে পরিপূর্ণ করতে পারেননি। শাহরিয়ার হাফিযের মাঝেই তার সমস্থ আবেগ অনুভূতি ও জিজ্ঞাসার জওয়াব পেয়েছেন। তিনি বলেন :

در اين حال نه از خودم و نه از ديگران هيچ شعري پيد مي كنم كه كاملا جوابگوي احساساتم باشد تنها در خضيض و اوج حال خود دو بيت از خواجه هست كه چنگي به دلم من زند :

به قول مطربان از خود به در رفتم گه و بيگه
كز ان راه گران قاصد خبر دشوار مي آرد

(মোহাম্মদি[৫৩], পৃ: ৩০)

অর্থাৎ এই অবস্থায় না আমার নিজের কোন কবিতা না অন্য কোন কবির কবিতা পাচ্ছিনা যা হুবুহু আমার অনুভূতির জবাব হতে পারে। কেবলমাত্র হাফিযের এই কবিতার মধ্যে আমি আমার অনুভূতির জবাব খুঁজে পেলাম। অনুরূপভাবে নিম্নের কবিতায় তিনি বলছেন :

همچو حافظ غريب در ده عشق
به مقامي رسيده ام كه مپرس

(মোহাম্মদি[৫৩], পৃ: ৩০)

উচ্চারণ ঃ

হামচো হা'ফেয গারীব দার দাহে এশক্ব,
বে মাক্বা'মী রেসীদে আম কে মাপোরস ॥

অর্থ ঃ

হাফিযের মত প্রেমের জনপদে আমি নিঃস,
কিন্তু যে মর্যাদায় আমি পৌছেছি সে ব্যপারে প্রশ্ন করোনা ॥

দিভানে হাফিয ছাড়াও, হাফিযের সেতার শাহরিয়ারকে অনুপ্রণিত করেছে। তিনি বলেন :

بعد از نواي خواجه شيراز شهريار
دل بسته ام به ناله ي سيم سه گاه تو

(শাহরিয়ার[৬৬], ১ম খন্ড, পৃ: ৩৬৯)

উচ্চারণ ঃ

বা-দ আয নাভা'য়ে খা'জা শিরায শাহরিয়া'র,
দেল বাস্তে আম বে না'লেয়ে সিমে সে গা'হে তো ॥

জীবনের প্রতিটি মুহুর্তে হাফিযের কবিতা শাহরিয়ারকে অনুপ্রাণিত করেছে। তিনি বলছেন :

ديشب به شعر خواجه ره خواب مي زدم
از جويبار خلد به رخ آب مي زدم

(শাহরিয়ার[৬৬], ১ম খন্ড, পৃ: ২৯৫)

উচ্চারণ ঃ

দীশাব বে শে-রে খা'জা রাহে খা'ব মী যাদাম,
আয জুয়িবা'রে খোল্‌দ বে রোখে অ'ব মী যাদাম ॥

অর্থ ঃ

গত রাতে স্বপ্নে আমি খাজার কবিতার রাস্তায় বিচরণ করেছি,
বেহেশতের ঝরণা থেকে যেন আমার মুখমন্ডলে পানি ছিটিয়েছি ॥

হাফিয শিরাযির কবর যিয়ারত কে উদ্দেশ্য করে লেখা কবিতা همت اي پير কবিতায় তিনি বলেন :

اي زيارتگه رندان قلندر برخيز
توشة من همه در گوشة انبانة توست

(শাহরিয়ার[৬৬], ১ম খন্ড, পৃ: ১১৫)

উচ্চারণ ঃ

এই যিয়া'রাতগাহে রেন্দা'নে ক্বালান্দার বারখীয,
তোশেয়ে মান হামে দার গোশেয়ে অনবা'নিয়ে তোস্ত ॥

অর্থ ঃ

ওহে তীর্থস্থানের দুনিয়াত্যাগী মাতাল তুমি জেগে উঠ,
তোমার পিঠের ঝুলিই আমার সমস্থ রসদ তোমার ॥

শাহরিয়ার হাফিযের গযলকে سرود ملاء اعلي، خم مي، سحر، نغمه ي قدوس، جويبار خلد، نواي جاويدان প্রভৃতি নামে নামকরণ করেছেন। (মোহাম্মদি[৫৩], পৃ: ৩১) দিভানে শাহরিয়ারের বহু জায়গায় হাফিযের প্রসংসায় লেখা কবিতা দেখতে পাওয়া যায়।

শাহরিয়ারের মতে হাফি শিরাযি ছিলেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবি। তার ভাষায় پس از اين دنيا نظير او نخواهد يافت অর্থাৎ এই জগতে আর কোথাও হাফিযের মত কবি খুজে পাওয়

যাবেনা। তিনি হাফিযকে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ট আরেফ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন কারণ হাফিয যা কিছু করেছেন কোরআনের ভিত্তিতে করেছেন। কবি হাফিয সম্পর্কে তিনি আরো বলেন :

پس از حافظ، به جز جامي، با اندک مسامحه اي کسي را شاعر نمي شناسم

অর্থাৎ হাফিযের পর জা'মি ছাড়া অন্য কাউকে কবি হিসেবে মনে করিনা।

ক্ল্যাসিক নিয়ম ভেঙ্গে যারা নতুন ধারার কবিতা লেখেন তাদের সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন :

طرفداران شعر نو يا شعر امروز نبيايد امثال سعدي و حافظ و مولوي و نظامي را مراد کنند. براي اين که سعدي نسبت به زمان خودش شعر نو گفته است. حافظ پس از سعدي باز سبک نويي آورده که هنوز هيچ کس نتوانسته از وي تقليد کند .

অর্থাৎ ঃ অধুনিক কবিতা বা বর্তমান যুগের কবিতার সমর্থকদের সা'দি, হাফিয, মাওলাভি, বা নিযামির দৃষ্টান্ত অভিষ্ট লক্ষ্য হওয়া উচিত নয়। কারণ সা'দি তার যুগ অনুযায়ী আধুনিক কবিতা লিখেছেন। সা'দির পর হাফেয তার যুগ অনুযায়ী আধুনিক কবিতা লিখেছেন, যাকে আজ পর্যন্ত কেউ অনুকরণ করতে পারেনি।

কবি হাফিযের প্রতি প্রবল ভালবাসা থাকার কারণে তিনি হাফিযের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছেন। শাহরিয়ার নিজেকে দ্বিতীয় হাফিয বলে জানতেন। তিনি বলছেন :

شهريارا چه آورد تو بود از شيراز
که جهان هنرت حافظ ثاني دانست

(শাহরিয়ার[৬৬], ১ম খন্ড, পৃ: ১১৯)

উচ্চারণ ঃ

শাহরিয়া'রা' চে অ'ভারাদে তো বূদ আয শিরা'য,
কে জাহা'ন হুনারাত হা'ফেযে সা'নি দা'নেস্ত ॥

অর্থ ঃ

ওহে শাহরিয়ার তুমি শিরায থেকে কি পাথেয় নিয়ে এসেছিলে,
জগৎ তোমার শিল্পকে দ্বিতীয় হাফিয হিসেবে আখ্যায়িত করেছে ॥

তবে তিনি বরাবরই স্বীকার করে এসেছেন হাফিযের গযলকে নকল করা বা তার সমপর্যায়ের কোন রচনা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। তিনি বলছেন :

نتوان به طرز خواجه سخن گفت شهريار
اين نکته گو به کفون من و هم تراز من

(শাহরিয়ার[৬৬], ১ম খন্ড, পৃ: ৩৩৫)

Dhaka University Institutional Repository

উচ্চারণ ঃ

নাতাভা'ন বে তারাযে খা'জা সুখান গোফ্ত শাহরিয়'র,
ইন নোকতে গু বে কোফুনে মা ভা হাম তারা'য়ে মান ॥

অর্থ ঃ

খাজা শিরাযির মত করে শাহরিয়ার কথা বলতে পারেনা,
এই বিষয়টি আমার সমকক্ষ ও সমালোচনা করিদের বলে দাও ॥

অন্যত্র বলছেন :

بعد حافظ دهني خوش به غزل باز نشد
عارفان قفل ادب بر در اين خانه زدند

(শাহরিয়ার[৬৬], ১ম খন্ড, পৃ: ২১০)

উচ্চারণ ঃ

বা-দ হাফিয দাহা'নিয়ে খোশ বে গাযল বা'য নাশোদ,
অরেফা'ন ক্বোফলে আদাব বার দারে ইন খা'নে যাদান্দ ॥

অর্থ ঃ

হাফিযের পর গযলের জন্য আর কোন মিষ্টি মুখ উম্মুক্ত হয়নি,
কারণ সাধকেরা এই গৃহে আদবের তালা ঝুলিয়ে দিয়েছে ॥

আরো বলেন :

تو شهريار به الهام خواجه ره نبردي
كه نقش ما همه تقليد فوت و فن باشد

(শাহরিয়ার[৬৬], ১ম খন্ড, পৃ: ১৮৪)

উচ্চারণ ঃ

তো শাহরিয়া'র বে এলহামে খা'জা রাহ নাবোরদি,
কে নাক্বশে মা' হামে তাক্বলীদে ফউত ও ফান্ন বা'শাদ ॥

অর্থ ঃ

শাহরিয়ার তুমি খা'জার এলহামের পথ ধরে হাটনি,
আমাদের কাজ তো শুধু গত হয়ে যাওয়া পদ্ধতিকে অনুস্বরণ করা ॥

শাহরিয়ার নতুনত্বের দিক থেকে হাফেয ও সা'দিকে অনুস্বরণ করেছেন বলে মনে করেন। হাফিয এর প্রতি শারিয়ারের প্রবল আকর্ষণের কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন :

سحري كه در ترانة خواجه است اي فلک

يک لحظه هم به زمزمة شهريار بخش

(শাহরিয়ার[৬৬], ১ম খন্ড, পৃ: ২৭২)

উচ্চারণ ঃ

সেহরী কে দার তারা'নিয়ে খা'জা আস্ত এই ফালাক্ব,
এক লাহযে হাম বে যামযামেয়ে শাহরিয়া'র বাখশ ॥

অর্থ ঃ

হে আকাশ খাযার সংগীতে যে যাদু আছে,
তুমিও এক মূহুর্ত শাহরিয়ারের এই গুঞ্জরণে উৎস্বর্গ কর ॥

শাহরিয়ার হাফেযকে একজন যোগ্য পীর বা মোর্শেদ হিসেবে জানতেন এবং তাকে مقتدار،مسيحايي پير، مرشد، الگوي خود প্রভৃতি নামে নামকরণ করেছেন। তিনি বলছেন :

حافظ تو مسيحايي اين نغمه قدوس
در پردة ناقوسي با دير و رهاب اولي

(শাহরিয়ার[৬৬], ১ম খন্ড, পৃ : ৪০৯)

উচ্চারণ ঃ

হা'ফেয তো মাসীহা'য়ীয়ে ঈন নাগমেয়ে ক্বোদূস,
দার পারদেয়ে না'ক্বুসী বা' দীর ভা রোবা'বে আভভালি ॥

অর্থ ঃ

হাফেয তুমি এই পবিত্র সঙ্গীতের মসিহ,
গীর্জাগুলোতে সুর-ছন্দে এগুলো পড়া উচিত ॥

আরেক জায়গায় বলছেন :

به نقش خواجة ما بين و شاه بو اسحق
كه پادشه ادب از پير ما نگه دارد

(শাহরিয়ার[৬৬], ১ম খন্ড, পৃ: ১৬৪)

উচ্চারণ ঃ

বে নাক্বশে খ'াজেয়ে মা' বীন ও শা'হ বু ইসহাক্ব,
কে পা'দশাহ আদব আয পীরে মা' নেগাহ দা'রাদ ॥

অর্থ ঃ

আমাদের খাজা আর আবু ইসহাকের কর্ম দেখ
বাদশাহ আমাদের পীরের কাছ থেকে অদব শিখেছেন ॥

শাহরিয়ার নিজেকে হাফেযের মুরিদ হিসেবে উৎস্বর্গ করেছেন এবং তাঁর পদাঙ্ক অনুস্বরণ করে জীবনকে গঠনের চেষ্টা করে গেছেন। নিজের আধ্যাত্মিক অনুভূতি গুলোকে কাব্যে তুলে ধরেছেন। শাহরিয়ার নিজেকে হাফেযের গোলাম মনে করতেন। (মোহাম্মাদি, পৃ: ৩১) তিনি বলেন :

تا شهريار ملک قلوب و قلم شديم

مملوک خواجه ایم و جهاني غلام ما

(শাহরিয়ার[৬৬], ১ম খন্ড, পৃ: ৯১)

উচ্চারণ ঃ

তা' শাহরিয়া'র মোলকে ক্বোলুব ও ক্বালাম শোদীম,
মামলুকে খা'জা ঈম ও জাহা'নি গোলা'মে মা' ॥

অর্থ ঃ

শাহরিয়ারও তার হৃদয় ও কলমের রাজ্যে,
খাজা শিরাযির গোলামে পরিণত হয়ে গেছে ॥

হাফেযের সুমধুর বানীগুলোর মধ্যে তাওহীদ ও আধ্যাত্মিকতার প্রকৃত শিক্ষা নিহিত আছে। এই পথনির্দেশনা ছাড়া হাফেয আধ্যাত্মিক জগতে পথ চলতে পারতেন না। শাহরিয়ারের মতে :

وقت خواجه ما را خوش کز نواي جاویدش
نغمه ساز توحید است ارغنون عرفاني
روي مسند حافظ شهریار بي مایه
تا کجا بینجامد انحطاط ایراني

(শাহরিয়ার[৬৬], ১ম খন্ড, পৃ: ৪১৩)

উচ্চারণ ঃ

ভক্বতে খা'জা মা' রা' খূশ কায নাভা'য়ে জা'ভীদাশ,
নাগমে সা'যে তাওহীদ আস্ত আরগোনূনে এরফা'নী।
রুয়ে মাসনাদে হা'ফিয শাহরিয়া'র বি মা'য়ে,
তা কোজা' বিয়া'নজা'মাদ এনহেতা'তে ইরা'নী ॥

অর্থ ঃ

সে সময়ে খা'জা তার অবিনশ্বর সুর দ্বার আমদের ধন্য করলেন,
আর তা ছিল আধ্যাত্মিক বাদ্যযন্ত্রে তাওহীদের সংগীত পরিবেশন।
হাফেজের সিংহাসনে শাহরিয়ার নিঃশ,
ইরানিদের অবক্ষয় কোথায় গিয়ে দাড়াবে ॥

হাফেযের কবিতাই খোদাকে জানার সর্বোত্তম রাস্তা। শাহরিয়ার বলেন :

شعر حافظ همه دیباچة دیوان خداست
هرکه این گل طلبد سعي گلندام کند
شهریارا نکند درس بدیع استاد
آن چه شعر تو به تشبیه و به ایهام کند

(শাহরিয়ার[৬৬], ১ম খন্ড, পৃ: ২১৫)

উচ্চারণ ঃ

শে-রে হা'ফিয হামে দিবা'চেয়ে দিভানে খোদা'স্ত,

হারকে ইন গোল ত্বালবাদ সায়িয়ে গোলান্দাম কোনাদ।
শাহরিয়া'রা' নাকোনাদ দারসে বাদি ওস্তা'দ,
অনচে শে-রে তো বে তাশবিহ ভা বে ঈহা'ম কোনাদ ॥

অর্থ ঃ

হাফিযের কবিতা পুরোটাই খোদার কাব্য গ্রন্থের ভূমিকা,
যারা এই ফুলকে খোঁজ করতে চায় তাদের গোলান্দামের[i] মত চেষ্টা করা উচিত।
হাফেয কখনোই এলমে বাদি' এর শিক্ষক হতে পারত না,
যদি না তোমার কবিতায় এই ঈহাম ও তাশবীহ থাকত ॥

আমরা যদি শাহরিয়ারের উপর হাফেযের প্রভাব নিয়ে পর্যালোচনা করি তাহলে দেখতে পাব, পাঁচ দিক থেকে শাহরিয়ার, হাফেযের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন।

১. استقبال از وزن، قافیه و ردیف বা কবিতার ছন্দ ও অন্তমিলের দিক থেকে।
২. تضمین عین مصراع یا بیت حافظ হাফেযের কবিতা থেকে সরাসরি কোন মেসরা বা বেইত নিজের কবিতায় নিয়ে এসেছেন।
৩. مضمون هاي مشترق হাফেযের কবিতার সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলী নিজের কবিতায় নিয়ে এসেছেন।
৪. استفاده از تعابیر و اصطلاحات شعر হাফেযের বিভিন্ন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও পরিভাষাকে ব্যবহার করেছেন।
৫. یاد کرد حافظ হাফেযকে নিজ কবিতায় স্বরণ করেছেন বা হাফেযের আলোচনা নিয়ে এসেছেন।

প্রথমত ঃ ছন্দ ও অন্তমিলের দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায়, হাফেযের পাঁচশত গযলের মধ্য থেকে ১৫৩ টি গযলের ছন্দ ও অন্তমিল নিজ কবিতায় ব্যবহার করেছেন। যা হাফেযের গযলের প্রায় ৩৩% এবং শাহরিয়ারের গযলের দিক থেকে দেখলে প্রায় ৩৬%। কারণ শাহরিয়ারের গযলের সংখ্যা ৪৩৭ টি তার মধ্যে ১৬০ টি গযলে তিনি হাফেযের কবিতার ছন্দ ও অন্তমিল ব্যবহার করেছেন। এর মধ্যে ৫০ টি গযল দিভানে শাহরিয়ারের দ্বিতীয় খন্ডে এক জায়গাতেই পাওয়া যায়। অন্যান্য ১০০ টি গযল দিভানের বিভিন্ন জায়যায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে।

দ্বিতীয়ত ঃ হাফেযের অনেক কবিতা থেকে তিনি تضمین করেছেন। অন্য কোন কবির কবিতার বেইত বা তার অর্থ বা বিষয়বলী, নিজ কবিতায় নিয়ে আসাকে تضمین বলে। সাধারণত উধাহরণ পেশ করার জন্য কবিতায় অন্য কবির বেইত বা মেসরাকে আনা হয়। শাহরিয়ার হাফেযের ৩৭ টি কবিতা থেকে تضمین করেছেন। এর মধ্যে ৮ টি জায়গায় তিনি সরাসরি হাফেযের বেইত কে تضمین করেছেন এবং ২৭ জায়গায় তিনি হাফেযের মেসরাকে تضمین করেছেন।

[i] মোহাম্মাদ বিন গোলান্দাম দিভানে হাফেজের বিখ্যাত একজন গবেষক ছিলেন, তিনি ৪০ বছর হাফেজের গজলের গবেষণায় কাটিয়ে দেন।

তৃতীয়ত ঃ বিষয়বস্তুর প্রভাবের ক্ষেত্রে নিদৃষ্ট সংখ্যা নির্দেশ করা যায়না। যে সমস্থ ক্ষেত্রে تـضمـيـن করেছেন সেখানেও তিনি হাফেজের বিষয়াবলীকে নিয়ে এসেছেন, এছাড়াও চিন্তা-চেতনা, ধ্যান-ধারণা, প্রেম-দর্শন, আধ্যাত্মিকতা প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই তিনি হাফেযের বিষয়াবলী নিজের কবিতায় নিয়ে এসেছেন। বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে শাহরিয়ারের পুরো সাহিত্যকর্ম জুড়েই হাফেজের ছায়া লক্ষ্য করা যায়। উদাহরণ স্বরুপ নিম্নের কবিতাগুলোকে উপস্থাপণ করা যায়। যেমন

শাহরিয়ার বলছেন :

تـا جـلـوه كـرد طـلـعـت سـاقـي بـه جـام مـا
در جـام لالـه ريـخت مـي لـعـلـفـام مـا

(শাহরিয়ার[৬৬], ১ম খন্ড, পৃ: ৯১)

উচ্চারণ ঃ

তা' জালভা কারদ ত্বালয়াতে সা'কী বে জা'মে মা',
দার জা'মে লা'লে রিখত মেই লা-'লফা'মে মা' ॥

অর্থ ঃ

যখন সাকী জাম বাটিতে দ্যুতি ছড়ালো,
লাল জাম বাটি গুলোতে শরাব উপচে পড়ল ॥

তেমনি ভাবে হাফেজ বলেছেন :

سـاقـي بـه نـور بـاده بـر افـزون جـام مـا
مـطرب بـگـو كـه كـار جـهـان شد بـه كـام مـا

(শাহরিয়ার[৬৬], ১ম খন্ড, পৃ: ৯১)

উচ্চারণ ঃ

সা'ক্বী বে নূরে বা'দে বার আফযূন জা'মে মা',
মোতরেব বোগু কে কা'রে জা'হান শোদ বে কা'মে মা' ॥

অর্থ ঃ

ওহে সাকী শরাবের আলোতে আমাদের জাম বাটি আরো পূর্ণ করে দাও
হে নর্তক তুমি বলে দাও এই পৃথিবির সব কাজ আমাদের বাসনা অনুযায়ী হয়েছে

আবারও শাহরিয়ার বলছেন :

سر خـوش آنـان كـه سر خـيـزه بـه خـمـخـانـه زدنـد
سركـشـيـدنـد خم و پـاي بـه پـيـمـانـه زدنـد

(শাহরিয়ার[৬৬], ১ম খন্ড, পৃ: ২০৯)

উচ্চারণ ঃ

সারখুশ অ'না'ন কে সারে খিযে বে খুমখা'নে যাদান্দ,
সা কেশীদান্দ খোম ভা পা' বে পেইমা'নে যাদান্দ ॥

অর্থ ঃ

অনন্দিত তারাই যারা তাদের ঔদ্ধত মস্তক শুরি খানায় দিয়েছে
মাথা নিচু করে শরাব পানে মত্ত হয়েছে ॥

হাফেজ বলছেন ঃ

دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند
گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند

উচ্চারণ ঃ

দুশ দীদাম কে মালা'য়েক দার মেইখা'নে যাদান্দ,
গেলে অ'দাম বেসেরেশতান্দ ভা বে পেইমা'নে যাদান্দ ॥

অর্থ ঃ

গাতরাতে দেখেছি ফেরেস্তারা শুরি খানায় গিয়েছে,
আদমের মাটি গায়ে মেখে শরাব পান করেছে ॥

চতুর্থত ঃ বিভিন্ন শব্দ-পরিভাষা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে শাহরিয়ার হাফেযের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণকে ধার করেছেন। হাফেযের এই ধার করা ব্যখ্যা দিভানে শাহরিয়ারে প্রচুর পরিমানে দেখতে পাওয়া যায়। যেমন :

خرابات، آب حیات، جام، جام جم، خمخانه، پیر خرابات، میکده، باده فروش، رند، رندي، ساقي، سبو، مي، شراب، میخانه، زلف، خرکه، مطرب.

যেমন ঃ رندي বা মাতাল শব্দটি হাফেযের কবিতায় বারংবার ব্যবহৃত হয়েছে। শাহরিয়ার এই শব্দটিকে আল্লাহ প্রেমিকদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন। যেমন তিনি বলছেন :

راز درون پرده ز رندان مست پرس
کاین حال نیست زاهد عالي مقام را

http//www.sid.ir.com/

উচ্চারণ ঃ

রা'যে দরুনে পারদে যে রেন্দা'নে মাস্ত পোরস,
কায়িন হা'ল নিস্ত যা'হেদে আলী মাকা'ম রা' ॥

অর্থ ঃ

মাতাল মদ খোরদের পর্দার ভেতরের রহস্য জিজ্ঞাসা কর,
তাদের এই হালত অনেক উচু মর্যাদার সুফীদেরও নেই ॥

পঞ্চমত ঃ হাফেজকে স্বরণ করার ব্যাপারে কখনো হাফেজের গুনগান করেছেন। কখনো হাফেজের নাম সরাসরি উল্লেখ করেছেন আবার কখনো ইশারায় হাফেজের কথা বলেছেন। কখনো خطاب به حافظ বা হাফেজকে সম্বোধন করেও কিছু কথা বলেছেন। যেমন ঃ তিনি বলছেন, যদি হাফেজের আধ্যাত্মিকতা দ্বারা অনুপ্রাণিত না হতেন তবে এলহাম অর্জনের শক্তি তার ভিতরে কভনোই আসত না। তিনি বলছেন :

شهريارا دم الهام به هر كس ندهند
خواجه گر دم زد از اين قصه دمي ملهم زد

(শাহরিয়ার[৬৬], ১ম খন্ড, পৃ: ১৭৯)

উচ্চারণ ঃ

শাহরিয়'রা' দা'মে এলহা'ম বে হার কাস নাদাহান্দ,
খা'জা গার দাম যাদ আয ইন কেস্‌সে মোলহেম যাদ ॥

অর্থ ঃ

শাহরিয়ার এলহামের শাক্তি সবাইকে দেয় নাই,
খাজার এলহামের শক্তি থেকে এটা প্রাপ্ত হয়েছেন ॥

শাহরিয়ারের মতে, যদিও সা'দী এলহামের ভিত্তিতে কবিতা লিখেছেন, তবু হাফেযের কবিতা যেন সয়ং খোদার সংগীত বানী। যেমন তিনি বলছেন :

پند سعدي كلمات ملك العرش علا
غزل حافظ سرود ملاء اعلا بود

(শাহরিয়ার[৬৬], ১ম খন্ড, পৃ: ২২৭)

উচ্চারণ ঃ

পান্দে সা-দী কালেমা'তে মালাকোল আরশে আলা',
গাযালে হা'ফেয সোরুদে মালা'য়ে অ-লা' বূদ ॥

অর্থ ঃ

সা'দীর উপদেশ বাণী যেন আরশের ফেরেস্তাদের ভাষা,
আর হাফেজের গযল যেন আল্লাহর দরবারের সংগীত ॥

হাফেযের শিক্ষার দিকে ইঙ্গিত করে তিনি বলেন هرچه كردم از دولت قرآن كردم যা কিছু করেছি কোরআনের শিক্ষা থেকে করেছি। অপর আরেক জায়গায় তিনি বলেন :

از دوران نوجواني حافظ بزرگوار راهگشاي من بود و طفل مكتب عشق بودم، به قرآن راه يافته و توفيق هم پيدا كرده ام

অর্থাৎ যুবক বয়স থেকেই হাফেয আমার সকল পথকে উম্মুক্ত করেছে, সে সময় প্রেমের জগতে শিশু ছিলাম এরপর কোআনের দিকে পথ প্রাপ্ত হলাম ও সামর্থবান হলাম।

শাহরিয়ারের আধ্যাত্মিক চিন্তাদর্শন ও দৃষ্টিভঙ্গি :

শাহরিয়ারে কবিতাগুলো বিশেষ করে তার গযলগুলোকে বিশ্লেষণ করলে গভীর আধ্যাত্মিক চিন্তাদর্শনের পরিচয় পাওয়া যায়। অত্যন্ত শৈল্পিকভাবে, কাব্যিক ভাষায় এই চিন্তাদর্শনকে তার কবিতায় ব্যক্ত করেছেন। সুফিদের ব্যবহৃত বিভিন্ন পরিভাষাকে নিজ কবিতায় ব্যাখ্যা করেছেন। শাহরিয়ার শুধুমত্র কবিই ছিলেন না বরং একজন আধ্যাত্মিক সাধকও ছিলেন। জীবনের একটি পর্যায় আধ্যাত্মিক সাধনার মধ্যে

কাটিয়েছেন। আধ্যাত্মিকতার বিভিন্ন পর্যায় ও পরিভাষা সম্পর্কে কবি তার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি পেশ করেছেন। নিম্নে সেগুলো সম্পর্কে বিস্ড়রিত আলোচনা করা হলো :

শাহরিয়ারের দৃষ্টিতে আ'রেফ ও এরফানিয়াত :

একজন আরেফ বা সুফি কে, সে সম্পর্কে অনেক মতবাদ পাওয়া যায়। একেকজন একেক ভাবে সুফি কে মানুষের কাছে পরিচীত করেছেন। মাওলানা রুমি বলছেন :

صوفي آن باشد كه شد صفوت طلب
نه لباس صوف و خياطي و دب

উচ্চারণ ঃ

সূফী অন বা'শাদ কে শোদ সাফভাত ত্বা'লাব,
না লেবা'সে সূফ ও খাইয়া'ত্বী ভা দাব ॥

অর্থ ঃ

সুফি ঐ ব্যক্তি যে পরিচ্ছন্নতার সন্ধানি,
ঐ ব্যক্তি নয় যে পশমি পোষাক ও দবের[i] সন্ধান করে ॥

ডঃ আলী আসগর হালাবী বলেন :

تعريفي كه از تصوف كرديم بايد بگوييم كه : صوفيان آن كسانند كه همواره مني كوشند (نفس) خود را خود را بپالايند و خود را از آلايش هاي دروني و ريا تزوير و نيز بندگي و خداوند برهانند و آنرا بدين طريق فاني سازند، تا خود را به مرحلة (بقا در خدا) برسانند، و به عبارت ساده تر: صوفي كسي است كه مي كوشند خويها پسنديده را فرا گيرد و از خويهاي نا پسنديده دور شود (হালবী[৭৪], পৃ: ৩৫)

কবি হাফেয সুফিদের সর্ম্পকে ভিন্ন মত পোষক করেছেন। তিনি কখনই খানকা ভিত্তিক খেরকা[ii] ধারী সুফিদের কে সমর্থন দেননি। হাফেযের মতে :

آري صوفي يا قلندر به معني رسمي خانقاهي نيست. به جاي آنكه عارف باشد، عارفان شناس است، و نه فقط از قيد خرقه وفرقه و خانقاه، بلكه از قيد طامت وشطح و از اصطلاح شناسي قراردادي صوفيانه هم آزاد است (খোররামশাহী[২৫], পৃ: ২১)

আরেফ ও এরফানিয়াত সম্পর্কে শাহরিয়ার বলেন :

[i] সুফিদের ব্যবহৃত এক প্রকার বাদ্যযন্ত্র

[ii] সুফিদের ব্যবহৃত বিশেষ পশমি পোষাক

عرفاني مكتب انسان ساز و عارف انسان كامل است. زماني كه بشر به مدارج عاليه ي انساني راه يافت، ديده ي خدابين مي يابد، يعني خدا را در همه جا حاضري مي بيند

মানুষ তৈরীর পদ্ধতির নাম হলো এরফান, আর আরেফ হলেন ইনসানে কামেল বা পরিপূর্ণ মানুষ। যখন মানুষ মনুষত্বের পূর্ণতার পথ প্রাপ্ত হয়, তখন খোদাকে দেখার দৃষ্টি অর্জন করে অর্থাৎ সমস্থ জায়গায় সে খোদাকে উপস্থিত দেখতে পায়। যেমনি ভাবে শেখ সাদী বলেন :

رسد آدمي به جايي كه به جز خدا نبيند
بنگر كه تا چه حد است مكان آدميت

(শিরাজী[৬৮], গযল ১৬)

উচ্চারণ ঃ

রাসাদ অ'দামি বে জা'য়ি কে বে জুয খোদা' নাবিনাদ,
বেনগার কে তা' চে হাদ আস্ত মাকা'নে অ'দামিয়াত ॥

অর্থ ঃ

বান্দা এমন একটি স্থানে পৌছায় যেখানে আল্লাহ ছাড়া আর কিছুই দেখে না,
দেখ মানবিকতার মর্যাদার সীমা কত দূর পৌছায় ॥

অনূরূপ ভাবে শাহরিয়ারও বলেন :

به دو بال مرغ نتوان ز فلک گذشتن اما
به خدا توان رسيدن به دو بال آدميت

http//www.sid.ir.com/

উচ্চারণ ঃ

বে দো বা'লে মোরগ নাতাভা'ন যে ফালাক্ব গোযাশতান আম্মা',
বে খোদা' তাভা'ন রোসীদান বে দো বা'লে অ'দামিয়াত ॥

অর্থ ঃ

পাখির পাখা দিয়ে আকাশকে অতিক্রম করা যায় না,
কিন্তু মানবতার পাখা দিয়ে আল্লাহর কাছ পর্যন্ত পৌছানো যায় ॥

আর এই পর্যায়ে পৌছানোর জন্য যে কর্মপন্থা তাকেই তরীকা বলা হয়। নফফসের আকৃতি ও প্রকৃতি অন্তরে হাসিলকরাই সমস্ত তরীকার উদ্দেশ্য। একেই বুযুর্গগণ নিসবত বা সম্বন্ধ বলে থাকেন। বুযর্গগণ একে নুর, সাকিনা, বাসিরাত ও হাইয়াতে নাফসানিয়া নামেও অভিহিত করে থাকেন। আল্লাহ শব্দের যিকির এর অর্থ ও পরিচয়ের প্রতি ধ্যান করতে করতে আল্লাহ পাকের সাথে সালেকের এমন এক মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠে যে, মুহুর্তের জন্যেও সে আল্লাহকে ভুলে থাকতে পারে না। এই সম্বন্ধের নিগুড় রহস্য ও অবস্থা যখন মানবাত্মা এবং বাক শাক্তিতে প্রবেশ করে তখন ফেরেশতাকুলের মত অসম শক্তির সন্ধান লাভ করে। (দেহলবী[৩৮], পৃ: ৫৯)

সাদির মতে মানুষের পক্ষে একটি পর্যায়ে এই মাকামে পৌছানো সম্ভব হয়ে উঠে, তখন জগৎ সংসারের সমস্থ কিছুতেই সে আল্লাহর অস্তিত্ব অনুভব করে। তিনি বলেন :

چشم کوته نظران بر ورق روي نگارين
خط همي بيند و عارف رقم صنع خدا را

উচ্চারণ ঃ

চাশমে কুতা নাযারা'ন বার ভরাক্বে রুয়ে নেগা'রীন,
খাত্ব হামী বীনাদ ভা আ'রেফ রাক্বমে সানয়ে খোদা' রা' ॥

এই প্রসঙ্গে শাহরিয়ারের অভিমত হলো :

کساني که به اين مقام و موهبت الهي رسيده اند، امتحان داده اند و جان در آستين نهاده اند و با تزکية نفس، رهايي از تعلقات خاطر، ترک مايي و مني، با محبت به تمامي مخلوقات و شفقت به آنها از جماد و نبات و حنوان گرفته تا انسان، با شستن دل از کينه و حسد و بالاخره با کشيدن رياضت ئ کسب معرفت، به اين توفيق نائل شده اند. (দেহলবী[৩৮], পৃ: ৫৯)

অর্থাৎ ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ প্রদত্ত এই অবস্থান প্রাপ্ত হয়, এর জন্য জীবন বাজি রেখে আল্লাহর রাস্তায় পরীক্ষা দিতে হয় এবং আত্ম শুদ্ধির মাদ্ধমে কামনা বাসনাকে পরিহার করতে হয়, সৃষ্টিকে ভালবসার মাধ্যমে আল্লাহকে ভালবাসার পথ সুগম করতে হয়, হৃদয়কে লোভ, লালসা ও হিংসা থেকে মুক্ত করে কঠিন সাধনার মাধ্যমে এই সামর্থ অর্জন করতে হয়।

এই প্রসঙ্গে হাফিয বলেন :

دست از مس وجود چو مردان ره بشو
تا کيمياي عشق بيابي و زر شوي

উচ্চারণ ঃ

Dhaka University Institutional Repository

দাস্ত আয মাস্সে উজুদ চো মারদা'ন রাহ বেশো,

তা' কীমিয়া'য়ে এশক্ব বিয়া'বী ভা যার শাভি ॥

অর্থ ঃ

এই অস্তিত্বশীল জগতে যদি সাহসিকতার সাথে পথ চলতে পার,

তাহলে প্রেমের পরশ পাথর অর্জন করতে পারবে ও সোনায় পরিণত হবে ॥

সুতরাং শাহরিয়ারের দৃষ্টিতে আরেফ হলো সে ব্যাক্তি, যিনি ইনসানে কামেল বা পরিপূর্ণ মানুষ, যিনি মানুষের মাঝে কোন বৈষম্যে বিশ্বাস করেন না, তিনি সকলকে ভালবাসেন এবং বিশ্বাস করেন যে আল্লহ তায়ালা সৃষ্টির মাঝে মানুষকে সবচাইতে বেশী ভালবাসেন। তিনি বলেন :

جهان مراست وطن، مذهب من است محبت

چه کافر و چه مسلمان چه آسیا چه اروپا

http//www.sid.ir.com/

উচ্চারণ ঃ

জাহা'ন মার আস্ত ভত্বান, মাযহাবে মান আস্ত মোহাব্বাত,

চে কা'ফের ও চে মুসলামন ও চে অ'সিয়া' চে উরুপ্পা'

অর্থ ঃ

পুরো বিশ্ব আমার মাতৃভূমি আর প্রেম আমার ধর্ম,

কাফের, মুসলিম, এশিয়া, ইউরোপ নির্বিশেষে ॥

শাহরিয়ারের মতে, কোন কবির ভেতর যদি আধ্যাত্মিকতা না থাকে তবে তিনি কখনোই অবিনস্বরতা লাভ করতে পারেননা। তার তুর্কি ভাষায় লিখিত একটি কবিতায় তিনি বলেন :

عرفانا چاتماسا شعر و ادب ابقا اولماز

من ده عرفانه چاتیب شعریمي ابقا ائله دیم

ابدیت اه یاناشدیم دوغولا حافظه تاي

شیرازین شاهچراغین تبریزه اهدا ائله دیم

(দুস্ত[৩৭], পৃঃ ৫৪৮)

যার ফারসি অনুবাদ করলে হয় ঃ

شعر و ادب اگر به عرفان نرسد، ابقا نمي شود
من هم به عرفان رسيدم و شعرم را ابقا كردم
با ابديت همراه شدم كه مانند حافظي زاده شود
شاهچراغ شيراز را به تبريز اهدا كردم

http://ganjoor.net/

উচ্চারণ ঃ

শে-র ও আদব আগার এরফা'ন নারাসাদ, আবক্বা' নেমী শাভাদ,

মান হাম বে এরফা'ন রেসীদাম ও শে-রাম রা' আবক্বা' কারদাম।

বা' আবদিয়াত হামরা'হ শোদা'ম কে মা'নান্দে হা'ফেযি যা'দে শোদাম,

শাহচেরা'গে শিরা'য রা' বে তাবরীয এহদা' কারদাম ॥

অর্থ ঃ

সাহিত্য আর কবিতায় যদি আধ্যাত্মকতা না থাকে তবে তা দীর্ঘ জীবি হয়না,

আমি আধ্যাত্মিকতায় পৌছেছি বলেই আমার কবিতাকে দীর্ঘজীবি করেছি।

অবিণশ্বরতার সাথি হয়েছি এবং হাফেযের মত নতুন করে জন্ম নিয়েছি,

শিরাযের সূর্যকে তাবরীযে দান করেছি ॥

وحدت বা প্রেমাস্পদের একত্ববাদ ঃ

وحدت শব্দটি احد শব্দ থেকে এসেছে। এই আহাদ অনাদি কাল থেকেই ইলাহ নামে প্রাচীন মানব সমাজে পরিচিত হয়ে আসছে। যেমন সামী (সেমেটিক), ইব্রানী (ইরনি), সুরিয়ানী, আরামী, কালদানী, হামরী, আরবী প্রভৃতি ভাষায় ইলাহ (اله) শব্দের রূপান্তরন ঘটতে থাকে। ইলাহ শব্দের অর্থ উপাস্য। আল্লাহ (الله) শব্দটি ইলাহ (اله) শব্দ থেকে উদ্ভূত। কালদানী ও সুরিয়ান ভাষায় 'ইলাহ' শব্দটি 'ইলাউয়ো' শব্দের রূপান্তরণ। তদ্রুপ ইলাহ শব্দটি ইব্রানি ভাষায় 'উলুহ' শব্দে রূপান্তর হয়েছে। আরবী ভাষায় ইলাহ শব্দটির ধাতু অর্থাৎ (اله) শব্দের সাথে আল (ال) যুক্ত হয়ে আল্লাহ হয়েছে। যেমন :

(হাযারী[৭৫], পৃ: ১৭) الله = اله + ال

احد শব্দের অর্থ এক, আর وحدنيت শব্দের অর্থ একত্ব, যার কোন দিত্ব নেই। وحدنيت ও حقيقت একই বিষয়, শুধু পার্থক্য হলো হাকীকত বা পরম সত্তায় যদিও কেনভাবে দিত্বতার সম্ভাবন থেকে যায়, কিন্তু وحدت এর মধ্যে কোনভাবেই দিত্বতার সম্ভাবনা নেই। এইরূপ একত্বের গুনে গুনান্বিত কেবল স্বয়ম্ভু আল্লাহ। আল্লাহর একত্ব অনাদি, অনন্ত, অবিভাজ্য। তাঁর মৌলিক সত্ত্বা অবিমিশ্রিতসত্ত্বা । এই অর্থে وحدت তরীকত সাধনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্তর। এই স্তরে আরেফ তাঁর আমিত্বকে

একত্ববোধের মধ্যে হারিয়ে ফেলেন। সর্ব সংখ্যার সূচনা যেমন এক থেকে, তেমনি একের সূচন শূন্য থেকে, তদ্রূপ সৃষ্টিজগতেও বহুত্বের বিকাশ সেই পরম একত্ব থেকেই। এই পরম একত্বে অবস্থান করার নামই ওহদাত। (হাযারী[৭৫], পৃ: ১৮৪) শাহরিয়ার বলেন :

نواي ساز تو خواند ترانة توحيد
حقيقي در زبان مجاز مي گويي

(শাহরিয়ার[৬৬], ১ম খন্ড, পৃ: ৪৪১)

উচ্চারণ ঃ

নাভা'য়ে সা'যে তো খা'ন্দ তারা'নেয়ে তাওহীদ,
হাক্বীক্বী দার যাবা'নে মাযায মী গোয়ী ॥

অর্থ ঃ

তোমার বাদ্যযন্ত্রের সুর তাওহিদের গান গাচ্ছে,
মূল সত্যকে রূপক ভাষায় বলে যাচ্ছে ॥

ওহ্দানিয়াত আলমে হাহুতের অন্তর্ভুক্ত। (হাযারী[৭৫], পৃ: ১৮৪) আলমে হাহুত আল্লাহ পাকের নির্গুন আবস্থানের নাম। এই পরম সত্ত্বায় কোন গুণারোপ, সিফাত বা বিশেষণ আরোপের অবকাশ নেই। কেবল তিনি চিরঞ্জিবী ও প্রকৃতি শূন্য অবস্থায় অবস্থান করছেন। মহা সজ্ঞায় তিনি সুশান্ত। তিনি নিঃসঙ্গ অবস্থায় আপনাতে আপনি আত্মবিভোর ও স্থিতিশীল। তাঁর এই মৌল সত্ত্বা সৃষ্টি, প্রকৃতি, গুণ , অবরোহ শূন্য। এই হলো তাঁর মৌল সত্ত্বা বা আদিমত্ব। আদিতে একমাত্র তিনি ছিলেন, আর কেউ ছিল না, পূণরায় সবকিছু ধ্বংসের পর কেবল তিনিই থাকবেন আর কিছু থাকবে না। ওহদানিয়াতে উত্তীর্ণ সালেক বা আরেফ সবকিছু বিলীন করে দিয়ে, এমনকি নিজেকেও ভুলে গিয়ে আল্লাহর মৌল সত্ত্বায় স্থিতিলাভ করে থাকেন। এই অবস্থায় অবস্থান করার নামই বাকা বিল্লাহ বা আল্লাহতে স্থিতিলাভ। এ অবস্থা সম্পর্কে মাওলানা রুমি বলেন : তুমি যদি নিজেকে বিলীন করে দিয়ে আল্লাহর তাওহীদে অবস্থান করতে পার, তাহলে তুমি তাঁর পরম বন্ধুরূপে তাঁরই সত্ত্বায় অবস্থান করতে পারবেন। এই স্তরে উত্তীর্ণ সাধক অমরত্ব লাভ করে থাকেন। তাঁর প্রেমের সুধা পান করতে থাকেন। এই অর্থেই হাদিসে বলা হয়েছে :

الا ان اولياء الله لا يمت

ওহে আল্লাহর ওলীদের মৃত্যু নেই। (হাযারী[৭৫], পৃ: ১৮৫)

এই ওহদানিয়াত থেকেই তাওহিদ শব্দের উৎপত্তি। তওহিদের সঙ্গায় বলা হয় :

Tawhid is the term used to express the unity of godhead, it is expressed in this formula ``la ilaha ill-Allah" meaning ``There is no God bu Allah" (hasan, p: 66)

শাহরিয়ার মতেও তাওহীদের প্রতিষ্ঠিত হওয়া ছাড়া মানুষের মুক্তির কোন পথ খোলা নেই। তাওহীদের দ্বারাই মানুষ অমরত্ব লাভ করতে পারে। তিনি হাফিয শিরাযির দৃষ্টান্ত পেশ করে বলেন, শাহরিয়ারের মূলমন্ত্র ছিল তাওহীদ। তাওহীদের শিক্ষার জন্যই হাফিযের গযল গুলো অমর হয়ে আছে। তিনি বলেন :

وقت خواجة ما خوش كز نواي جاويدش
نغمه ساز توحيد است ارغنون عرفاني

(শাহরিয়ার[৬৬], ১ম খন্ড, পৃ: ৪১৩)

উচ্চারণ ঃ

ভক্বতে খা'জায়ে মা' খোশ কায নাভায়ে জা'ভীদাশ,
নাগ্বমে সা'যে তাওহীদ আস্ত আরগোনূনে এরফা'নী ॥

অর্থ ঃ

যে সময়ে খা'জা তার অবিনশ্বর সুর দ্বার আমদের ধন্য করলেন,
আর তা ছিল আধ্যাত্মিক বাদ্যযন্ত্রে তাওহীদের সংগীত পরিবেশন ॥

এই অবস্থায় ওলিগণ আল্লাহতে এমনভাবে সমাহিত হন, ওলির মুখনিঃসৃত বাণী আল্লাহর বাণী। ওলির কর্ম আল্লাহর কর্ম বলে পরিগণিত হয়। ওলিদের বহ্যিক দেহ মৃতবৎ কিন্তু আভ্যন্তরীণ আত্মিক জগত পরম সত্ত্বায় চৈতন্যে চির জাগ্রত। ওলিগণ আল্লাহর অস্তিত্ববান। ওলিদের অবস্থান লা-মাকামে। লা-মাকামের স্তর, স্থান, কাল, পাত্র ও আপেক্ষিকতার উর্ধ্বে। এই স্তরে উন্নীত সাধককে আরেফ-বিল্লাহ বলা হয়। এই স্তরে উন্নীত বেলায়েত সম্রাট হযরত আলী রাঃ বলেছেন :

هذا القران سمعت و انا القران ناطق

অর্থাৎ এই কুরআন শ্রুত, আর আমি সবাক জীবন্ত কুরআন। এই স্তরে উত্তীর্ণ বয়েজীদ বোস্তামী বলতেন : ''সমুদয় প্রসংসা আমারই জন্য, আর আমি কতইনা গৌরবের অধিকারী''।

হযরত আবু বকর শিবলী বলতেন ''আমি ছাড়া দ্বিতীয় আর কেই নেই।'' (হাযারী[৭৫], পৃ: ১৮৫)

আহাদ শব্দ থেকেই তাওহীদ শব্দের উৎপত্তি। এর অর্থও আল্লাহর একত্ববাদ। একত্ববাদ ছাড়া স্বার্থক সাধক হওয়া কখোনই সম্ভব নয়। প্রেমতত্বের সারমর্ম হলো আল্লাহর একত্ববাদ বা তৌহিদতত্ত্ব। সাইয়েদ আহমদ কবীর রেফায়ী বলেন :

> ''আল্লাহর ভালবাসা কেবলমাত্র তাঁরাই লাভ করতে পারে যারা পবিত্রতায় পরিপূর্ণতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে, যাদের জিকির অজকার খুবই পাক পবিত্র এবং যারা মহান আল্লাহ পাকের স্মরণ থেকে গাফেলকারী বস্তুসমুহের ভয় অন্তরে বিদ্যমান রেখেছে। আর তা'তীল[ৰ] ও তাশবীহ[ৰৰ] ধ্যান-ধারণা মুক্ত অন্তরে আল্লাহ পাকের সীমাহীন বড়ত্বের উপলব্ধিকেই তাওহীদ বলে।''(রেফায়ী[৬১], পৃ: ১৬৯)

সালেকের এই অবস্থা সম্পর্কে শাহরিয়ার বলেন :

رسد آدمي به جايي كه به جز خدا نبيند
بنگر كه تا چه حد است مكان آدميت

http//www.sid.ir.com/

উচ্চারণ ঃ

রাসাদ অ'দামি বে জা'য়ি কে বে জুয খোদা' নাবিনাদ,

[i] আলণ্ঢাহর প্রতি এই বিশ্বাস স্থাপন করা যে, তিনি তাঁর খোদায়ী দায়িত্ব কোন রাসূল অথবা কোন ওলী বুযুর্গ কিংবা কোন ফেরেস্ড়র প্রতি অর্পণ করত অবসর গ্রহণ করেছেন। এখন তাঁর কোন দায়িত্ব নেই, সমস্ড় দায়িত্ব ভারপ্রাপ্তগণই পরিচালনা করেন।

[ii] আলণ্ঢাহর জাত, সিফাতকে মানুষের জাত ও সিফাতের সাথে তুলনা করা।

বেনগার কে তা' চে হাদ আস্ত মাকা'নে অ'দামিয়াত ॥

অর্থ ঃ

বান্দা এমন একটি স্থানে পৌছায় যেখানে আল্লাহ ছাড়া আর কিছুই দেখে না,

দেখ মানবিকতার মর্যাদার সীমা কত দূর পৌছায় ॥

আর আল্লাহর সত্তাসারের বা তৌহিদ মূল হলো কালেমা তাইয়্যেবা। এ কালেমা হলো 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুলাহ' আর্থাৎ ঃ নেই কোন উপাস্য আল্লাহ ব্যতীত এবং মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহর রাসুল। কিন্তু সুফি সাধকগণ কালেমা তাইয়্যেবার গুঢ়তত্ত্বের দিকে ইঙ্গিত করে এর অর্থ করে থাকেন, নেই কোন সত্তা আল্লাহ ব্যতীত এবং মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর মাযহার'। কাজী নজরুল ইসলাম বলেন :

হরদম জপে কালেমা যে জন
খোদায়ী তত্ত্ব তার রহে না গোপন
দীলের আয়না তার হয়ে যায় পাক সাফ
সদা আল্লার রাহে তার রহে মতি ॥
(চৌধুরী[২৯], পৃ: ১২৮)

এই কালেমার ছয়টি অর্থ হতে পারে :

১. لا اله معبود لا অর্থাৎ, আমার উপাস্য (মা'বুদ) এক আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ নেই।
২. لا اله مقصود لا অর্থাৎ, আমার জীবনের চরম পরম লক্ষ্য এক আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ নেই, অন্য কিছূই নেই।
৩. لا اله مطلوب অর্থাৎ, আমি যত কাজ করি, প্রতিটি কাজের আসল উদ্দেশ্য এক আল্লাহকে পাওয়া।
৪. لا اله محبوب অর্থাৎ, আমার আসল ভালবাসার পাত্র প্রেমাস্পদ আর কেউয়ই নেই এক আল্লাহ ছাড়া।
৫. لا اله حاكم অর্থাৎ, আমার উপর হুকুমজারি করনেওয়ালা আর কেউ নেই এক আল্লাহ ছাড়া।
৬. لا اله موجود অর্থাৎ আসল অস্তিত্ব এক আল্লাহরই অস্তিত্ব, আমার অস্তিত্ব আমার যা কিছু গুন আছে বা হবে, সবই আল্লাহর দান, আমার নিজস্ব বলতে কিছুই নেই, আমি কিছুই না, আমার ম'বুদই আমার সব কিছু।(সরকার[৭২], পৃ: ৩০)

ইসলামের পূর্বের সকল নবি ও রাসুলগণ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহুর প্রচারক ছিলেন। ইসলাম সর্বশেষ সংস্করণ বিধায় এতে চূড়ান্ত উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে এবং তওহিদের মূল উৎস হিসাবে এটা গৃহীত হয়েছে। যুগে যুগে এ বাক্যটির সাথে নবিদের নাম যুক্ত হয়ে তাওহিদের মূলমন্ত্র উচ্চারিত হয়েছে। ইসলামে মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ যোগ হয়েছে। ইসলামের প্রথমিক অবস্থায় 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ একথাই ছিল মুসলিম হবার জন্য যথেষ্ট।

তাওহিদ চার প্রকার :

১. আল্লাহর নাম ও সিফাতে তাওহিদ।

২. রুবুবিয়াত বা প্রভুত্বের ক্ষেত্রে তাওহিদ।

৩. তাওহিদে উলুহিয়াহ বা উপাস্য গ্রহণে তাওহীদ (সরকার[৭২], পৃ: ৩১)

মহিমান্বিত আল্লাহর সত্তার (জাত) তিনটা স্তর, যথা ক. আহাদিয়াত : এ স্ড়রে তিনি অপনাতেই বিদ্যমান এবং অতি সূক্ষ্ম দরিয়ারূপে আছেন। এখানে তিনি একক ও অদ্বৈত। খ. ওহদাত : এ স্তরে তিনি তাঁর ইরাদা বা ইচ্ছা বা এশক থেকে নুর-ই-মুহাম্মদি সৃষ্টি করেন। গ. ওয়াহিদিয়াত : এ স্তরে নুর-ই মুহাম্মদিকে তিনি বিশ্বচরাচর সৃষ্টি সাথে আহমদ রূপে প্রকাশ করেন। এ প্রসঙ্গে নজরুল বলেন :

অহামদের ঐ পর্দা উঠিয়ে দেখ মন
আহাদ সেথায় বিরাজ করে হেরে গুণীজন
যে চিনতে পারে রয় না ঘরে হয় সে উদাসী
সে সকল ত্যাজি ভজে শুধু নবিজির চরণ ॥
(আমিন[৮], পৃ: ৩১)

শাহরিয়ার বলেন :

هنوز جلوه نداده است نور خود به تمامي
خدا به جلوه كند نور خود تمام محمد

(শাহরিয়ার[৬৬], ১ম খন্ড, পৃ: ৬৯)

উচ্চারণ ঃ

হানুয জালভা নাদা'দে আস্ত নুরে খোদ বে তামা'মী,
খোদা' বে জালভা কোনাদ নুরে খোদ তামা'মে মোহাম্মদ ॥

অর্থ ঃ

এখনো তার নুরের দ্যুতি পরিপূর্ণ ভাবে প্রষ্ফুটিত করেননি,
মোহাম্মদ (সাঃ) মাধ্যমেই খোদা তার নুরের পরিপূর্ণতা ঘটান ॥

মূলত মানুষের মুক্তির জন্য তিনটা শর্ত রয়েছে (১) তাওহিদে কায়েম বা প্রতিষ্টিত হওয়া, (২) বান্দা বা আব্দ হিসাবে ইবাদত করা (৩) সৃষ্টির সেবা বা কল্যাণকর কাজ আমলে সালেহা করা।

মানুষের মুক্তির প্রথম সোপান হলো তাওহিদে প্রতিষ্ঠিত হওয়া। তবে তাওহিদে প্রতিষ্ঠিত হওয়া সহজ বিষয় নয়। 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' বললেই তাওহিদে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায় না। শাহ সাইয়্যেদ আহমাদ কবীর রেফায়ী (রহঃ) বলেন : ' তোমরা সবকিছু থেকে পৃথক হয়ে খাঁটি তাওহিদবাদী হয়ে যাও। মহান আল্লাহ পাকের তাওহিদ আর্জনের লক্ষ্যে বস্তুর উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ না করাই হচ্ছে খাটি তাওহিদ। যখন তুমি ইয়া আল্লাহ বলে থাক তখন তুমি বুঝে নিবে, তাকে কেবলমাত্র ইসমে আযমের সাথে ডেকেছ। কিন্তু আল্লাহর আযমতের স্তর উপলব্ধি করে নয়। পবিত্র আল্লাহর ভালবাসাই হচ্ছে বড় সম্পদ।, মুরদার বস্তুর সাথে সর্বদা অন্তরকে লিপ্ত রাখাই হচ্ছে বড় দারিদ্রতা। সৃষ্টির প্রতি নির্ভরশীলতা হচ্ছে অন্তরের কঠিনতম একটা আবরণ। অথচ অন্তরই হচ্ছে আল্লাহর মারেফাতের আসল কেন্দ্রস্থল। (রেফায়ী[৬১], পৃ: ৬৩)

ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) বলেন : ' যে ব্যক্তি তার ব্যবস্থাপক আল্লাহর পরিচয় লাভ করতে রত হয় এবং কোন বস্তুর উপর তাঁর ব্যবস্থাপনা অভিযান স্থাপিত হয়ে পড়ে তবে সে মুশাব্বিহ[i]। আর যদি কেবল সত্তাহীনতায় পৌছে পরিতৃপ্ত হয়ে যায়, তবে সে মুঅত্তিল[ii]। আর যদি এমন কোন সত্তার উপর স্থাপিত হয়ে তাঁর অন্তর, এই সত্তার প্রকৃতি উদঘাটনে স্বীয় অপারগতা স্বীকার করে নেয়, তবে সে-ই প্রকৃত তাওহিদবাদী।(রেফায়ী[৬১], পৃ: ২৫) যেমন শাহরিয়ার বলছেন :

ناگه جمال توحيد! وانگه چراغ توفيق
الواح ديده شستند اشباح اشتباهي
افسون عشق باد و انفاس عشقبازان
باقي هر آنچه ديديم افسانه بود و واهي

(শাহরিয়ার[৬৬], ১ম খন্ড, পৃ: ৪২৮)

উচ্চারণ ঃ

না'গাহ জামা'লে তাওহীদ! ভা'নগাহ চেরা'গে তাওফীক্ব,
আলভাহ দীদেহ শোস্তান্দ আশবা'হে এশতেবা'হী।
আফসুনে এশক্ব বা'দ ভা আনফা'সে এশক্ববা'যা'ন,
বা'ক্বী হার অনচে দীদাম আফসা'নে বুদ ভা ভা'হী ॥

অর্থ ঃ

হঠাৎ করেই তাওহীদের সৌন্দর্য আর আমার সামর্থের প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত হলো
তাওহীদের ফলকের দৃষ্টিতে সকল ভ্রান্তির ছায়া দূরভিত হলো
প্রেমের যাদুময়তা আর প্রেমিকদের উচ্ছাস থেকে যাক
অন্য যা কিছুই দেখেছি, সব ছিল কল্পনা আর ভিত্তিহীন ॥

এ কালেমার অনুসারীদের মধ্যে তিনটি স্বতন্ত্র পর্যায় লক্ষ্য করা যায় – (১) যারা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' বলে, (২) যারা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' জানে, (৩) যারা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহুতে প্রতিষ্ঠিত। সুফি সাধকগণ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' দ্বারা কালেমার মৌখিক উচ্চারণ, এটা জানা দ্বারা এর নিগূঢ়তত্ত্ব অবগত হওয়া এবং এটায় কায়েম হওয়া দ্বারা আল্লাহর সত্ত্বায় ফানা হওয়া বুঝে থাকেন। এ বিষয়ে ক'টি হাদিস বিশেষভাবে উলেণ্ঢখযোগ্য যাতে রাসুল (সঃ) এরশাদ করেছেন :

১. 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' আমার দূর্গ। যে ব্যক্তি এটা বলে সে আমার দূর্গে প্রবেশ করলো এবং আজাব থেকে মুক্তি পেল।
২. যে ব্যক্তি একবার 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' আমল করবে সে বেহেশতে দাখিল হবে।
৩. ঈমানের ছোট দরজা হলো দুনিয় ত্যাগ করা এবং শ্রেষ্টতম দরজা হলো 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহুতে কায়েম হওয়া।

[i] সৃষ্টির গুনাবলীকে আলণ্ঢাহর উপর যারা প্রয়োগ করে তাদেরকে মুশাব্বিহ বলা হয়। যেমন, একথা বলা যেঃ মানুষের যেমন হাত পা আছে, ঠিক সেইরূপ আলণ্ঢাহ পাকেরও আছে ইত্যাদি।

[ii] আলণ্ঢাহর জন্য উপযুক্ত গুণরাজীকে আলণ্ঢাহর জন্য যারা স্বীকার না করে তাদেরকে মুঅত্তিল বলা হয়। যেমনঃ আ্লাহর কুদরত ও শক্তি ইত্যাদি।

৪. একজন সাহাবি আরজ করলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' একবার আমল করলেই যদি বেহেশত লাভ হয় তবে অন্যান্য ইবাদত ও রিয়াজতের প্রয়োজন কী? উত্তরে রাসুল (সঃ) বললেন, ' এ কালেমা যদি কেউ হাজার বার পাঠ করে, অথচ এর কায়দা বা মূলতত্ত্বে জ্ঞান লাভ করে না, সে কাফের' (হোসাইন[৭৭], পৃ: ১৩৪)

'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' বলা ও জানা এবং তাতে আমল অভ্যাসে বেহেশত লাভ করা যেতে পারে, কিন্তু ঈমানের পূর্ণতার জন্য 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহুতে কায়েম হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত উক্ত হাদিসে প্রদান করা হয়েছে। একজন সুফির কাছে বেহেশতের আকর্ষণের চেয়ে ঈমানের পূর্ণতা অধিক লোভনীয়। সে কারণে তাওহিদে কায়েম হওয়ার ধারণা সুফিদের কাছে প্রাধাণ্য পেয়েছে। মূলত ঃ এলমে তাসাউফের অনুস্বারীদের মুখ্য লক্ষ্য হচ্ছে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহুতে কায়েম হওয়া। এ স্তরে তাঁরা আল্লাহর একক সার্বভৌম স্তার উপলব্ধি থেকে সাক্ষ্য বাক্যর (কালেমা শাহাদত) অঙ্গীকার পূর্ণ করেন। (চিশতি[২৭], পৃ: ৪২৪) শাহরিয়ার বলেন :

باز در خم فلک بادة وحدت صافي است
سربرآرید حریفان که سبویي بزنیم

(শাহরিয়ার[৬৬], ১ম খন্ড, পৃ: ৩৩১)

উচ্চারণ ঃ

বা'য দার খামে ফালাক্ব বা'দেয়ে ভহদাত সা'ফী আস্ত,
সার বার অ'রিদ হারিফা'ন কে সাবুয়ি বেযানিম ॥

অর্থ ঃ

আবারো আকাশের কিনারয় উদ্ভাসিত হয়েছে একত্ববাদের শরাব,
মদের পেয়ালা চালাতে প্রতিযোগিরা ছুটে আস ॥

আল্লাহর একত্ববাদ নিয়ে চিন্তার ক্ষেত্রে দার্শনিক ও তত্ত্বদর্শ সুফিদের চিন্তাদর্শনে 'ওয়াহদাতুল ওজুদ' ও 'ওয়াহদাতুশ শুহুদ' নিয়ে বিতর্কের জন্ম নেয়। ধর্মীয় দর্শনের ভাষায় ওয়াহদাতুল ওজুদ অর্থ সত্তার ঐক্য, ঐক্য নীতি, অদ্বৈতবাদ বা সর্বেশ্বরবাদ (panthesm)। ওয়াহদাতুল ওজুদ তত্ত্ব অনুযায়ী এ বিশ্বজগৎ আল্লাহ-সত্তাময়, আল্লাহ ব্যতীত দ্বিতীয় কোন অস্তিত্ব নেই। হাদিসে কুদসিতে আল্লাহ বলেন আমি গুপ্ত ভান্ডার ছিলাম নিজেকে জানার জন্য সৃষ্টিকে প্রকাশ করলাম। এতে বুঝা যায় যে, এ বিশ্বজগৎ আল্লাহর নাম ও গুনের প্রকাশ এবং আল্লাহ ও বিশ্বজগৎ অভিন্ন অর্থাৎ আল্লাহ নিজেই প্রকাশিত হয়েছেন বিশ্বজগত রূপে। আল্লাহ একমাত্র পরম সত্তা বা ওয়াজেবুল ওজুদ এবং বিশ্বজগৎ তাঁরই নাম ও গুণাবলীর প্রকাশ মাত্র। আল্লাহ অউয়াল, আখের, জাহের ও বাতেন- এ চারভাবেই বিদধমান। কাজেই আল্লাহ অনির্দিষ্ট আদি থেকে অনাদি ভবিষৎ অবধি বিচিত্র প্রকাশ্যসৃষ্টি (ওয়াহদাতুল ওজুদ) ও অসীম গুপ্ত রহস্যরূপে (ওয়াহদাতুল হকিকত) বিদ্যমান।

মুসলিম দর্শনে ওয়াহদাতুল ওজুদ সর্বপ্রথম প্রকাশ করেন বায়জিদ বোস্তামী। তিনি 'হামে উস্ত' (সবই সে) বলে সর্বেশ্বরবাদের গোড়াপত্তন করেন। এরপর তাঁর 'সোবহানী (মহিমা আমারই) ঘেষণা মুসলিম জাহানে আলোড়ণ সৃষ্টি করেছিল। তারপর ওয়াহদাতুল ওজুদ প্রকাশ করতে গিয়ে মনসুর হাল্লাজ বলেছিলেন, 'আনাল হক' (আমি সৃষ্টিশীল সত্য) এবং এ কারণে তাঁকে ফাঁসিকাষ্ঠে প্রাণ দিতে হয়েছে।

এরপর ওমর ইবনুল ফরিদ বলেছিলেন 'আনা হিয়া' (আমিই সে)। এসব সুফি সাধকগণ ওয়াহদাতুল ওজুদ অতি সংক্ষেপে প্রকাশ করলেও এর কোন দার্শনিক ব্যাখ্যা তারা প্রদান করেননি বলেই শরিয়তপন্থীগণের চাপের মুখে রাষ্ট্রীয় প্রশাসন তাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন প্রকার কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল। এরপর মহিউদ্দিন ইবনুল আরাবী তাঁর 'ফুসুসুল হিকাম' ও 'ফতুহাতুল মক্কিয়া' গ্রন্থে ওয়াহদাতুল ওজুদের বিস্তারিত দার্শনিক ব্যাখ্যা প্রদান করেন। কিন্তু তাঁর ধারণা জ্ঞানমূলক ও ধর্মীয় চেতনার 'মূল ঐক্যনীতি' ও ধমীয় চেতনার 'পরম সত্তা' বা আল্লাহর প্রকৃতি বুঝা দরকার। 'মূল ঐক্যনীতি' মানব সভ্যতার আদি থেকেই দার্শনিকগণ খুঁজে পেতে প্রয়াস চালান। গ্রিক পন্ডিত থেলিস (খ্রিষ্টপূর্ব ৬২৪-৫৪৮) পরম একত্বের সন্ধানে আত্মশক্তি নিয়োগ করে দেখতে পান যে, বিশ্বজগতের সব কিছুর পিছনে একটা কারণ রয়েছে। আবার সে কারণের আরেকটা কারণ রয়েছে। এভাবে কারণ অনুসন্ধান করে মূলের দিকে যতই যাওয়া যায় কারণের ব্যাখ্যা ততই কমে আসে। এতে তিনি মনে করেন যে, মূলে হয়তো একটা মাত্র কারণ পাওয়া যাবে যা থেকে বস্তুর উৎপত্তি আরম্ভ হয়েছে। তিনি পানিকে 'মূল কারণ' বলে উল্লেখ করেন। এমনি করে বিশ্বজগতের 'আদিকারণ অনুসন্ধানে আরো অনেকে আত্মনিয়েগ করেন। এনাকসিমান্ডার (খ্রিষ্টপূর্ব ৬১১-৫৪৭) অসিম অনির্দিষ্ট কিছু একটা, এনাকসিমেনিস (খ্রিষ্টপূর্ব ৫৮৮-৫২৪) 'বায়ূ' এম্পেডোকলস 'মাটি, পানি, বাতাস ও আগুন', ডেমোক্রিটাস 'অবিভাজ্য পরমাণু', বৃটিশ দার্শনিক লক, বার্কলে ও হিউম 'ধারণা ও সংবেদন' এর মূল ঐক্যের সন্ধান পান। বুদ্ধিবাদী দার্শনিকদের মধ্যে পেণ্ঢটো 'কল্যানের ধারণার মধ্যে' এরিষ্টোটল বিশুদ্ধ আকারের মধ্যে, স্পিনোজো পরম দ্রব্যের মধ্যে, হেগেল পরম ব্রহ্মের মধ্যে মূল ঐক্য দেখতে পান।

অপরপক্ষে পরম সত্তার ঐক্য ধর্মীয় চেতনার মূল কথা। পরম সত্তার সাথে মানুষ ও বিশ্বজগতের সম্পর্ক অনুধাবন করার প্রচেষ্টা ধর্মীয় চেতনার মধ্যে আছে। মানুষ পরম সত্তার সাথে সংযোগ স্থাপন করতে চায় এবং তাতে পূর্ণতা অর্জন করে সুখী হতে চায়, জ্ঞান অর্জন করে জ্ঞানী হতে চায়, প্রেমাস্পদরূপে সৌন্দর্য উপভোগ করে আনন্দ অনুভব করতে চায়। কিন্তু সে নিজ প্রকৃতির বাধার কারণে সহজে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। ফলে সে এমন একটা পরম সত্তাকে স্বীকার করে নেয় যিনি প্রভু, সর্বশক্তিমান, দয়ালু, দাতা, সৃষ্টিকর্তা, পরিচালনা কর্তা। তিনি সর্বজ্ঞানী, গুপ্ত ও ব্যক্ত, প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য এবং তিনি অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞানী। তিনি একমাত্র উপাস্য এবং তার কাছে প্রর্থনা করা যায়। তিনি এক, স্বয়ংসম্পূর্ণ ও সয়ম্ভু। ধর্মীয় চেতনার মূল ঐক্য বা পরম ঐক্যকে জগতের অন্তর্ব্যাপী সত্তা হিসাবে মনে করা হয়। পরমাত্মা বিশ্বজগৎ থেকে ভিন্ন নয় এবং বিশ্বজগৎ পরমাত্মা থেকে স্বতন্ত্র কিছু নয়।

ইবনুল আরাবীর ওয়াহদাতুল ওজুদ বা সত্তার ঐক্য বা অদ্বৈতবাদ বা সর্বেশ্ববাদ তার পূর্ববর্তী সকল ধারণার সংমিশ্রনে গড়ে উঠেছে। কিন্তু তিনি দার্শনিক ঐক্য ও ধর্মীয় ঐক্য অভিন্নরূপে দেখেছেন। বহুত্বের মাঝে একত্ব কিভাবে মিশে আছে তা ব্যাখ্যা করার জন্য ইবনুল আরাবী অনেক রূপকের সাহয্য গ্রহণ করেছেন। প্রথমেই তিনি দর্পণ ও পুতরূপের রূপ দ্বারা বলেন যে, এ বিশ্বচরাচরের প্রতিটি বস্তু এক একটা দর্পণ। পরম সত্তা এ দর্পণে তার প্রতিরূপ প্রকাশ করেন। দর্পণগুলো নিজস্ব প্রকৃতি অনসারে পরম সত্তার প্রতিরূপ নিজেদের মধ্যে বিভিন্ন রূপে ও আকারে প্রকাশ করে। এরপর তিনি দ্রব্য ও গুনের রূপক দ্বারা বলেন যে, দ্রব্যের মধ্যে গুন যেভাবে মিশে আছে বহুর মধ্যে এক সেভাবে মিশে আছে। আবার খাদ্য

যেভাবে দেহের সাথে মিশে যায় বহুও তেমনি একের সাথে সেভাবে মিশে যায়। গাণিতিক সংখ্যা একের উপমা দিয়ে তিনি বলেন যে, 'এক বহুর ভিত্তি'। এক না হলে কোন সংখ্যা বা বহুর উৎপত্তি অলীক ধারণা। একইভাবে তিনি একটা চক্রের কেন্দ্র বিন্দুর উপমাও প্রদান করেন। (চিশতি[২৭], পৃ: ১৫১)

খাজা মুঈনুদ্দি চিশতিও তাঁর বেশ ক'টি গজলে বৃত্তের কেন্দ্রবিন্দু ও কম্পাসের রূপক ব্যবহার করে ওয়াহদাতুল ওজুদ ব্যক্ত করেছেন। ইবনুল আরাবীর পর সকল দার্শনিক ও সুফি সাধকগণ ওয়হদ্তুল ওজুদের সমর্থন তাঁদের গ্রন্থ ও কাব্যে প্রকাশ করেছেন। আমীর খসরু বলেন :

من تو شدم تو من شدي من تن شدم تو جان شدي
تا كس نگويد بعد از اين من ديگرم تو ديگري

(চিশতি[২৭], পৃ: ১৫৩)

উচ্চারণ ঃ

মান তো শোদাম তো মান শোদী মান তান শোদাম তো জা'ন শোদী,
তা' কাস নাগোয়াদ বা-দ আয ইন মান দীগারাম তো দীগারী ॥

অর্থ :

আমি তুমি হলাম, তুমি আমি হলে, আমি দেহ হলাম, তুমি প্রাণ হলে,
এরপর যেন কেউ না বলতে পারে আমি একজন তুমি আরেকজন ॥

খাজা মৃঈনুদ্দিন চিশতি বলেন :

صفات و ذات چو از جدا نمي بينم
به هر چه من نگرم جز خدا نمي بينم

(চিশতি[২৭], পৃ: ২৫৮)

উচ্চারণ ঃ

সেফা'ত ও যা'ত চো আয হাম জোদা' নেমী বীনাম,
বে হারচে মী নেগারাম জোয খোদা' নেমী বীনাম ॥

অর্থ ঃ

যেহেতু জাত ও সেফাত একে অন্য থেকে পৃথক নয়,
যেদিকে তাকাই খোদা ভিন্ন কিছুই দেখি না ॥

শাহরিয়ারের কবিতায়ও وحدت الوجود এর প্রমান পাওয়া যায়। তিনি বলেন :

روشنايي كه به تاريكي شب گردانند
شمع در پرده و پروانة سرگردانند
خود بده درس محبت كه اديبان خرد
همه در مكتب توحيد تو سرگردانند

(শাহরিয়ার[৬৬], ১ম খন্ড, পৃ: ২১৮)

উচ্চারণ ঃ

রোশনা'য়ী কে বে তা'রীকিয়ে শাব গারদা'নান্দ,
শাম্ দার পারদে ভা পাভানেয়ে সারগারদা'নান্দ।

খোদ বেদে দারসে মোহাব্বাত কে আদিবা'নে খেরাদ,
হামে দার মাকতাবে তাওহিদে তো সারগারদা'নান্দ ॥

অর্থ ঃ

রাতের অন্ধকারে যে আলোকচ্ছটা লুকিয়ে থাকে,
প্রজাপতির পাখায় যে প্রদীপ ঘুড়ে বেড়ায়।
তুমি নিজেই ভালবাসার শিক্ষা আমদেরকে দাও,
সবাই তোমার তাওহীদের রাস্তাতেই ঘুরে বেড়াচ্ছে ॥

এর পাশাপাশি আরেকটি মতবাদ সুফি তাত্ত্বিক জগতে জন্মলাভ করে, যার নাম ওয়াহদাতুশ শুহুদ। নিজামুদ্দিন মাহবুবে এলাহির পর খাজা রোকনুদ্দিন সর্বপ্রথম প্রচার করেন যে, ওয়াহদাতুশ শুহুদ হলো আল্লাহ ও বিশ্বজগৎ দুটি পৃথক সত্তা। সৃষ্টি, স্রষ্টা থেকে আলাদা। কাজেই ওয়াহদাতুল ওজুদ সঠিক মতবাদ নয়। 'হামে উস্ত ' সঠিক নয়। তা হবে 'হামে আয উস্ত' অর্থাৎ সব কিছুই তাঁর থেকে। এরপর খাজা বাহাউদ্দিন নক্শবন্দ শহুদিয়া মতাদর্শ বিশেষ গুরুত্বের সাথে প্রচার করেন। তারপর মুজাদ্দিদ-ই-আলফেসানি ওয়াহদাতুল ওজুদ মতবাদকে ভীষণভাবে সমালোচনা করেন এবং শহুদিয়া মতবাদের সমর্থনে তাঁর যুক্তিবিন্যাস উপস্থাপণ করেন। তাঁর মতে, অতীন্দ্রিয় অনুভূতি,অভিজ্ঞতা, প্রত্যক্ষকরণ, যুক্তি, চিন্তা ও ধারণার অতীত। অহি বা এলহাম ব্যতীত তাঁর কোন কিছুই জানা সম্ভবপর নয়। তিনি সবকিছু 'নঞ' হলো সৃষ্টির মূল উৎস। আলফেসানি 'নঞ' বলতে মৃত্যু, অজ্ঞানতা, অক্ষমতা ইত্যাদিকে বুঝেছেন এবং 'নঞ' অবোধয়, অচিন্তনীয় ও অভাবনীয় এক গভীর রহস্যের তিমিরে আবৃত বলে আলফেসানি মনে করেছেন। তিনি বলেন যে, আল্লাহকে লাভ করার পন্থা কেবল এশক নয়- দাসত্বও একটা প্রকৃষ্ট পন্থা। আল্লাহর নৈকট্যের শেষ মোকাম দাসত্ব। আল্লাহর সাথে বান্দার কখনো মিলন হতে পারে না। স্রষ্টা মূল এবং বিশ্বজগৎ তার প্রতিবিম্ব। প্রতিবিম্ব কখনো মূল হতে পারে না।

মের্শেদ ও তার অনুসরণ :

'ইলমে এরফানিয়াত' শিক্ষার ক্ষেত্রে বিনা বাক্যে একজন মোর্শেদের অনুসরণের ব্যাপারে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। মাওলানা শাহ আব্দুল আযিয দেহলবি (রঃ) বলেছেন শরিয়তের ইমামাগণ ও তরিকতের পিরগণের মধ্যে একজনের অনুসরণ করা সাধারণ উপম্মতের পক্ষে ওয়াজেব, কেননা তারাই শরিয়তের তত্ত্ব ও তরিকতের নিগূঢ় মর্ম অবগত আছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন :

يا ايهاالذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين (আল-কোরআন, ৯:১১৯)

আর্থাৎ ঃ হে ঈমানদারগণ, আল্লাহকে ভয় কর, আর সত্যপরায়ণ লোকদের সঙ্গী হও।

আল্লাহ প্রাপ্তির পথ প্রদর্শকগণই সত্যপরায়ণ সম্প্রদায়। যদি তরিকান্বেষী তাদের প্রীতিভাজন ও সেবক শ্রেণীভুক্ত হতে পারে, তবে তাদের স্নেহ দীক্ষা প্রদান ও বেলায়েতের সাহায্যে سير الي الله পদ লাভে সামর্থ হবে। হজরত শায়েখ আকবর বলেছেন যদিও তুমি আজীবন সাধ্যসাধনা কর, অথচ যতক্ষন তোমার কার্য্যকলাপ পিরে কামেলের অভিপ্রায় মতে না হয়, ততক্ষন তোমার কামনা ত্যাগ সিদ্ধ হতে

পারে না। যদি তুমি এরকম ব্যক্তির সন্ধান পাও- যার ভক্তিতে তোমার অন্তর পরিপূর্ণ হয়, তবে তার সেবায় মনোনিবেশ কর এবং তার সমকক্ষে মৃততুল্য হয়ে থাক। (আমিন[৮], পৃ: ১৪৪-১৫৩)

'আল্লামা কুশাইরি' 'সা'দেকিনদের' ব্যাখ্যায় বলেছেন ঃ ''পূর্বের যামানার সা'দেকিন ছিলেন হযরত আবু বকর, উমর, উসমান ও আলী (রাঃ)। আর বর্তমান যামানার সা'দেকিন হলেন আল্লাহর ঐ সমস্থ ওলিগণ যারা আল্লাহর গোপন রহস্য জানেন। (কুশাইরী[২২], ৩য় খন্ড, পৃ: ১৮০)

আল্লাহ তায়ালা আরো ইরশাদ করেন :

اتبع سبيل من اناب الي (আল-কোরআন,৩১:১৫)

অর্থাৎঃ যাহারা আমার দিকে রুজু হয়, তাদের পথ অনুসরণ কর।

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা জারীর তাবারি বলেন :

اسلك طريق من تاب من شركه، ورجع إلى الإسلام، واتبع محمدا صلى الله عليه وسلم

.(তাবারী[৩৩], খন্ড ২০, প; ১৩৯)

অর্থাৎ ঃ তাদের পথ অনুস্বরণ কর যারা শিরক থেকে পবিত্রতা অর্জন করেছে এবং পরিপূর্ণভাবে ইসলামের পথে ফিরে এসেছে, আরো অনুস্বরণ কর মোহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর পথকে।

এই উভয় আয়াতেই আজ্ঞাবাচক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এতে বুঝা যায় যে, এই নির্দেশটি অবশ্য পালনীয়। শরীয়তের দৃষ্টিতে তা ওয়াজীব। বায়'য়াত হওয়া এবং মুর্শিদের কামিলের হাত গ্রহণ করা এমন একটি কাজ যার সম্পর্কে রাসূলে করীম সাঃ এবং সাহাবা–এ–কিরামের সাথে আরোপিত। কালামে পাকে এরশাদ করা হয়েছে :

ان الذين يبايعونک انما يبايعون الله (কোরআন, ৪৮: ১০)

অর্থাৎ ঃ হে নবী, আপনার হতে যারা বায়াত করে তারা মূলত : আল্লাহর হাতেই বায়'আত করে।

আরো এরশাদ হচ্ছে :

اذ يبايعونک تحت الشجره(কোরআন, ৪৮: ১৮)

অর্থাঃ বৃক্ষের নিজে যখন তারা আপনার হতে বায়'আত করতেছিলেন

রাসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেছেন 'উম্মতের তুলনায় নবীর মর্যাদা যেমন, শায়খ ও মুর্শিদের মর্যাদাও তাহার সম্প্রদায়ে তেমন' এই বিষয়ে বুযুর্গান দ্বীনের অভিমত হল, যে ব্যক্তি আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সাহচর্য লাভের আগ্রহ করে তার সূফি, ওলি আল্লাহগণের খেদমতে হাযিরা দেওয়া উচিত। শায়খগণ যেহেতু নায়েবে–নবীর মর্যাদায় অভিষিক্ত, সুতরাং তাদের খেদমত করাও একান্ত জরুরী। যে ব্যক্তি শায়েখে কামেলের খেদমতে নিজের সময় কাটাবে এবং তাকে নিজের উপর পূর্ণ অধিকার দিয়ে দিবে, তার সম্পর্কে দৃঢ় আশা করা যায় যে, অবশ্যই সে স্বীয় উদ্দেশ্যে সফলকাম হতে পারবে। (মক্কী[৫৪], পৃ: ১৪)

তবে পিরে কামেল হওয়ার জন্য বেলায়েত আর্জন করা শর্ত। আল্লাহ তায়ালা কালামে পাকে এরশাদ করেছেন :

الا ان اولياءالله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين امنوا وكانو يتقون. لهم البشري في الحيوة الدنيا وفي الاخرة. لا تبديل لكلمات الله. ذالک هو الفوزالعظيم.(কোরআন, ১০:৬২)

অর্থাৎ জেনে রাখ, নিশ্চয়ই যারা আল্লাহর ওলি, তাদের আদৌ কোন ভয় বা চিন্তা নাই। যারা ঈমানদার হয়েছেন এবং তাকওয়া অবলম্বন করেছেন, তাদের জন্য দুনিয়া এবং আখেরাতের উভয় জাহানেই সুসংবাদ। আল্লাহর বাক্য অপরিবর্তনীয়, উহাই সর্বশ্রেষ্ঠ সফলতা।

এই আয়াতের দ্বারা স্পষ্ট বোঝা যায় যে , বেলায়েত হাসিল হয় দুইটি জিনিসের দ্বারা, প্রথম 'ঈমান' এবং দ্বিতীয় 'তাকওয়া'। অতএব যত বেশী বা কম ঈমান এবং তাকওয়া হবে ততই বড় বা ছোট বেলায়েত হাছিল হবে। যদি কম দর্জার ঈমান ও কম দর্জার তাকওয়া হয়, তাহলে কম দর্জার বেলায়েত হাছিল হবে। এই দর্জার বেলায়েতকে আম বা সাধারণ বেলায়েত বলে। আর যদি বড় দর্জার ঈমান এবং বড় দর্জার তাকওয়া হয়, তবে বড় দর্জার বেলায়েত হাছিল হবে। এই দর্জার বেলয়েত যার হাছিল থাকে তাকে এস্তেলাহি ভাষায় 'ওলি' বলে। (ফরিদপুরী[৪৩], পৃ: ৮৪)

শাহরিয়ারের গযলে মের্শেদের অনুসরণের ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। তিনি বলছেন :

به سالکان خرابات مژده باد که دوش
ز پرده دار شنیدم که پیر می آید

(শাহরিয়ার[৬৬], ১ম খন্ড, পৃ: ২৪৪)

উচ্চারণ ঃ

বে সা'লেকা'নে খারা'বা'ত মোজ্বদে বা'দ কে দূশ
যে পারদে দা'র শেনীদাম কে পীর মি অ'য়াদ ॥

অর্থ ঃ

শুড়িখানার সালেকদের জন্য এই সু সংবাদ বয়ে যাক যে গতরাতে
পর্দার আড়াল থেকে শুনেছি যে পির আসছে ॥

শাহরিয়ার এখানে পীর শব্দটি ব্যবহার করেছেন, যার শাব্দিক অর্থ হলো বৃদ্ধ বা মুরুব্বি। প্রচলিত পরিভাষায় তরীকার পথে যিনি দিকনির্দেশনা দিয়ে থাকেন তাবে পীর বলা হয়। যদিও পবিত্র কোরআনে হুবুহু পির শব্দটি খুজে পাওয়া যায় না তবে এর প্রতিশব্দ হিসেবে আল্লাহ তায়াল কোরআনে اولى لا مر منكم، من اناب الي، صالحين، صادقين প্রভৃতি শব্দ সমূহ ব্যবহার করেছেন। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলছেন :

اطيع الله و اطيع الرسول و اولي الا مر منكم (কোরআন, ৪:৫৯)

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনে কাসির বলেন এখানে একজন ফকিহ ও আলেমে দ্বীনের অনুস্বরণের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। তিনি বলেন :

وقال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: { وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ } يعني: أهل الفقه والدين. وكذا قال مجاهد، وعطاء، والحسن البصري، وأبو العالية: { وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ } يعني: العلماء

(কাসির[১৯], ২য় খন্ড, পৃ:৩৪২-৩৪৭)

তাঁর মতের পক্ষে নিম্নোক্ত হাদিসগুলো উপস্থাপন করেন :

وعن ابن عباس، رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من رأى من أميره شيئًا فكرهه فليصبر؛ فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة جاهلية". أخرجاه

صحيح البخاري برقم (7143)، وصحيح مسلم برقم (1849)

وعن ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من خلع يدا من طاعة، لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية". رواه مسلم برقم (1851).

অর্থাৎ : হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূলে পাক (সাঃ) বলেছেন যে ব্যক্তি তার নেতার মধ্যে খারাপ কিছু দেখে সে যেন সেটিকে অপছন্দ করে এবং তার নেতার প্রতি ধৈর্য্য ধারণ করে। কারণ যে ব্যক্তি তার দলেন মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করবে তার জাহেলি মৃত্যু হবে। সহিহ বোখারি শরিফ হাদিস নং ৭১৪৩, সহিহ মুসলিম হাদিস নং ১৮৪৯।

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন : আমি রাসূলে পাক (সাঃ) কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আনুগত্য থেকে তার হাতকে সরিয়ে নিবে কেয়ামতের ময়দানে আল্লাহ তাকে এমন সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করবেন যাদের মুক্তির কোন দলিদ থাকবেনা। আর যে ব্যক্তি তার কাধে বয়াতের দায়ভার না নিয়ে মৃত্যু বরণ করবে তার যাহেলি মৃত্যু হবে। সহিহ মুসলিম হাদিস নং ১৮৫১

"আল্লাহ প্রাপ্তির পথ প্রদর্শকগণই সত্যপরায়ণ সম্প্রদায়। যদি তরিকতান্বেষী তাঁহাদের প্রীতিভাজন ও সেবক শ্রেণীভুক্ত হইতে পারে, তবে তাঁহাদের সে দীক্ষা প্রদান ও বেলায়েতের সাহায্যে ছায়ের ইলাল্লাহ পদ লাভে এবং আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত সমস্ত জগতের প্রেম ত্যাগে সমর্থ হইবে। হজরত শায়েখ আকবর (কাঃ) বলিয়াছেন, যদিও তুমি আজীবন সাধ্যসাধনা কর, তথচ যতক্ষণ তোমার কামনা ত্যাগ সিদ্ধ হইতে পারে না। যদি তুমি এরূপ ব্যক্তির সন্ধান পাও যাহার ভক্তিতে তোমার অন্তর পরিপূর্ণ হয়, তবে তাঁর সেবায় মনোনিবেশ কর এবং তাঁর সমক্ষে মৃততুল্য হইয়া থাক। তাঁর সমক্ষে তুমি নিজে কোন কার্যের ব্যবস্থা করবে না, তিনি যেরূপ ইচ্ছা করিবেন, সেইরূপ তোমাকে পরিচালনা করবেন। তুমি সৌভাগ্যবান, তাঁর আদেশ নিষেধ পালনকারী হয়ে জীবন ধারণ কর। যদি তিনি তোমাকে কোন পেশা করতে আদেশ প্রদান করেন, তবে তুমি স্বীয় কামনা বর্জিত হয়ে তাঁর আদেশে পেশা অবলম্বন কর। আর যদি তিনি তোমাকে নিরবলম্বন ভাবে বসতে বলেন, তবে তুমি বাসনা রহিত হয়ে তাই কর; কেননা তিনি তোমার হিতের সম্বন্ধে অধিকতর অভিজ্ঞ। হে পুত্র! তুমি এরূপ পীরের অনুসন্ধানে তৎপর হও-যিনি তোমার পথ প্রদর্শন করেন এবং তোমার দুশ্চিন্তা নিবারণ করেন তা হলে তুমি কামেল (সিদ্ধ পুরুষ) হইতে পারিবে।"(আমিন[৮], পৃ: ১৪৪-১৪৯)

মাওলানা শাহ আবদুল আজীজ দেহলবী ছাহেব বলেছেন : আমার পিতামহ মাওলানা শাহ আবদুর রহীম ছাহেব বর্ণনা করেছেন যে, উপরোক্ত আয়াতের প্রথমাংশে ঈমানের প্রতি লক্ষ্য করা হয়েছে। তৎপরে আল্লাহ তায়ালার ভয় করতে বলে, জেহাদ ইত্যাদি যাবতীয় সৎকার্য্যের প্রতি লক্ষ্য করা হয়েছে।

তৎপর মুক্তি প্রাপ্তির কথা আছে, এটা আল্লাহ-প্রাপ্তি ও মায়ারেফাতের প্রতি লক্ষ্য করা হয়েছে। মোর্শেদ নিশ্চয় আল্লাহ-প্রাপ্তির পথের অবলম্বন স্বরূপ। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন :

يايها الذيـ ا اتقوالله وابتغوا اليه الوسيله و جاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون

অর্থাৎ ঃ "হে বিশ্বাসিগণ, তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় কর তাঁর দিকে পৌছাতে মধ্যস্থতা অন্বেষণ কর এবং তাঁর পথে সাধ্য সাধনা কর।

তরীকতপন্থীগণ বলেন, উক্ত আয়াতে তরীকতের প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে এবং মধ্যস্থের মর্ম তরিকতের পীর গ্রহণ করেছেন। প্রকৃত মুক্তিলাভের জন্য সাধ্য সাধনা করার আগে মোর্শেদ অন্বেষণ করা আবশ্যক। মোর্শেদ ব্যতীত আল্বলাহ প্রাপ্তি দুরূহ ব্যাপার, এটাই আল্লাহ তায়ালার প্রচলিত বিধান। এক্ষেত্রে যিনি কোন প্রকারেই শরীয়তের বিরুদ্ধাচরণ না করেন এবং কোরআন ও হাদীছের অনুসরণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ থাকেন তাঁকেই পথপ্রদর্শক মোর্শেদরূপে গ্রহণ করা আবশ্যক, মোর্শেদ যা শরীয়ত অনুযায়ী যা বলেন, তা সর্বান্তকরণে পালন করবে, তাহার আদেশ মোবাহ কার্যকেও আবশ্য পালনীয় ধারণা করবে, কিন্তু শরীযতের বিরুদ্ধে যা বলেন, কখনও তার অনুসরণ করিবে না, বরং এর প্রতিবাদ করবে।(আমিন[৮], পৃ: ১৪৪-১৪৯)

হজরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

"আল্লাহ তায়ালার আদেশ লঙ্ঘন পূর্বক কোন মনুষ্যের অনুসরণ করা সিদ্ধ নহে।" অবশ্য মোরশেদকে অন্তরের সহিত এরূপ ভক্তি করিবে যে, তাঁহার সন্তোষ ও মনোস্তুষ্টি লাভের জন্য আপনার প্রাণ ও অর্থ নিয়োগ করিবে। তাঁহার সন্তোষ লাভ অপেক্ষা জগতের কোন বস্তুকে ধিকতর প্রীতিজনক বুঝিবে না, কেননা, পীরের দ্বারা যে উপকার লাভ হয়, তাহা জগতের অন্যান্য লাভ অপেক্ষা বহু সহস্র গুণে শ্রেষ্ঠতর। মোর্শেদকে এত অধিক ভক্তি করাও নিষিদ্ধ-যাহাতে আল্লাহ ও তাঁহার রছুলের বিরুদ্ধাচরণ করা হয়। এরূপ ভক্তি করিলে আল্লাহ তায়ালার দরবার হইতে দূরীভূত হইতে হয়। আল্লাহ তায়ালার ভক্তি ও হক সমস্ত ভক্তি ও হকের মূল। তাঁহার ভক্তি ও হকের বিরুদ্ধে যে কোন ভক্তি ও হক হউক না কেন, উহা আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত হইবার মূল কারণ। যদি মুরীদ হওয়ার পওের মর্শিদের মধ্যে কোন শরীয়ত বিরুদ্ধ মত লক্ষিত হয়, তবে তাঁহাকে সদুপদেশ দতিে হইবে এবং আল্লাহ তায়ালার দরবারে তাঁহার বায়য়াত ছিন্ন করিবে এওবং তাঁহাকে মোর্শেদ বলিয়া ধারণা করিবে না। (আমিন[৮], পৃ: ১৪৪-১৪৯)

হজরত মোজাদ্দেদ ছাহেব উপরোক্ত হাদিস উল্লেখ করে বলেছেন যে, উহা মধ্যস্থ মোর্শেদকে বলা হইয়াছে। মাওলানা শাহ আবদুল আজীজ দেহলবি (রঃ) স্বীয় তফসীরে লিখেছেন যে, শরীয়তের ইমামগণ ও তরীকতের পীরগনের মধ্যে একজনের অনুসরণ করা সাধারণ উম্মতের পক্ষে ওয়াজেব, কেননা, তাঁহারাই শরীয়তের তত্ত্ব ও তরীকতের নিগূঢ় মর্ম অবগত হয়েছেন।

কোরআন শরিফের সূরা ইউনুছ;-

الا ان اولياءالله لا خوف عليهم ولاهم يحزنون. الذين امنوا وكانوا يتقون. لهم البشري في الحوه الدنيا و في الاخره (কোরআন, ১০:৬২)

অর্থাৎ ঃ"সাবধান! নিশ্চয় আল্লাহ-প্রেমিকদিগের (ওলিআল্লাহগণের) উপর কোন আতঙ্ক (উপস্থিত) হইবে না এবং তাহারা ভীতবিহ্বল হইবেন না, তাঁহারা (ধর্মের উপর) বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলেন এবং ধর্মভীরুতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন (পরহেজগারি) করিতেন। ইহজগতে ও পরলোকে তাঁহদের জন্য শুভ সংবাদ।"

এই প্রসঙ্গে তাফসিরে আলুসিতে বলা হয়েছে :

والأولياء جمع ولي من الولي بمعنى القرب والدنو يقال : تباعد بعد ولي أي قرب ، والمراد بهم خلص المؤمنين لقربهم الروحاني منه سبحانه ، قيل : والمعنى لا خوف عليه من لحوق مكروه ولا هم يحزنون من فوات مطلوب في جميع الأوقات أي لا يعتريهم ما يوجب ذلك أصلاً لا أنه يعتريهم لكنهم لا يخافون ولا يحزنون ولا أنه لا يعتريهم خوف وحزن أصلاً بل يستمرون على النشاط والسرور .

(আলুসি[১১], খন্ড ৮ পৃ: ৫০)

অর্থাৎ ঃ আউলিয়া শব্দটি ওলী শব্দের বহুবচন। এর অর্থ হলো নৈকট্য লাভ করা বা বন্ধুত্ব অর্জন করা। আরবিতে একটি কথা বলা হয় 'তাবাআদ বা'দা ওলী বা নৈকট্যের পর দূরত্ব আসে, অর্থাৎ এর অর্থ হলো নৈকট্য। উক্ত আয়াতে এই শব্দ দ্বারা মু'মিনদের নিষ্ঠতা ও আল্লাহর সাথে তাদের রুহানি সম্পর্ক স্থাপনের কথা বলা হয়েছে। আর তাদের কোন ভয়ও নাই দ্বার দুরিয়াতে খারাপ কোনকিছুর সাথে সম্পৃক্ত না হওয়ার কথা এবং তাদের কোনও চিন্তাও নাই দ্বারা আখেরাতে কোন বিপদাপদে পতিত না হওয়ার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থাৎ সেই মূহুর্তে তারা কোন ভীত সন্ত্রস্ত হবেনা বরং তারা অনন্দ ফূর্তিতে সেখানে অবস্থান করবে।

মূলত ঃ এই আয়াতে ওলী আল্লাহগণের উচ্চপদের কথা উল্লিখিত হয়েছে এবং প্রমাণিত হইয়েছে যে ধার্মিক পরহেজগার ব্যতীত কেহ ওলী আল্লাহ নামের উপযুক্ত নন।

সহিহ বোখারি হইতে নিম্নোক্তহাদীছটি উদ্ধৃত হয়েছে যে :

''আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আমার কোন ওলির সহিত শত্রুতা ভাব পোষণ করে, নিশ্চয় আমি তাহার সহিত যুদ্ধের ঘোষণা করিয়াছি। ফরজ কার্য প্রীতিজনক আমার নিকট , এরূপ কোন নফল কার্য যেমন নহেজ। উক্ত ফরজ কার্য্য সম্পাদনে আমার সেবক যেমন আমার নৈকট্য লাভে সক্ষম হয়, এরূপ অন্য কোন কার্যে নৈকঠ্য লাভকরিতে পারে না। আমার সেবক নফল কার্যসমূহ দ্বারা অবিরত আমার নৈকট্য লাভ করিতে থাকে, এমন কি আমি তাহাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করি এবং যে সময় আমি তাঁহাকে বন্দুরূপে গ্রহণ করি, সেই সময় তাঁহার চক্ষু, কর্ণ, হস্ত ও পদ আমার অপ্রীতিকর কার্যে পরিচালিত হয় না- অর্থাৎ তাঁহার কর্ণ আমার অপ্রীতিকর শব্দ শ্রবণ করে না, তাঁহার চক্ষু অপ্রীতিকর বস্তু স্পর্শ করে না এবং তাঁহার পদ অপ্রীতিকর পথে গমন করে না।" (মানিরী[৫০], পৃ: ৫০-৮২)

ছহীহ মুসলিম হতে এই হাদীছটি উদ্ধৃত হয়েছে :

"হজরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা যে সময় কোন লোককে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেন, সেই সময় তিন হজরত জিব্রাইল (আঃ) কে ডাকিয়া বলেন, নিশ্চয় আমি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিয়াছি, তুমিও তাহাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ পূর্ব্বক আছমানে ঘোষণা করতঃ (অকাশ স্থিত ফেরেশতাগণকে) বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা অমুক ব্যক্তিকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেন-তৎপরে জগদ্বাসীদের হৃদয়ে তাঁহার ভক্তি নিক্ষিপ্ত হয়- অর্থাৎ সেই সময় জগদ্বাসিগণ তাঁহাকে ভক্তি ও সম্মান করিতে থাকেন। (মানিরী[৫০], পৃ: ৫০-৮২)

উক্ত হাদীছগুলি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যিনি ওলি আল্লাহ তিনি সম্পূর্ণরূপে শরীয়তের অনুসরণ করে থাকেন, এরাই ওলিত্বের প্রথম লক্ষণ। দ্বিতীয়ত, আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হতে সাধারণ লোকের হৃদয়ে তাঁর ভক্তি নিক্ষিপ্ত হয়। তৃতীয়ত, তাঁর কাছে উপস্থিত হলে, আল্লাহ তায়ালার প্রেম বর্দ্ধিত হয় ও অন্তর আল্লাহর তায়ালার ধ্যানে নিমগ্ন হয়। (মানিরী[৫০], পৃ: ৫০-৮২)

ছহীহ মুসলিমের এই হাদীছটি বর্ণিত আছে :

"হজরত হাঞ্জালা (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি হজরত আবুবকর (রাঃ) সহ হজরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলাম, হজরত, আমি কপট হইয়া গিয়াছি, তৎশ্রবণে হুজুর সাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলিলেন : ইহা কিরূপ কথা? তদুত্তরে আমি বলিলাম, হুজুর (যে সময়) আমরা আপনার নিকট ইপস্থিত থাকি, আপনি আমাদিগকে বেহেশত ও দোজখের বিষয় বর্ণনা করেন, তখন যেন আমরা উহা স্বচক্ষে দর্শন করি, তৎপরে যে সময় আমরা আপনার নিকট হইতে বহির্গত হই, সেই সেই সময় আমরা স্ত্রী, পুত্র-কন্যা ও ভূমি সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করিতে নিমগ্ন হইয়া (পরকালকে) একেবারে ভুলিয়া যাই। তৎশ্রবণে হজরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলিলেন, আমার প্রাণ যে আল্লাহ তায়ালার আয়ত্ত্বাধীনে আছে, তাঁহার শপথ করিয়া বলিতেছি, যদি তোমরা অবরত আমার নিকট জেকর ও পরকালের ধেয়ানে নিমগ্ন থাকিবে, তবে ফেরেশতাগণ তোমাদের শয্যা ও পতে তোমাদের হস্ত চুম্বন করিতেন, কিন্তু হে হাঞ্জালা, এক সময় (আমার নিকট পরকালের ধ্যানে নিমগ্ন থাক) এবং অন্য সময় (পার্থিব কার্যে লিপ্ত থাক)।"(মানিরী[৫০], পৃ: ৫০-৮২)

উপরোক্ত হাদীসগুলো দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, পির মোর্শেদের খেদমতে অল্প সময় উপস্থিত থেকে যেরকম আত্মিক উন্নতি করতে পারে, তাঁর অনুপস্থিতিতে হাজার সাধনা করেও তদ্রুপ সেরকম উন্নতি করতে পারেনা। ঐ সময় পির ও মুরিদের মধ্যে এমন সুদৃঢ় সম্পর্ক স্থাপিত হয় যে, বিনা চেষ্টায় অবিরতভাবে মুরিদের অন্তর, পীরের প্রেমে পরিপূর্ণ হতে থাকে। (দেহলবী[৩৮], পৃ: ৫৮-৫৯)

(তরীকত কার্যে) অন্য যে, বিষয়ই হউক না কেন (পির কামেলের) সঙ্গ লাভ করার তুল্য কিছুই হইতে পারে না। দৃষ্ঠান্ত স্বরূপ ইহা পেশ করা যাইতে পারে যে, ছাহাবা শ্রেণী হজরত নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লম এর সঙ্গ লাভ করিবার জন্য পয়গম্বরগণ ব্যতীত সমস্ত জগদ্বাসী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম পদ লাভ করিয়াছিলেন হজরত ওয়ায়েছ কারানি (রাঃ) ও খলিফা হজরত ওমর বিন আবদুল আজিজ (রাঃ) অতি উচ্চ পদস্থ ও বহু গুণসম্পন্ন হইলেও হজরত নবি করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সঙ্গ লাভ করিতে পারেন নাই বিধায় কোন ছাহাবারাই তুল্য পদ প্রাপ্ত হন নাই। (আমিন[৮], পৃ: ১৪৪-১৪৯)

Dhaka University Institutional Repository

শাহরিয়ার তার জীবনে একজন ডঃ সাকাফি নামক একজন পিরকে অনস্বরণ করেছেন এবং দীর্ঘ একটি সময় তার শিক্ষা-দীক্ষা অনুযায়ী জীবনের বড় একটি সময় ব্যয় করেন। (বিস্তারিত, ১১১-১১৬) ডঃ সাকফি ছাড়াও কবি হাফেজ শিরাজীকে তার পীর হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলছেন :

به نقش خواجه ما بین و شاه بو اسحق
که پادشه ادب از پیر ما نگهدار

http//www.sid.ir.com/

উচ্চারণ ঃ

বে নাক্বশে খা'জায়ে মা' বিন ভা শাহ বু এসহাক্ব,
কে পাদশা'হে আদব আয পীরে মা' নেগাহদা'র ॥

অর্থ ঃ

আমদের খাজা ও আবু ইসহাকের কর্মকান্ড দেখ,
সাহিত্যের বাদশা আমদের পিরের প্রহরী ॥

অনুরূপভাবে হযরত খিজির (আঃ) কেও পথহারা মানুষের জন্য প্রকৃত মোর্শেদ হিসেবে জেনেছেন। তিনি বলছেন :

تشنه ام تشنه، خضر راهم ده
تا به سرچشمة بقا بروم

(শাহরিয়ার[৬৬], ১ম খন্ড, পৃ: ৩২১)

উচ্চারণ ঃ

তেশনে আম তেশনে, খিজির রা'হাম দে,
তা বে সারচাশমেয়ে বাক্বা বেরাভাম ॥

অর্থ ঃ

তৃষ্ণার্ত আমি তৃষ্ণার্ত, খিজির আমকে পথ দেখাও,
যাতে করে আমি বাকার মূল তত্ত্বে পৌছাতে পারি ॥

ফাকর বা অমুখাপেক্ষিতা :

প্রচলিত ভাষায় যার কোন সহায় সম্বল থাকে না ফকির বলা হয়। কিন্তু এলমে মারেফাতের অর্থে ফকিরী একটি মাকাম বা অবস্থার নাম। সে অবস্থাটি হলো দুনিয়া থেকে সম্পূর্ণ অমুখাপেক্ষি হয়ে একমাত্র আল্লাহর মুখাপেক্ষি হওয়া। শামসুল হক ফরিদপুরি (রহঃ) বলেন :

মানুষের যাহের বাতেন উভয়কে দুরুস্ত করার নাম ফকিরী বা তাছাওওফ । যাহেরকে দুরুস্ত করার অর্থ এই যে, নামায রোযা ইত্যাদি যে সব আমল যাহেরি শরীরের দ্বারা করিতে হয় এবং করা জরুরী সেই সব সুন্দররূপে করিবে । বাতেনকে দুরস্ত করার অর্থ এই যে, দেলোর মধ্যে খাঁটিভাবে ইসলামের আকীদা

রাখিবে এবং যাবতীয় সদগুণ দ্বারা দেলকে সুসজ্জিত করিয়া রাখিবে। ফকিরীর দুইটি দর্জা, প্রথম দর্জা বা নিু শ্রেণীর ফকিরি। এই দর্জাকে বেলায়েতে-আম্মা বলে। অর্থাৎ প্রত্যেক মুমিনেরই এই দর্জা হাছেল করা ফরয। দ্বিতীয় দর্জাকে বেলায়েতে খা-চ্ছা বলে। সকলের এই দর্জা হাছেল থাকে না, শুধু বুগুর্গরাই হাছেল করিয়া থাকেন। (ফরিদপুরী[৪৩], পৃ: ৫-৭)

প্রথম দর্জা হাছেল করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয। এই দর্জা হাছেল করতে গেলে দু'টি বিষয় আবশ্যক। প্রথমতঃ- 'ব কদরে জরুরত' অর্থাৎ নিজের হেদায়তের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ দ্বীনী-এলম শিক্ষা করা। কিতাব পড়েই হোক, আর আলেমদের কাছে থেকেই হোক বা তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেই হোক। দ্বিতীয়তঃ, যে রকম মছআলা শেখা হবে সেরকম কাজ করার জন্য পাকা এরাদা করতে হবে। নফসের খাহেশের কারণে বা লোকে মন্দ বলবে এই ভয়ে কখনও আমল করা যাবে না।

(ফরিদপুরী[৪৩], পৃ: ৫-৭)

যেমন আল্লাহ তায়ালা কোরআনে পাকে বলছেন :

يا ايها الناس انتم الفقراء الي والله هو الغني الحميد

অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ তোমরা আল্লাহর কাছে মুখাপেক্ষী, আর আল্লাহ অত্যন্ত প্রসংশিত ও অমুখাপেক্ষী সত্তা। এই আয়াতের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে শাহরিয়ার বলছেন :

سرفرازي جاويد در كلاه درويشي است
تا فرو نيارد كس سر به تاج سلطاني

(শাহরিয়ার[৬৬], ১ম খন্ড, পৃ: ৪১৩)

উচ্চারণ ঃ

সারফারা'যিয়ে জা'ভিদ দার কোলা'হে দারভিশি আস্ত
তা' ফোরু নায়া'রাদ কাস সার বে তা'জে সুলত্বা'নি ॥

অর্থ ঃ

অবিনশ্বর মর্যাদা দরবেশদের টুপিতে
বাদশাদের মুকুট সেখানে নত হয় ॥

আরো বলছেন :

شهريارا مهل اين سلطنت فقر كه نيست
به درر باري دربار تو دربار دگر

(শাহরিয়ার[৬৬], ১ম খন্ড, পৃ: ২৫৫)

উচ্চারণ ঃ

শাহরিয়া'রা' মাহেল ইন সালত্বানাতে ফাক্বর কে নিস্ত,

বে দোররে বা'রি দরবা'রে তো দরবা'রে দেগার ॥

অর্থ ঃ

শাহরিয়া'র দারিদ্রতার এই সম্রাজ্যকে ত্যাগ করিও না,

তোমার দরবারের এই মর্যদা আর কোথাও নেই ॥

কানায়াত বা অল্পেতুষ্টি ঃ

قـنـا عت শব্দের অর্থ অল্পেতুষ্টি। সুফি সাধকেরা আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করার জন্য قـنـا عت বা অল্পেতুষ্টিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ আমল হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলে পাক (সাঃ) বলেছেন ''একজন মুসলিম একটা পাকস্থলিতে খায় (সে অল্প খাবারে সন্তষ্ট) কিন্তু একজন কাফির সাতটা পাকস্থলিতে খায় (প্রচুর খায়) (বারী[৪৪], পৃ: ৪০)

শেখ সাদী (রঃ) তার বুস্তানে قـنـا عت শিরোনামে স্বতন্ত্র একটি অধ্যায় নিয়ে এসেছেন। মাওলানা জালালুদ্দিন রুমিও قـنـا عت এর কথা বলেছেন। কানায়াত সম্পর্কে সাদী বলেন :

خدا را ندانست و طاعت نکرد
که بر بخت روزي قناعت نکرد
قناعت توانگر کند مرد را
خبر کن حریص جهانگرد را

(শিরাজী[৬৮], পৃ: ২৫১)

উচ্চারণ ঃ

খোদা' রা' নাদা'নাস্ত ও ত্বায়াত্ না কারদ,

কে বার বাখতে রুজী কানা'য়াত না কারদ।

কানায়াত তাওয়াঙ্গার কুনাদ মার্দ রা'

খবর কুন হারীছে জাহাঁঙ্গের্দ রা' ॥

অর্থ ঃ

সে ব্যক্তি আল্লাহকে চিনে না এবং তাঁর ইবাদত বন্দেগীও করে না।

যে ব্যক্তি আল্লাহর দেয়া রিযিকের ওপর সন্তুষ্টি প্রকাশ করে না,

অল্পতে তুষ্টি মানুষকে শক্তিশালী করে

যারা লোভে পরে সারা দুনিয় ঘুরে তাদের অবস্থা খোজ কর ॥

তিনি আরো বলেন :

> অতএব, হে আত্মা! তুমি আল্পতে তুষ্ট থাক, তা হলে তুমি ফকির বাদশাহ সবাইকে সমান চোখে দেখতে পাবে। অনুনয়-বিনয় করে তুমি কেন বাদশাহর সম্মুখে যাবে? তুমি যখন লালসা ত্যাগ করে দিয়েছ, তখন তুমিই বাদশাহ। আর তুমি যদি নফছ-পূজারী হও, তবে তোমার পেটকে তার নাকারা বানাও এবং তার ঘরের দরজাকে তুমি কেবলা বানিয়ে নাও। এক লোভী ব্যক্তি খাওয়ারেজমের বাদশাহর নিকট খুব ভোরে গেল। যখন বাদশাহকে দেখল, তখন রুকু দিয়ে উঠল। তারপর সিজদায় গেল। তার পুত্র প্রশ্ন করল, হে পিতা! আপনি বলেছিলেন না যে, আমাদের কেবলা পবিত্র হেজাজ তুমি? আপনি আজ কেন এর দিকে ফিরে সালাত আদায় করলেন? নিজের মন্দ-রিপুর বাধ্যগত হবেন না, তা হলে ঘন্টায় ঘন্টায় কেবলা পরিবর্তন হবে। হে ভাই! কু-রিপুর বশবর্তী হয়ো না, তা হলে বিপদে পড়বে। হে জ্ঞানী ব্যক্তি! অল্পতে সন্তুষ্ট হলে বড় হওয়া যায়। লালসা পরিপূর্ণ মাথা সব সময় নীচু থাকে। লোভ মানুষের মান-সম্মান নষ্ট করে ফেলে। দুটি গমের পরিবর্তে মুক্তার ঝুড়ি বিক্রি করে দেয়। তুমি যখন সমুদ্রের পানি দিয়ে তৃপ্তি লাভ করতে পার, তবে কেন বরফের পানির জন্য সম্মান নষ্ট করতে যাও? তুমি বিলাসিতা পরিত্যাগ কর, না হয় অন্যের দরজায় তোমাকে যেতে হবে। লালসার হাত খাট কর, লম্বা আস্তিনের প্রয়োজন হবে না।(মানিরি[৫০], পৃ: ২৫১)

হযরত শেখ আব্দুল কাদের জিলানী (রহঃ) কানায়াত সম্পর্কে বলেন :

তোমার ভাগলিপি উহার নির্দিষ্ট মেয়াদে পৌচা পর্যন্ত তুমি অল্পতে সন্তুষ্ট থাকিও এবং এই সন্তুষ্টির উপর অবিচল থাকিও। তখন তোমাকে আরো উচ্চ ও উত্তম মর্যাদায় উন্নীত করা হইবে এবং তোমাকে অভিনন্দিত করা হইবে এবং তোমাকে সেই মর্যাদায় স্থায়ী করা হইবে। কোন প্রকার কষ্ট ক্লেশ ও সীমা লংঘন ছাড়া তোমাকে চক্ষুকে অধিক শীতল করিবে এবং আরও অধিক অবিনন্দিত করিবে। তুমি জানিয়া রাখ যে, তুমি তলব ছাড়িয়া দিলেও তোমার ভাগ্য তোমার নিকট হইতে সরিয়া যাইবে না আর যাহা তোমার বাগ্রে নাই উহা তলবে ও চেষ্টায় তুমি লোভ করিলে এবং হাজার প্রচেষ্টা চালাইলেও তুমি তাহা কখনও পাইবেনা।

অতএব তুমি যেই অবস্থায় আছ এই অবস্থার প্রতি অবিচল থাক এবং ইহাতেই সন্তুষ্ট থাক। আল্লাহর পক্ষ হইতে তোমাকে আদেশ না দেওয়া পর্যন্ত তুমি নিজের ইচ্ছায় এরাদায় কোন কাজের জন্য হরকতও করিও না। স্থিরতা এবং আরামও হাসিল করিও না। অন্যথায় তোমাকে বিপদগ্রস্থ করা হইবে এবং তোমার চেয়েও অধিক নিকৃষ্ট মাখলুকের পর্যায়ে তোমাকে বিপদে লিপ্ত করা হইবে। কেননা তুমি যখন এরূপ করিবে তখন তুমি জালেম হইয়া যাইবে। আর জালেমের ব্যাপারে কখনও গাফলতী করা হয় না। যথা : আল্লাহ পাক এরশাদ করিয়াছেন : "এমনিভাবে আমি কোন কোন জালেমকে অপর কোন জালেমের

উডপর ক্ষমতা প্রদান করিযা থাকি" অর্থাৎ এক জালেমকে অপর এক জালেমের উপর শাস্তি স্বরুপ ক্ষমতা দিয়া থাকি। ফলে সেই জালেম ব্যক্তি ঐ জালেমকে শাস্তি দিয়া থাকে।
কারণ তুমি এমন একজন মহান প্রতাপশালী বাদশাহের রাজ্যে বাস করিতেছ যিনি অতি মহান, যাহার হুকুম অতিশয় মর্যাদা সম্পন্ন, যিনি খুব শক্ত (জিলানী[৩১], পৃ: ১১২)

শাহরিয়ারের মতে কোন সালেক যদি ত্বরিকার এই গুনাবলীকে আয়ত্ব করতে পারে তাহলে এলমে মারেফতের সর্বোচ্চা পর্যায়ে আসিন হওয়া তার পক্ষে সম্ভব। শাহরিয়ার বলছেন :

گر سر بر آستان قناعت توان گذاشت
از آسمان بر شده طارم توان گذشت

(শাহরিয়ার[৬৬], ১ম খন্ড, পৃ: ১৪০)

উচ্চারণ ঃ

গার সার বার অ'সতা'নে ক্বানা'আত তাভা'ন গোযা'শ্ত
আয অ'সেমান বার শোদে ত্বা'রাম তাভান গোযাশ্ত ॥

অর্থ ঃ

যদি নিজেকে অল্পতুষ্টির পোষাকে আবৃত করা যায়
আকাশের সিমানা ছাড়িয়ে অনেক দূর চলে যাওয়া যায় ॥

তবে আল্লাহর সাহায্য ছাড়া এই গুনকে আয়ত্ব করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। সে জন্য তিনি আল্লাহর দরবারে قناعت এর শক্তির জন্য সাহায্য প্রর্থ্যনা করেছেন যাতে করে দুরিয়ার কাছে তাকে মুখাপেক্ষি না হতে হয়। তিনি বলছেন :

دولت همت سلطان قناعت خواهم
تا تمنا نكنم نعمت ارباب نعيم

(শাহরিয়ার[৬৬], ১ম খন্ড, পৃ: ৩২৪)

উচ্চারণ ঃ

দওলাতে হিম্মাতে সুলতা'নে ক্বানা'আত খা'হাম
তা তামান্না নাকুনাম নে-মাতে আরবা'বে নায়িম ॥

অর্থ ঃ

অল্পতুষ্টির সম্রাজ্যের সম্পদ চাই
যাতে ভূস্বামীদের ঐশ্বর্যের আকাঙ্খা না করি ॥

অন্যত্র বলছেন ঃ

تاج فقرم بر سر و تخت قناعت زير پاي
تا ابد خط امان دارم ز ديوان ازل

(শাহরিয়ার[৬৬], ১ম খন্ড, পৃ: ২৮৬)

Dhaka University Institutional Repository

উচ্চারণ ঃ

তা'জে ফাক্বরাম বার সারো তাখতে ক্বানা'আত যীরে পা'
তা' আবাদ খাত্বে আমা'ন দা'রাম যে দিভা'নে আযল

অর্থ ঃ

আমার মাথায় দারিদ্রতার মুকুট ও পায়ের নিচে অল্পতুষ্টির সিংহাসন
চিরনতন মহাকাব্যের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একে রক্ষার দায়িত্ব রয়েছে

ফানা বা প্রেমাস্পদে আত্মবিলোপ :

ফানা আরবি শব্দ। এফ স্টেইনগ্যাসের আরবি ইংরেজি অভিধানে ফানা অর্থ লেখা হয়েছে Perishableness, nothingness, non-existence, বাংলা একাডেমীর ব্যবহারিক বাংলা অভিধানে ফানা অর্থ লেখা হয়েছে- লয়, ধ্বংস, আত্মহারা, তন্ময়, পাগল। (চিশতি, পৃ: ৩০)

যুক্তিবাদী সুফি দার্শনিক ইবনুল আরাবি (মৃ: ৬৪১ হি:/১২৪৩ খ্রি:) 'ফানা' বলতে তিনি যা বুঝিয়েছেন তা হলোঃ

১. অতীন্দ্রিয় অর্থে 'ফানা' হলো-অজ্ঞানতা থেকে দূরে চলে যাওয়া বা মুক্তি লাভ করা। ফানার মধ্যে সাধক নিজ আত্মার বিলুপ্তি সাধন করে না বা নিজ আত্মা ত্যাগ করে না; বরং একটা 'আকার' হিসাব তার অনস্তিত্বকে বুঝতে পারে;

২. তাত্ত্বিক অর্থে 'ফানা' হলো- অবভাসিক জগতের (phenomenal world) বিভিন্ন আকার হতে চলে যাওয়া বা মুক্ত হওয়া এবং এক সার্বিক দ্রব্যে অবস্থান করা। তিনি বলেন যে, একটা আকারের 'লয়প্রাপ্ত হওয়া' বা পরিবর্তন হওয়ার নামই 'ফানা' । অর্থ্যাৎ আল্লাহ্ যখন একটা আকার হতে অন্য একটা আকারে প্রবেশ করতে চান তখন প্রথম আকারটি পরিবর্তন করে নতুন আকার ধারণ করেন। এই প্রথম আকারের পরিবর্তন সাধনের নাম 'ফানা'।

আল্লাহর পরিচয় সঠিকভাবে উদঘাটন করতে চাইলে আল্লহ্হে ফান হওয়া ছাড়া সেটি সম্ভব নয়। যিনি স্রষ্টাতে ফানা হয়েছেন তিনি বলতে পানে স্রষ্টার গতি প্রকৃতি কি। সেজন্য শাহরিয়ার আলণ্ঢহতে ফানা হওয়ার কথা বলেছেন। তিনি বলছেন :

در حقایق و گنجینة ادب قفل است
کلید فتح بکنج فنا تواني یافت

(শাহরিয়ার[৬৬], ১ম খন্ড, পৃ: ১৪১)

উচ্চারণ ঃ

দার হাক্বা'য়েক্ব ও গানজীনেয়ে আদব ক্বোফল আস্ত,
কেলীদে ফাতহ বেকোনজে ফানা' তাভা'নি ইয়া'ফ্ত ॥

অর্থ ঃ

মহাসত্য ও অদবের ধণভান্ডারে তালা রয়েছে,
ফানার কিনারায় তুমি এর চাবি খুজে পাবে ॥

ইবনুল আরাবীর পূর্বে ফানাতত্ত্বের ওপর এত ব্যাপক আলোচনা আর কেউ করে নি। তিনি ফানার দুটি অবস্থার মধ্যে পার্থক্য দেখাতে চেষ্টা করেন। তিনি বলেনঃ

১) ফানার এক অবস্থা হলো-আত্মার সকল প্রকার বৈশিষ্ট্যের বা ব্যক্তিত্বের বিলোপ সাধন। এই অবস্থাকে নিদ্রার সাথে তুলনা করা যায়।

২) ফানার দ্বিতীয় অবস্থা হলো- স্বজ্ঞামূলক জ্ঞানের এক তন্ময় অবস্থার মধ্যে আত্মার বিলুপ্তি সাধন। এই অবস্থায় সাধকের কাছে পরমাত্মার সামগ্রিক ঐক্য প্রকাশ পায়।

ইবনুল আরাবীর মতে 'ফানা' একটা ধারাবাহিক প্রবাহ। এ প্রবাহে আলণ্ঢাহর জ্ঞান লাভের পথে তিনি আত্তারের মতো সাতটি স্ড়র চিহ্নিত করেন। এগুলো হলো :

১.সকল প্রকার পাপ থেকে বিরত থাকা।

২. সকল কার্য থেকে বিরত থাকা।

৩. অনিয়ত সত্তাসমূহের গুনাবলী হতে ফানা অর্থাৎ পরম সত্তাকে নিয়ত সত্তার উৎস মনে করা, মানুষের কার্যকে আল্লাহর কার্য মনে করা এবং মানুষের অভিজ্ঞতা লাভের শক্তিকে আল্লাহর শক্তি মনে করা।

৪. নিজের ব্যক্তিত্ব থেকে ফানা হওয়া।

৫. বাহ্য জগৎ ত্যাগ করা।

৬. আল্লাহ থেকে ভিন্ন এমন সকল বস্তুকে ভুলে যাওয়া, এমন কি 'ফানা' থেকেও ফানা হওয়া।

৭. আল্লাহর গুনাবলী হতে 'ফানা' হওয়া অর্থাৎ আল্লাহকে বিশ্বের কারণ হিসাবে চিন্তা না করে বিশ্বের অন্তর্নির্হিত সত্ত্বারূপে ধ্যান করা। (সরকার[৭২], পৃ: ১৮২-১৮৭)

আরাবীর পর জালালুদ্দিন রুমি (মৃ:৬৭২হি:/১২৭৩ খ্রি:) তাঁর কাব্যে সুফি দর্শনের উৎকর্ষ সাধন করেন। তাঁর রচিত অনেক গ্রন্থের মধ্যে মসনভী ও দিওয়ান-ই-শামস্ আধ্যাত্মিক জ্ঞানের অনন্ত সমুদ্র ও সুফিদর্শনের মধ্যমণি। তার গ্রন্থে ফানাতত্ত্ব অতি চমৎকারভাবে কাব্যিক ভঙ্গীতে প্রকাশ করেছেন। তিনি লিখেছেন :

مردان خدا گر خدا نباشد
لیکن از خدا جدا نباشد

উচ্চারণ ঃ

মারদা'নে খোদা' গার খোদা' নাবা'শাদ
লিকেন আয খোদা' জোদা' নাবা'শাদ ॥

অর্থঃ

মানুষকে কে খোদা কয়, মানুষ খোদা নয়
কিন্তু মানুষ থেকে খোদা পৃথকও নয় ॥
(রশিদ[৫৭], পৃ: ২৪৫)

রুমির মতে, একমাত্র আল্লাহর সত্তা ছাড়া সব কিছুই ধ্বংসশীল । কেউ তার মধ্যে বাস না কররে বেঁচে থাকার আশা করতে পারে না। যিনি ফানা হন তিনি সার্বিক মরণশীল নিয়মের উর্ধ্বে। তিনি বলেন যে, ফানা হওয়ার অর্থ ধ্বংষ হওয় নয়, এটা একটা পরিবর্তন মাত্র। প্রতিপালকের পরম সত্তায় অস্তিত্বশীল অবস্থায় বেঁচে থাকার মানেই পরশ মনির স্পর্শে যেমন লোহা ধারণ করে গৌরবান্বিত হয়ে যদি বলে

'আমি অগ্নি' কারো সন্দেহ থাকলে হাত দিয়ে স্পর্শ করে দেখ; ফানা প্রাপ্ত মানুষের অবস্থাও ঠিক একই রকম। (সরকার[৭৩], পৃ: ২৩৩)

শাহরিয়ারের ফানা মতবাদ এই মতবাদের কাছাকাছি। তার মতে : মানুষ যদি আল্লাহর অস্তিত্বের মধ্যে নিজেকে বিলীন করে দিতে পারে তবে সে খোদায়ী গুনাবলী অর্জন করতে সক্ষম হয়। তিনি বলছেন :

چون مس تافته اکسیر فنا یافته اند
عاشقان زر وجودند که رو زر دانند

(শাহরিয়ার[৬৬], ১ম খন্ড, পৃ: ২৫৩)

উচ্চারণ ঃ

চোন মেসে তা'ফতে আকসীর ফানা' ইয়া'ফতে আন্দ
আ'শেক্বান যারে উজূদান্দ কে রূ যার দা'নান্দ

অর্থ ঃ

যখন তামা পরশ পাথরের আলোতে বিলীন হয়ে যায়
প্রেমিকেরা তার প্রতিটি বিন্দুতে সোনা দেখতে পায়

অল্লামা ইকবাল ফানা বলতে আমিত্বের ধ্বংস সাধন বুঝিয়েছেন। তিনি আল্লাহ্কে অনন্ত আধ্যাত্মিক পরম অহং (ego) বলে বর্ণনা করেছেন। (ইসলাম[১৫], পৃ: ৮২)

কাজেই পরম অহং ছাড়া আর কারো 'আমিত্ব' থাকতে পারে না। তিনি তাঁর জিবরিল গ্রন্থে অনুযোগের সুরে বলেন :

বা'গে বেহেস্ত সে মুঝে হুকমে সফর দিয়া থ কেঁও
কারে জাঁহা দরাজ হায় আব মেরা এন্তেজার কার
রোজে মাহাশার মে যব পেশ দফতরে আমল
তু ভি শারমসার না হো, মুঝকো ভি শারমসার না কর
বেহেশতের নন্দন কানন থেকে কেন আমাকে এ সফরের অদেশ দিলে?
এই জগতের দায়িত্ব অনেক (শেষ না হওয়া পর্যন্ত) আমার জন্য অপেক্ষা কর।
(তা না হলে) বিচার দিনে তোমার দপ্তরে আমার আমলনামা দেখে
আমাকে লজ্জায় ফেলো না, তুমিও লজ্জা পেয়ো না (চিশতি[২৭], পৃ: ৩৫)।

হজরত বায়েজিদ বোস্তামি (মৃত: ৮৭৪ খ্রিঃ/২৬১ হিঃ) ফানাতত্ত্ব প্রবর্তন করে সর্বেশ্বরবাদের প্রতি ইঙ্গিত করেন। বায়েজিদ মনে করতেন আল্লাহর প্রেমে মত্ত হয়ে সুফিগন আত্মবিলয় ঘটিয়ে আল্লাহর সত্তার সংযোগ স্থাপন করলে উপাসক ও উপাস্য, জ্ঞাতা জ্ঞেয় অভিন্ন হয়ে পড়ে। এরূপ ঐশী প্রেমের মত্ততায় একদিন বায়োজিদের মুখ থেকে বেরিয়ে পড়লো "পবিত্রতা আমার, শ্রেষ্ঠতম গৌরব আমারই। মত্ততার অবসান ঘটলে উপস্থিত ভক্তগণ তাকে তাঁর বক্তব্য স্মরণ করিয়ে দিলে তিনি বললেন, "হায় সর্বনাশ! তোমরা আবার কখনো আমার মুখে এরূপ কথা শুনা মাত্রই আমাকে কতল করে ফেলো।" এরাপর অন্য একদিন মত্ততাবশত তিনি পুনরায় একই বাক্য উচ্চারণ করলে ভক্তগণ তাঁকে কতল করতে উদ্যত হলো। তখন তারা দেখতে পলো সারা ঘরে হাজার হাজার বায়েজিদ অবস্থান করছে। ফলে কোনটিকে কতল করবে তা তারা নির্দিষ্ট করতে পারে নি। অপর একদিন আল্লাহর প্রেমে মত্ত অবস্থায়

বায়েজিদ বলেছেন, "প্রকৃতপক্ষে আমিই আল্লাহ, আমি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই। অতএব আমার ইবাদত কর" । এমন কথা নবিকুল শিরোমনি সারদারে কায়েনাত রহমাতাল্লিল আলামিন মুহাম্মদ (সঃ) কখনো প্রকাশ্যে বলেন নি, কিন্তু বায়েজিদ বলেছেন এবং তাঁর পরবর্তী সুফি দার্শনিকগণ এটা সমর্থন করে বলেছেন যে, তন্ময়তার স্থান সকল প্রকার নৈতিকতা, প্রার্থনা ও জ্ঞানের বহু উর্ধ্বে।(সরকার[৭২], পৃ: ৩৭৭)

শাহরিয়ারও এই মতকে সমর্থন করে বলছেন :

هوش باش كه با عقل و حكمت محدود
كمال مطلق گيتي كجا توانى يافت
چه دانشي كه نه عرفان در او وني تسليم
دري بزن كه دردت دوا توانى يافت

(শাহরিয়ার[৬৬], ১ম খন্ড, পৃ: ১৪১)

উচ্চারণ ঃ

হুশ বা'শ কে বা আক্বল ও হেকমাতে মাহদুদ
কামা'লে মোতলাক্বে গিতি কোজা' তাভা'নি ইয়া'ফ্ত
চে দা'নেশী কে না এরফা'ন দার উ ভা নেই তাসলীম
দারী বেযান কে দারদাত দাভা' তাভা'নি ইয়াফ্ত ॥

অর্থ ঃ

সজাগ হও, সীমাবদ্ধ জ্ঞান বিজ্ঞান দিয়ে
এই জগতের পরিপূর্ণ মুক্তি কোথায় পাবে
তাও কোন জ্ঞান দিয়ে যার মধ্যে না আছে আধ্যাতিকতা না আছে আত্মসমর্পণ
তোমার হৃদয়ের ব্যাথার মাঝেই খুজে দেখ ঔষধ খুজে পাবে ॥

বায়েজিদ আল্লাহ্‌র আহাদিয়াত বা ঐকল্যকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন বলেই নিজের মধ্যে বায়েজিদকে না দেখে স্বয়ং আল্লাহ্‌কে দর্শন করেছেন। যে তন্ময়তা বা মত্ততায় আবিষ্ট হয়ে তিনি এসব উক্তি করেছে সে অবস্থাকেই 'ফানা' নাম দিয়েছেন । কিন্তু তিনি ফানাতত্ত্বের কোন দার্শনিক ব্যাখ্যা প্রদান করেন নি। তাই বলে এ কথা বলা যাবে না যে, তিনি অকস্মাৎ ফানাতত্ত্ব ইসলামিক দর্শনে প্রক্ষেপ করেছেন। ইসলামের পূর্বপর্তী কিতাবসমূহেও অনেক mystic বাণী ছিল। সভ্যতার উন্মেষ হতেই মানুষ স্রষ্টা ও সৃষ্টির সাথে সম্পর্কের যোগসূত্র অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হয়ে স্রষ্টাকে জানার ও চেনার উপায় খুঁজতে থাকে। তাইতো সক্রেটিস বলেছিলেন- Know thyself (অর্থাৎ নিজেকে চেনো) । রাসুলে পাক (সঃ) এর শিক্ষার মধ্যে ফানা তত্ত্বের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কোরআন ও হাদীসের বহু উদ্বৃতি দ্বারা যা প্রমানিত।
আসহাবে সুফফার সদস্যগণ শুধুমাত্র ইবাদত করার জন্য মসজিদে নববির বারান্দায় পড়ে থাকতেন না। এঁরা কুরআন দর্শনের আধ্যাত্মিক ও বাস্তব শিক্ষা লাভ করতেন। কিন্তু পরবর্তীতে অজ্ঞ উমাইয়া ও আব্বাসিয় রাজত্বের দোর্দন্ড প্রতাপেএসব দার্শনিক বিষয় কেউ প্রকাশ করতেন না । তা না হলে কেন আবু হোরায়রা চিৎকার করে বলেছিলেন, "রাসুল (সঃ) আামাকে এমন কিছু শিক্ষা দিয়েছিলেন যা প্রকাশ

করলে তোমরা আমার খাদ্যনালী কেটে ফেলবে। " উমাইয়াদের পতনের পর দু একজন খেপা মুদ্রার অপর পিঠ দেখাতে লাগলো। এদের মধ্যে বায়েজিদ প্রথম। বায়েজিদের পর মনসুর হাল্লাজ (মৃ: ৩১০ হি:৯২২খ্রিঃ) তাঁর আলোড়ন সৃষ্টিকারী 'আনাল হক' (আমি চিরসত্য) তত্ত্ব প্রকাশ করে নিষ্ঠুরবাবে প্রাণ হারালেন। তাঁর আনাল হক তত্ত্ব ফানাতত্ত্বের নামান্তর মাত্র হাল্লাজের সমসাময়িক সুফি ওমর ইবনে ফরিদ তাঁর 'আনা হিয়া'(আমিই সে) তত্ত্ব প্রকাশ করেন।

সুফি জগতের প্রাণ তাপস গুরু শেখ ফরিদ উদ্দিন আত্তার (মৃ:৬২৭ হি:/১২২৯খ্রি:) তাজকিরাতুল আউলিয়া রচনা করে সুফি দর্শনের দিগন্ত উন্মোচন করেন । তিনি তাঁর 'মান্তেকুত ত্বায়ের' (পাখীদের কথোপকথন) গ্রন্থে অতি চমৎকার রূপকের মাধ্যমে ফানাতত্ত্বের পর্যালোচনা করেন। এ গ্রন্থের উপাখ্যান হলো : বনের সকল পাখী এক হয়ে জ্ঞানবৃদ্ধ হুদহুদ পাখীর সভাপতিত্বে আলোচনা সভা আরম্ভ করে। পাখীরা একজন বাদশা নির্বাচনের ঐকমত্য প্রকাশ করে। হুদ হুদ বললো পাখীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলো সী-মোরগ এবং সে সপ্ত উপত্যাকার পরপারে 'ক্বাফ' নামক স্থানে অবস্থান করে। সকল পাখী সী-মোরগকে দেখার অভিলাষ প্রকাশ করলে হুদহুদ জানায় যে, সেখানে যাবার পথ অত্যন্ত দুর্গম । আলোচনা শেষে পাখীরা হুদহুদকে পথ প্রদর্শক হিসাবে মনোনীত করে। যাত্রার সময় উপস্থিত হলে দেখা গেল প্রায় সকল পাখী মুখ ভার করে বসে রয়েছে। বুলবুলি গোলাপ বাগান ছেড়ে যেতে চায় না, তোতা অপরূপ দেহ নিয়ে বিদেশে যেতে নারাজ, হাঁস জলপথ চায়, পেঁচা চায় রতের অন্ধকার ও ভাঙ্গা বাড়ি এবং বাজপাখী রাজার প্রিয় বলে তার সঙ্গ ছাড়তে চায় না। হুদহুদ যুক্তি দিয়ে পাখীদের আপত্তি খন্ডন করলে হাজার হাজার পাখী যাত্রা শুরু করে । সী- মোরগের কাছে পৌছাতে যে সাতটি উপত্যাকা অতিক্রম করতে হয় তা নিম্নরূপ :

১. সন্ধান : এখানে সঠিকপথ নির্বচনের জন্য ধৈর্য ধারণ করে কতগুলো নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে চলতে হয় এবং জড় জগতের আকাঙ্কা ত্যাগ করতে হয়। অনেক পাখী এসব মেনে চলতে না পেরে এ উপত্যাকায় বাদ পড়ে যায়।

২. প্রেম : অবশিষ্টরা এ উপত্যাকায় পৌছে। কিন্তু এটি আরো কঠিন । এখানে প্রেমিকের ধৈর্য, সহনশীরতা, দারিদ্র ও বিশ্বাসের অগ্নি পরীক্ষা হয়। পরীক্ষায় কষ্ট সহ্য করতে না পেরে অনেকে প্রাণ ত্যাগ করে এবং অনেকে সম্মুখে অগ্রসর হতে অস্বীকার করে। ফলে এ উপত্যাকায়ও অনেক পাখী বাদ পড়ে যায়।

৩. জ্ঞান : প্রকৃত প্রেমিক প্রেমিকার আকর্ষণে এ উপত্যকায় উপনীত হয় । এ জ্ঞান ইন্দ্রিয়গত অভিজ্ঞতামূলক বা প্রজ্ঞামূলক জ্ঞান নয়। এ জ্ঞান হলো-হৃদয় ঐশী আলোকে উদ্বাসিত হয়ে আত্মা পরমাত্মার সন্দর্শন লাভ করে এবং প্রেমিক প্রেমাস্পদের অপরূপ সৌন্দর্য উপবোগ করে বেহুশ হয়ে পড়ে। যারা এ জ্যোতি বহনের ক্ষমতা লাভ করে না তার সম্মুখ পানে আর অগ্রসর হতে পারে না।

৪. নির্লিপ্ততা : এ উপত্যকায় সকল প্রকার প্রয়োজনীয়তা, চাহিদা ,আশা- আকাঙ্খা, অভাব-অনটন, লোভ-লালসা, মোহ-মায়া থেকে পথিক মুক্ত হয়ে যায়।

৫. একত্ববাদ : পার্থিব জগতের সকল আকর্ষণ মুক্ত হয়ে পথিক একত্ব উপত্যকায় উপনীত হয়। এখানে সে সকল বৈচিত্র ও বহুত্বের মাঝে পরম ঐক্য উপলব্ধি করতে পারে।

৬. বিস্ময় : এ উপত্যকায় পথিক এত বিহ্বল হয়ে পড়ে যে, আমি, তুমি, এক ও বহু ইত্যাদির মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করতে পারে না। তারা নিজেরা বেঁচে আছে কিনা তাও জানে না। তাদের প্রেমিকাকে তারা চিনে না এবং কেন ভালবাসে তাও জানে না। কেন এ পথ অবলম্বন করে পাড়ি জমিয়েছে তাও বোঝে না তাদের ধর্ম কী সে কথার উত্তর তাদের কাছে পাওয়া যায় না।

৭. আত্ম বিলোপন : এ উপত্যকায় উপস্থিত হয়ে প্রেমিক সকল আত্মচেতনা হারিয়ে ফেলে এবং কালো, বোবা, নির্বাক নিঃসাড় হয়ে পড়ে। প্রেমাস্পদ ছাড়া অন্য সকল সম্পর্ক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে প্রেমাস্পদে 'ফানা' হয়ে যায়। এ অবস্থায় প্রেমিক ও প্রেমাস্পদ এক ও অভিন্ন হয়ে যায়।

যাত্রার প্রতিটি উপত্যাকায় বাদ পড়তে পড়তে হাজার হাজার পাখীর মধ্যে মাত্র ত্রিশটি পাখী সী-মোরগের সদর্শন লাভ করে । সী-মোরগের সম্মুখে উপস্থিত হলে তারা দেখতে পেলো যে, তারা প্রত্যেকেই এক একটা সী-মোরগ। তারা প্রত্যেকেই বিস্ময়ে চিন্তা করতে লাগলো তাহলে সী-মোরগ কে । তখন ভাষাহীন এক ঐশী বাণী শুনতে পেলো- "হে সত্যান্বেষী পথিক, তোমরা দর্পণে প্রতিবিম্ব দেখছো, আমি দর্পণ, সত্য সী-মোরগ তোমাদের অন্তরে। দৃষ্টিভ্রমে তোমরা 'এক' কে 'বহু' রূপে দেখছো। পরম সত্য এক।" এ রূপকের মাধ্যমে আত্তার ফানাতত্ত্বকে কত গভীর দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যক্ত করেছেন তা সহজেই অনুমেয়। তাই তো আত্তার ধ্যানমগ্ন অবস্থায় বলেছেন,"হে আত্তার, আসলে তুমিই সমগ্র জগতের প্রাণ, তুমিই উভয় জগতে। তোমার আত্মাই লাওহে মাহফুজে যেখানে আল্লাহর বাণী লেখা থাকে। তুমি যা চাও তা তুমি তোমার আত্মা থেকেই পাবে। আসলে তুমিই পবিত্র কুরআন। তুমি নিজেই নিজের মধ্যে নিজ প্রকাশভঙ্গী লক্ষ্য কর। তুমিই পরম সত্তার প্রতিরূপ ও বস্তুর আসলে স্বরূপের প্রকৃত জ্ঞাতা (সরকার[৭৩], পৃ: ১৩-১৬)

শাহরিয়ার বলছেন :

اگر خدا طلبي و يافتي در خود
اميد هست كه خود در خدا توانى يافت

(শাহরিয়ার[৬৬], ১ম খন্ড, পৃ: ১৪১)

উচ্চারণ ঃ

আগার খোদা' ত্বালাবী ভা ইয়া'ফতী দার খোদ
উমীদ হাস্ত কে খোদ দার খোদা' তাভা'নি ইয়া'ফ্ত ॥

অর্থ ঃ

যদি খোদাকে খোজ কর তবে তোমার মাঝেই তাকে পাবে
আশা করা যায় তুমি নিজেই নিজেকে খোদার মাঝে পাবে ॥

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট হয়েছে যে ফানা হলো-বিনাশন বা ধ্বংস । এ বিনাশন ব্যক্তির বিনাশন নয় বা ব্যক্তি সত্তা ধ্বংস করে সমাজ , জীবন, কর্ম পরিত্যাগ করে আল্লাহ্র ধ্যানেবুদ হয়ে পড়ে থাকা অর্থে যদি ফানা গ্রহণ করা হয় তা হলে দেশ, সমাজ, অর্থনীতি, বৈজ্ঞানিক আবিস্কার, মানব কল্যাণ ইত্যাদি চলবে কী করে? আত্তার ও আরাবী ফানা স্তরে উন্নীত হবার যে ৭টি স্তর দেখিয়েছেন তাতে

উভয়েই সংসার ত্যাগ বা বিরাগী জীবনের কথা বলেছেন্ প্রতি্টি ব্যাক্তি যদি সংসার বিরাগী হয়ে পড়ে তা হলে সৃষ্টির ক্রমবর্ধিষ্ণুতা স্থবির হয়ে পড়বে। সে ক্ষেত্রে পৃথিবী বিরান ভূমিতে পরিণত হবে। অবশ্য আত্তার তার হুদহুদ পাখীর রূপকে বলেছেন ৭টি স্তরের বিভিন্ন স্তরে বেশিরবাগ পাখী ঝড়ে পড়েছে। হাজার হাজার পাখীর মধ্যে মাত্র ত্রিশটি পাখী সী-মোরগের কাছে পৌঁছাতে পেরেছে। কাজেই অবশিষ্টদের জন্য ফানা হবে কাম,ক্রোধ , লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য-এ ষড়রিপুকে, সকল কু-প্রবৃত্তিকে, সকল মন্দকে ধ্বংস করে আল্লাহ্র ঐকল্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়া, তার ইবাদত সম্পন্ন করা ও আমলে সালেহায় (কল্যাণকর কাজে) প্রবৃত্ত হওয়া। এ ফানা সমাজকে সঠিক সুন্দর ও শান্তির আকর করে দেবে। অনেক দিন পূর্বে একটা গ্রন্থে ফানা কে এভাবে ব্যাখ্যা করর হয়েছে

কোন এক ব্যক্তি তার বিশেষ প্রয়োজনে বিদেশ থেকে নিজের টলোকায় যাওয়ার জন্য যাত্র করলো। এক নদীর ঘাটে গিয়ে সন্ধ্যার সময় সর্বশেষ ফেরি ধরতে পারল না। ফলে সে রাতে নির্জন স্থানে অবস্থান করতে ভয় পেলো। অল্প দূরে একটা প্রদীপ জ্বলতে দেখে সেদিকে এগিয়ে গেল। ঘরের কাছে গিয়ে ডাক দিলে একজন লোক বেরিয়ে এলো। তিনি তার আগমনের হেতু জানতে চাইলে লোকটি সবিস্তারে সব বলে তার ঘরে রাত্রি যাপনের অনুমতি প্রার্থনা করলো। ঘরের মালিক বললো, "আমি ফকির মানুষ, তুমি রাত্রিযাপন করতে পার তবে ঘরে এমন কিছু নেই যা তোমাকে খেতে দিতে পারি। যদি তোমার খুব তাড়া থাকে তা হলে নদীর পাড়ে গিয়ে বলো- ওই ফকির আমাকে পাঠিয়েছে যে কখনো অন্ন স্পর্শ করে নি, ওই ফকির আমাকে পাঠিয়েছে যে কখনো নারি স্পর্শ করে নি, হে নদী আমাকে ওপারে যাবার পথ করে দাও।" একথা বলে লোকটি নদী পর হয়ে গেল। কিন্তু প্রমাদ বেঁধেছে ফকিরের ঘরে। তাঁর স্ত্রী পিছনে দাঁড়িয়ে ফকিরের সব কথা শুনেছে এবং রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে বলতে লাগলো "তুমি একটা মস্তবড় মিথ্যাবাদী ; আমি তোমরা মিথ্যাবাদীতা সকলের কাছে ফাঁস করে দেব। প্রতিদিন দু'বার পাক করে তোমাকে খাওয়াই আর তুমি বল অন্ন স্পর্শ কর নি। আমার তিনটি সন্তান আর তুমি বল নারী স্পর্শ কর নি। এতে তুমি আমার চরিত্রে কলঙ্ক লেপন করেছো।" ফকির প্রমাদ শুনলেন। পরদিন নিজের আঙ্গিনায় একটা সাম্য (ভক্তিমূলক গান) অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করলেন। একটা প্রদীপে টইটুম্বুর করে তেল ভরে স্ত্রীর হাতে তা দিয়ে দরজায় বসিয়ে দিলেন এবং বললেন, "এ প্রদীপ থেকে একফোটা তেল পড়ে গেলে তোমার সাথে তালাক সাব্যস্ত হবে। সামা শেষে স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন, "কোন সামাটি তোমার বেশি ভালো লেগেছে।" স্ত্রী বললেন, "আমি কোনটিই শুনতে পাই নি। যে শপথ তুমি দিয়েছো সে কারণে আমি প্রদীপের দিকে মনোযোগী ছিলাম। সামা শুনতে পারি নি। " ফকির বললেন, "যে ভাবে সামা অনুষ্ঠানে বসে থেকেও তুমি সামা শুনতে পাও নি , সেভাবেই আমি অন্ন ও নারী স্পর্শ করি না।" এ গল্পে ফানার একটা প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত বর্ণিত হয়েছে। প্রতিদিন খেয়ে অন্ন গ্রহণ না করা, সন্তান থাকা সত্ত্বেও নারী স্পর্শ না করা এবং সামার আসরে বসেও সামা শুনতে না পারা ফানার একটা প্রকৃষ্ট উদাহরণ। (চিশতি[২৭], পৃ: ৩৫)

হজরত মোজাদ্দেদে আল-ফেছানি (রহঃ) সহ অধিকাংশ সুফি সাধক ফানা লাভ করতে ৪টি সোপান পারহবার কথা বলেছেন । এগুলো হলো :

১) ফানা ফিন্নাস বা ফানা ফিল ওজুদ : এ স্তরে যাবতীয় নফসে আম্মারাহ্, কু-প্রবৃত্তি, দৈহিক ও জাগতিক কামনা-বাসনা, লোভ-লালসা ও আকর্ষণ ধ্বংস করে। অর্থাৎ

ষড়রিপুকে প্রদমিত করে অহং বা আমিত্বকে গুড়িয়ে দিয়ে ঐশী গুণাবলী লাভ করা এ স্তরের কর্ম।

২) ফানা ফিশ শায়েখ : এ স্তরের সাধকের কাজ হলো একজন পূর্ণ মানবের (ইনসানুল কামেল) কাছে আত্মসমর্পণ করে তার গুণাবলী লাভ করা এবং তাঁর আদেশ নিষেধ মেনে চলা। এ স্তরে পিরের চেহারা ধ্যান করতে সুফি শিক্ষকগণ নির্দেশ দান করে থাকেন।

৩) ফানা ফির রাসুল : এ স্তরে সাধক রাসুলের (স:) গুণাবলী লাভ করে তাঁকে প্রেম লাভ করার সাধনা করেন। ধ্যানের মাধ্যমে সাধক রাসূলের (স:) চেহারা বা নুর-ই-মুহাম্মদির সাক্ষাত লাভ করেন। আল-ফেছানি (রহঃ) এ স্তরটির প্রতি সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে বলেছেন এই পর্যায়ে সাধক রাসুলে পাক (স:) বেলায়েত অর্জন করতে পারে। তবে সাধক কখনো শরিয়াতের বরখেলাপ করতে পারবে না।

৪) ফানা ফিল্লাহ : এ স্তরে নুর-ই-মুহাম্মদির মাধ্যমে নুর-ই তজল্লি লাভ করা যায়। এ স্তরে সাধক ধ্যান ও তন্ময়তার মাধ্যমে আত্ম-চেতনাকে মুছে ফেলে আল্লাহ্‌র জাতের (Sell) অসীম চেতনায় উন্নীত হন এবং তিনি আল্লাহ্‌র প্রেমে সমাহিত হন।

কবি এখানে যে দায়িত্ব বাকি রয়েছে বলে বুঝিয়েছেন। জীবনের পরিক্রমায় মানুষের দায়িত্ব অপরিসীম। এসব দায়িত্ব পালনে মানুষ ময়লাযুক্ত হয়। আদিতে প্রত্যাবর্তনের পূর্বে সকল ময়লা ধুয়ে ফেলে পরিচ্ছন্ন অবস্থায় প্রেমাস্পদের কাছে যেতে হয়। সুগন্ধি ব্যবহারের জন্য রাসুলের নির্দেশের মূলভাব এটাই । সুগন্ধযুক্ত হলেই সাধক ফানা প্রাপ্ত হয়। (চিশতি[২৭], পৃ: ৩৩)

রুমি তাঁর কাব্যে ফানাতত্ত্বের ব্যাপক আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন :

الله گفت و الله مي شود

اين سخن كي باور مردم مي شود

(চিশতি[২৭], পৃ: ৩৪)

উচ্চারণ ঃ

আল্লাহ্ আল্লাহ্ গোফত ও আল্লাহ মী শাভাদ,
ইন সুখান কেই বা'ভারে মারদম মী শাভাদ ॥

অর্থাৎঃ

আল্লাহ আল্লাহ জপতে মানুষই আল্লাহময় হয়ে যায়,
একথা কি করে সাধারণ লোক বিশ্বাস করবে ॥

হাদিসে কুদসিতে তাঁর এ কথার সমর্থন রয়েছে। মহিমান্বিত আল্লাহ বলেন :

যখন আমার বান্দা নফল ইবাদত দ্বারা আমার নৈকট্য লাভ করে, তখন আমি তাকে এমন ভাবে বন্ধু বলে জানি যে, আমি তার কর্ণ হই, যদ্বারা সে শ্রবণ করে, আমি তার চক্ষু হই যাদ্বারা সে দর্শন করে, আমি তার হস্ত হই, যাদ্বারা সে ধরে, আমি তার পদযুগল হই, যাদ্বারা সে চলে (রশিদ[৫৭] , পৃ: ১৬৪ ও ১৭৭)। এ উপমহাদেশে আউলিয়াকুল শিরোমণি হজরত খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতি বলেছেন :

خواهي كه رخش بيني در چهرة من بنگر
من آيينة او يم او نيست جدا از من

(চিশতি[২৭], পৃ: ৩১২)

উচ্চারণ ঃ

খা'হী কে রোখাশ বীনী দার চেহরেয়ে মান বেনগার,
মান ওয়িনেয়ে উ ইয়াম উ নিস্ত জোদা' আয মান ॥

অর্থ ঃ

তুমি যদি তার চেহারর দেখতে চাও, আমার চেহারার দিকে তাকাও,
আমি তারই দর্পন, সে আমার থেকে পৃথক নয় ॥

খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতির সিলসিলার প্রখ্যাত সুফি সাধক আমির খসরু দেহলবি (র:) বলেন :

মান্ তো শোদাম তো মান শোদী মান্ তান্ শোদাম্ তো জা'ন শোদী
তা' কাস্ না গোইয়াদ বাদ্ আয ঈন মান দীগারাম তো দীগারী

অর্থ ঃ

আমি তুমি হলাম, তুমি আমি হলে, আমি দেহ হলাম, তুমি প্রাণ হলে,
এরপর কেউ যেন বলতে না পারে, আমি একজন তুমি আরেকজন।

বাকা তত্ত্ব :

শাহরিয়ার তার কবিতায় বারাবার 'বাকা' শব্দটি নিয়ে এসেছেন। 'বাকা' শব্দটিও আরবী। এর অর্থ হলো আল্লাহতে স্থিতি লাভ করা (one with Allah) । ফানাফিল্লাহ্ অবস্থায় যখন সাধক স্বকীয় অস্তিত্ব বোধ হারিয়ে ফেলে তখন তার 'আপনাতে আপনার কিছুই থাকে না'। এ অবস্থায় সেখানে আল্লাহ্ই বিরাজ করেন। সাধক আল্লাহতে ফানা হবার পরই বাকার স্তরে উন্নীত হতে পারে। ফানায় যখন 'শূণ্যত্বের শূণ্য' সৃষ্টি হয় তখনই বাকা সেখানে ফিতরাল্লাহ (আল্লাহর প্রকৃতি ও স্বভাব) এবং তাঁর অস্তিত্বের অনুরূপ রূপ প্রকাশ পায়। সে জন্যই আল্লাহ তায়ালা বলেন :

طرت الله التي فطر الناس عليها

অর্থাৎ ঃ আল্লাহ মানুষকে তাঁর নিজের ফিতরাতে সৃষ্টি করেছেন (কুরআন-৩০ঃ৩০)।

হাদিসের কুদসিতে আল্লাহ বলেন, নিশ্চয়ই আমি আদমকে স্বীয় আকৃতিতে (সুরতে) সৃষ্টি করেছি। (গাজ্জালী, পৃ: ৩৫২)

মানুষ আল্লাহর প্রতিনিধি। প্রতিনিধিকে নিধির মতোই হতে হয়, না হয় প্রতিনিধি হওয়া যায় না। ফানাফিল্লাতে বিনাশন বা ধ্বংস। অপরপক্ষে বাকাবিল্লাতে পুনর্জীবন লাভ। সেজন্যই ফানা স্তর নঞর্থক (Negative) , আরা বাক সদর্থক (Positive) । বাকা অবস্থাকে একটা উদাহরণ দিয়ে এভাবে বলা যায় যে, যদি এক বালতি পানি নদীতে ঢেলে দেয়া হয় তাহলে নদী থেকে আমরা এক বালতি পানি তুলতে পারবো সত্য, কিন্তু প্রথমে বালতিতে যে পানি ছিল তা আলাদা করে তুলে আনা সম্পূর্ণ অসম্ভব। এরূপভাবে আল্লাহতে স্থিতিকে বাকা বলে (রশিদ[৫৭], পৃ: ১৭৪; সরকার[৭২], পৃ: ৩৮৫) । জালালুদ্দিন রুমি বাকা সম্পর্কে বলেন :

اگر گردي تو در توحيد فاني

با حق ياري باقي زندگاني

(চিশতি[২৭], পৃ: ৪০)

উচ্চারণ ঃ

আগার গারদী তো দার তাওহীদ ফা'নী
বা হাক্কে ইয়া'রি বা'ক্বী যেন্দেগা'নী ॥

অর্থ ঃ

ফানা হয়ে যদি তাঁর তওহিদের সাগরে নিমজ্জিত হতে পারো,
তবে বন্ধুরূপে তুমি তাঁরসত্তায় স্থিতি (বাকা) লাভ করতে পারবে ॥

শাহরিয়ারও বাকা তত্ত্বকে ঠিক এভাবেই উপস্থাপণ করেছেন। তার মতে বাকার স্তরে উন্নীত হতে পারলে মানুষের পক্ষে অবিনশ্বর জীবন লাভ করা সম্ভব। তিনি বলেন :

نميري شهريار از شعر شيرين روان گفتن
كه از آب بقا جويند عمر جاودانى را

(শাহরিয়ার[৬৬], ১ম খন্ড, পৃ: ৮৮)

উচ্চারণ ঃ

নামীরী শাহরিয়া'র আয শে'রে শীরীন রাভা'ন গোফতান,
কে আয অ'বে বাকা' জুইয়ান্দ উমরে জা'ভদা'নি রা' ॥

অর্থ ঃ

শাহরিয়ার গতিময় মিষ্টি কবিতার জন্য তুমি মরবেনা,
আর বাকার অমিয় সুধা থেকে তুমি অবিনশ্বর জীবন চেয়েছ ॥

মূলত বাকা বা স্থিতি অর্জনই মানুষের মূল সত্তার দিকে যাওয়া । সব কিছুই মূলের দিকেই ধাবিত হয়। এটাই পরম সত্য । রুমি তাঁর মসনভির শুরুতেই এ সত্য প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন :

بشنو از نى چون حكايت مى كند
وز جدايى ها شكايت مى كند
كز نيستان تا مرا ببريره اند
وز نفيرم مرد و جان ناليده اند
هر كسي كو دور ماند از اصل خويش
باز جويد روزگار وصل خويش

(মাওলাভি[৪৯], প্রথম দফতর, পৃ: ৫)

উচ্চারণ ঃ

বেশনো আয নেই চোন হেকা'য়াত মী কোনাদ,
আয জোদা'য়ী হা' শেকা'য়াত মী কোনাদ।
কায নেইয়েস্তা'ন তা' মারা' বেবরুদে আন্দ,
ভয নাফীরাম মারদ ও জা'ন না'লিদে আন্দ।

হার কাসীকো দূর মা'ন্দায আসলে খীশ,
বা'য জুইয়া'দ রুযেগা'রে ভসলে খীশ ॥

অর্থঃ

কান পেতে শোন বাঁশী কী বলছে,
সে বিরহ-বিচ্ছেদের অভিযোগ করছে।
যখন আমাকে বাঁশবন হতে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে,
আমার কান্না ও আর্তনাদে নারী পুরুষ সবাই কেদেছে।
যে আপনজন থেকে দূরে অপসারিত হয়েছে,
সে পুনরায় হৃত মিলন অন্বেষণ করেছে ॥

শাহরিয়ারের মতেও মূল সত্তার সাথে সংশ্লিষ্ট হতে না পারলে বাকার স্তরে উন্নীত হওয়া সম্ভব নয়। তিনি বলছেন :

نمانده چشمة آب بقا به طلمت دهر
به جز چراغ جمال بقيت الهي

(শাহরিয়ার[৬৬], ১ম খন্ড, পৃ: ৪৩০)

উচ্চারণ ঃ

নামা'ন্দে চাশমিয়ে অ'বে বাকা' বে যুলমাতে দাহার,
বে জুয চেরা'গে জামা'লে বাক্বিয়াতে এলা'হী ॥

অর্থ ঃ

জগতের অন্ধকারে বাকার ঝর্ণার পানি থাকত না,
যদি না খোদার সৌন্দর্যের প্রদীপের সাথে সংশ্লিষ্ঠ হতে পারত ॥

আল্লামা ইকবাল আবেগপ্রবণ কবি ও দার্শনিক । তিনি নিষ্ক্রিয় ও কর্মবিমুখ বৈরগ্যের বিরোধী । সে কারণে অনেকে তাঁকে সুফি বলে স্বীকার করে না মৃত্যুর পূর্বরাত্র অর্থাৎ ২০ এপ্রিল, ১৯৩৮ সনে তিনি তার জীবনের সর্বশেষ কবিতার শেষ দু পংক্তিতে লিখেছেন :

এ ফকিরের জীবন খেলা এখানেই হলো শেষ,
দোসরা তত্ত্বজ্ঞানী হয়তো আসবে, হয়তো আসবে নাকো।

তার কাব্যে তিনি আল্লাহ তত্ত্ব, সৃষ্টি তত্ত্ব, জগৎ-জীবন তত্ত্ব, খুদি(self) বা আত্মতত্ত্ব বিশেষভাবে আলোচনা করেছে। তাঁর ওপর পাশ্চাত্যের ভাববাদী দার্শনিকদের প্রভাব থাকলেও তিনি জালাল উদ্দিন রুমি কর্তৃক বেশি প্রভাবিত হয়েছেন বলে লিখেছেন, "রুমির প্রতিভা-দীপ্ত উদ্দীপ্ত করেছে আমাকে। " আল্লাহর প্রতি তাঁর আবেগ প্রবণতা অপরিমেয় । তার বক্তব্য হতে তা অনুমেয়। তিনি বলেন, "গুনাহ না করলে আমিই খোদা হতাম। আমার গুনাহ্ হতেই তোমার খোদায়ি প্রকাশ পায়। তোমার রহমত সর্বদা আমার গুনার মুখাপেক্ষী। আমি ব্যতীত তুমি কখনো খোদা হতে পারতে না। বাকাবিল্লার স্তরে উপনীত হয়েই তিনি নিজেকে লক্ষ্য করে বলেছেন :

কার নেশায় মত্ত হয়ে তুমি পাগলের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছো। তুমিই রাস্তা, তুমিই পথিক, তুমিই পথ নির্দেশকারী। তুমি বোকার মতো ভাবছো তোমাকে কেউ শরাব পান করিয়ে দেবে, তুমিই শরাব, তুমিই পেয়ালা, তুমিই সাকি এবং তুমিই মজলিস (আলম[১০], পৃ:৫৬০-৬৪; চিশতি[২৭], পৃ:৫৪) ।

শাহরিয়ার বাকা তত্ত্বের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে আহলে বেইতের সদস্যদের দৃষ্টান্ত উপস্থাপণ করেছেন। তার তার বাকার স্তরে উন্নীত হয়ে নিজেরা যেমন অবিনশ্বর জীবন লাভ করেছেন, অপর দিকে এই জগতকে তারাই স্থিতিশীল রেখেছেন। শাহরিয়ার বলেন :

به خدا در دو عالم اثر از فنا نماند
چو علي گرفته باشد سر چشمة بقا را

(শাহরিয়ার[৬৬], ১ম খন্ড, পৃ: ৬৯)

উচ্চারণ ঃ

বে খোদা' দার দো আ'লাম আসার আয ফানা' নামা'নাদ,
চো আলী গেরেফতে বা'শাদ সারচাশমেয়ে বাকা' রা' ॥

অর্থ ঃ

খোদার শপথ করে বলছি দুই জগতে ফানার কোন চিহ্ন নাই,
কারণ আলি ধারণ করেছেন বাকার উৎস কে ॥

তিনি হযরত খিজির (আ:) কে বাকার পথপ্রদর্শক হিসেবে জেনেছেন। তার মতে হযরত খিজির (আ:) এর অবিনশ্বর জীবন লাভের কারণ ছিল তিনি বাকর স্তরে উন্নতি হতে পেরেছিলেন। শাহরিয়ার বলেন :

در وادي فنايي و خضر تو تشيگي است
كو رهبري به چشمة آب بقا كند

(শাহরিয়ার[৬৬], ১ম খন্ড, পৃ: ২১৩)

উচ্চারণ ঃ

দার ভা'দেয়ে ফানায়ী ভা খিযির তো তেশনেগী আস্ত,
কু রাহবারী বে চাশমেয়ে অ'বে বাকা' কোনাদ ॥

অর্থ ঃ

ফানার উপত্যাকায় খিজির তুমি তৃষ্ণার্ত,
বাকার ঝর্ণার দিকে কখন তুমি পথ দেখাবে ॥

তিনি আরেক জায়গায় বলেন :

প্রকৃতপক্ষে ফানা ও বাকা একই জিনিসের দুটি দিক মাত্র। ফানা বাহ্যিক দিক, বাকা অভ্যন্তরিণ দিক। বাহ্যিক দিকের পরিবর্তনের ফলে অভ্যন্তরীণ দিক বা সত্তার দিক সাধক দেখতে পায়। সকল বাধা বা পর্দা উন্মোইচত হলে পরমসত্তাকে বিশ্বের অন্তর্ব্যাপী পরম ঐক্য-সত্তারূপে দেখা যায়। অন্য কথায় পর্দা দূর হলে পরম সত্তা নিজেকে প্রকাশ করে। এটাই বাকাবিল্লাহ, সাধকের সর্বশেষ স্তর । মোট কথা এ স্তরে সাধক আল্লাহর চিরন্তন, শাশ্বত ও অসীম সত্তায় স্থায়ীভাবে স্থিতি লাভ করেন।

আত্মা-দর্শন বা দেহ তত্ত্ব :

শাহরিয়ার আত্মদর্শন বা দেহ তত্ত্বের কথা বলেছেন। অর্থাৎ আল্লাহকে চিনহে হলে শুধুমাত্র প্রচলিত জ্ঞানের মাধ্যমে তাকে চেনা সম্ভব নয়। কারণ জ্ঞান সসীম আল্লাহ তায়ালা অসীম। সসীম দ্বারা অসীমকে আয়ত্ব করা সম্ভব নয়। তিনি বলেন :

به هوش باش كه با عقل حكمت محدود
كمال مطلق گيتي كجا توانى يافت
چه دانشي نه عرفان در او نه تسليم
دري بزن كه بدردت دوا توانى يافت

(শাহরিয়ার[৬৬], ১ম খন্ড, পৃ: ১৪২)

উচ্চারণ ঃ

বে হুশ বা'শ কে বা আক্বল ও হেকমাতে মাহদূদ,
কামা'লে মোত্বলাক্বে গীতী কোজা' তাভা'নি ইয়া'ফ্ত।
চে দা'নেশী কে না এরফা'ন দার উ ভা নেই তাসলীম,
দারী বেযান কে বেদারদাত দাভা' তাভা'নি ইয়া'ফ্ত ॥

অর্থ ঃ

সতর্ক হও সীমাবদ্ধ জ্ঞান ও দর্শন দ্বারা,
পুরো জগতের জ্ঞান কোথায় পাবে।
আর কোন জ্ঞান যাতে না আছে আধ্যাত্মকতা না আছে আত্মসমর্পণ,
দরজা লাগাও, তোমার ব্যথা থেকেই এর উপশম খুজে পাবে ॥

নিজেকে চিনতে হলে যে দুটো উপাদানে মহিমান্বিত আল্লাহ মানুষ সৃষ্টি করেছেন সে বিষয়ে জ্ঞান লাভ করতে হবে। মানুষ সৃষ্টির উপাদান দুটো হলো–১. দেহের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ দৃশ্যমান জড় পদার্থ, ২. অভ্যন্তরীণ অদৃশ্যমান পদার্থ- যা আরবি ভাষায় 'রুহ', ফারসি ভাষায় ' দেল' বাংলা ভাষায় 'আত্মা' ইংরেজি ভাষায় Sprite বলে অখ্যায়িত এবং যা জ্ঞান চক্ষু ছাড়া দেখা যায় না। দেহের অভ্যন্তরীণ সে-ই পদার্থটি মানুষের মূল উপাদান এবং সে-ই পদার্থটিই প্রকৃতপক্ষে মানুষটি। এছাড়া আর যা কিছু মানব দেহের ভেতরে ও বাইরে রয়েছে তা উক্ত মূল পদার্থের অধীনস্থ খেদমতগার বা আজ্ঞাবহ সেবক ।

মানুষ রাসূলের (সঃ) কাছে আত্মার তথ্য জানতে চাইলে মহিমান্বিত আল্লাহ বলেন :

يسئلو نک عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا

অর্থাৎ ঃ "মানুষ আপনাকে রুহু সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, আপনি বলে দিন রুহু আমার প্রভুর আদেশ মাত্র এবং তোমদের (এ বিষয়ে) সামান্য জ্ঞানই দেয়া হয়েছে" (কুরআন-১৭ঃ৮৫)।

পবিত্র আয়াতটির প্রতি লক্ষ্য করলে প্রতীয়মান হয়ে যে, আত্মা সংক্রান্ত আলোচনা নিষিদ্ধ করা হয় নি, বরং বলা হয়েছে 'সামান্য জ্ঞান' দেয়া হয়েছে। যেখানে সামান্য জ্ঞান দেওয়া হয়েছে সেখানে অন্তত পক্ষে সামান্য চিন্ত-ভাবনার সুযোগ রয়েছে।

তবে এই দেহের সাথে আত্মার নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। দেহ লাভের পূর্বে আত্মা ন্যূনতম বৈশিষ্ট্যের অধিকারী থাকে। অতঃপর দেহকে আশ্রয় করেই আত্মা বিকাশ লাভ করে ও নিজ তৎপরতা চালায়। যদিও আত্মাই দেহকে পরিচালনা করে, কিন্তু যতক্ষন দেহের চলৎশক্তি আছে ততক্ষনই তাকে চালানো সম্ভব। অন্যদিকে রুহের হ্রাস-বৃদ্ধি ও বিকাশ সম্ভব। ফলে তা বিচার-বুদ্ধিগতভাবে বিভাজনযোগ্য এ অর্থে যে, একটি রুহের কোন বিশেষ গুণ নাও থাকতে পারে যা অন্য রুহের আছে। এ অর্থে বিভাজ্য নয় যে, তার এক অংশকে কেটে অন্য অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায়, কারণ রুহ বস্তুগত নয় যে তা সম্ভব হবে (মজিদী[৫৫], পৃ: ৫০-৫৩)

রাসুল (সঃ) সাধারণ লোকের সামনে ভাষায় আত্মার ব্যাখ্যা দেন নি। তবে বিশেষ ক্ষমতাশীল মানুষের জ্ঞান চক্ষু ফুটিয়ে দিয়ে আত্মার প্রকৃত স্বরূপ মানুষকে প্রত্যক্ষভাবে দেখিয়ে দিয়েছেন (গাজ্জালী[২৬], ১ম খন্ড , পৃ:৩০)। ফলে 'আমানুষগণের' জন্য আত্মর পরিচয় লাভের চেষ্টা করার কোন প্রয়োজন নেই। এমনকি 'সালেকগণের জন্যও এ বিষয় জ্ঞান লাভের চেষ্টা করা নিরর্থক। সাধনায় প্রবৃত্ত হয়ে কঠোর পরিশ্রম ও সংযমের মাধ্যমে যারা মুমিনত্ব লাভ করেত সক্ষম হয়েছেন তাদের কাছে আত্মার পরিচয় ও তত্ত্বজ্ঞানের দ্বার আপনা আপনিতেই উন্মুক্ত হয়ে যাবে। এ বিষয়ে কারো কাছে শিক্ষা বা উপদেশ গ্রহণের প্রয়োজন হয় না। পবিত্র কুরআনে মহিমান্বিত আল্লাহ বলেন :

والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا। (কোরআন, ২৯ঃ৬৯)

অর্থাৎ ঃ 'যারা আমার উদ্দেশ্যে সাধনা ও পরিশ্রম করবে আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথ প্রদর্শন করবো"

এ ক্ষেত্রে শাহরিয়ার বলেন :

جمال معرفت از خواب جهل بيداري است
بجوي جوهر خود تا جلا توانـي يافت

(শাহরিয়ার[৬৬], ১ম খন্ড, পৃ: ১৪১)

উচ্চারণ ঃ

জামা'লে মারেফাত আয খা'বে জেহেল বিদা'রী,
বেজু জওহারে খোদ জালা' তাভা'নি ইয়া'ফত ॥

অর্থ ঃ

অজ্ঞতার ঘুম থেকে জেগের ওঠার মঝেই মারেফাতের সৌন্দর্য
তুমি তোমার নিজস্ব সম্পদ খুজে দেখ আলো খুঁজে পাবে ॥

যে ব্যক্তি এখনো ধর্মে-পথে পূর্ণ সাধনা করে নি তার কাছে আত্মতত্ত্ব বিশ্লেষণ করা উচিত নয়। তবুও শরিয়তের নির্দিষ্ট পথে পরিশ্রম করার পূর্বে মানব দেহে আত্মার আজ্ঞাবাহি পরিচারকগুলোর পরিচয় লাভ করা প্রয়োজন। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, মানব দেহ আত্মার রাজ্য। এ রাজ্যে রাজত্ব পরিচালনা করতে আত্মার বহুবিধ সেনাবাহিনী রয়েছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন :

''তিনি ব্যতীত আপনার প্রভুর বাহিনী সম্বন্ধে আর কেউ অবগত নয়" (৭৪ঃ৩১)।

এ আয়াতে জুনাদা' শব্দ দ্বারা দেহ রাজ্যের সৈন্যবাহিনীকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে (গাজ্জালী[২৬], ১ম খন্ড,পৃ: ৩১-৩২)।

যদি কেউ মনে করে বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমূহ এবং অভ্যন্তরীণ অঙ্গসমূহ (আজকাল চিকিৎসা বিজ্ঞানের বদৌলতে মানুষ দেহের অভ্যন্ড়রের সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সম্পর্কে জানতে পারে) ও অভ্যন্তরীণ কিছু কিছু অবস্থা , যেমন- ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ক্রোধ সম্পর্কে উপলব্ধি করতে পারে বলে নিজকে চিনতে পেরেছে তা হলে তা ভূল ধারণা হবে। দেহতত্ত্ব বা আত্ম-দর্শন এত সহজ সাধ্য বিষয় নয়। মূলত বিষয়টি আরো গভীরতর প্রশ্ন সম্বলিত, যেমন আমি কে? কোথা থেকে এসেছি? কোথায় যাবো? কেন আমার পৃথিবীতে আগমন? কিসে আমার সৌভাগ্য নিহিত? কিসে আমার দূর্ভাগ্য নিহিত? আমার দেহের উপদান কি? আমি মরে গেলে আমার দৈর্ঘ-প্রস্থ-ওজন কিছুই কমে যায় না অথচ কি একটা বেরিয়ে গেলে সম্পূর্ণ দেহ অসাড়- নিশ্চল হয়ে যায়, দেহ পঁচে বিনষ্ট হয়ে যায়। এসব প্রশ্নের জবাব খোঁজাই দেহ-তত্ত্ব বা আত্ম-দর্শনের মূল প্রতিপাদ্য । এসব প্রশ্নের জবাব খুঁজতে গেলেই নিজেকে চেনা যায় এবং প্রভূর মাহাত্ম্য ও স্বরূপ উপলব্ধি করা যায়।

গাজ্জালী মানব দেহে পাঁচটি বহিরিন্দ্রিয়, যথা- চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, নাসিক্য, ত্বক এবং পাঁচটি অভ্যন্তরীণ ইন্দ্রিয়ম, যথা- ধারণাশক্তি, চিন্তাশক্তি, স্মরণমক্তি, কল্পনাশক্তি ও ভূলের পর স্মরণশক্তি- এ দশটি ইন্দ্রিয় সাব্যস্ত করেছেন। মূলত অভ্যন্তরীণ পাঁচটি শক্তি মস্তিস্ক থেকে উদ্ভূত। ফলে মস্তিস্কে একটা ইন্দ্রিয় ধরে নিলে ৬টি ইন্দ্রিয় হয়। এসব সৈন্য ছাড়াও দেহের হাত,পা, দাঁত, পাকস্থলীম, হৃদপিন্ড ইত্যাদি সৈন্যগণ যার যার কাজে নিয়োজিত আছে। আত্মার রাজ্যের ৬টি গোলযোগ সৃষ্টিকারী সৈন্যও রয়েছে। এরা রিপু নামে খ্যাত। এরা হলো- কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য। এসব প্রবৃত্তি বা রিপু মানুষকে বিশেষভাবেপরিচালিত করে। এদের গতিবিধির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা এবং এদেরকে বশীভূত করে প্রদমিত করতে না পারলে এদের প্রভাব আত্মার মধ্যে এমন এক অবস্থা বা আখলকের উদ্ভব করবে যা পরকাল পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে। করণ যে সব কার্য থেকে অসৎ বা মন্দ স্বভাবের (আখলাখ) উৎপত্তি হয় তাকে পাপকার্য বলে। অপরপক্ষে যে সব কার্য থেকে মহৎ গুণাবলী বা সৎ স্বভাবের উৎপত্তি হয় তাকে পূর্ণকর্ম বলে।

শাহরিয়ার বলেন :

سري به سينة خود تا صفا تواني يافت
خلاف خواهش خود، تا خدا تواني يافت

(শাহরিয়ার[৬৬], ১ম খন্ড, পৃ: ১৪১)

উচ্চারণ ঃ

সের্‌রি বে সীনেয়ে খোদ তা' সাফা' তাভা'নি ইয়া'ফ্‌ত,
খেলা'ফে খা'হেশে খুদ তা' খোদা' তাভা'নী ইয়া'ফ্‌ত ॥

অর্থ ঃ

নিজের বুকের মধ্যে পরিচ্ছন্নতার রহস্য খুঁজে পাবে,
নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে চলে খোদা কে খুঁজে পাবে ॥

মানুষের আত্মা স্বচ্ছ আর্শির ন্যায় উজ্জ্বল পদার্থ। মন্দ স্বভাব আত্মার ভেতর প্রবেশ করে আত্মার সামনে একটা কালো পর্দা ঝুলিয়ে দেয়। ফলে মানুষ মহিমান্বিত আল্লাহর কুদরত দর্শণ থেকে বঞ্চিত হয়।

অপরপক্ষে যাদের আত্মার অভ্যন্তরে মহৎ স্বভাব প্রবেশ করে তাদের আত্মা সৌন্দর্যমন্ডিত ও স্বচ্ছ থাকে। তারা আল্লাহর মাহিমান্বিত দরবার করতে সক্ষম হয়। এজন্যই আল্লাহ বলেছেন :

"নিস্কলঙ্ক আত্মা সহকারে আল্লাহর দরবারে আগমনকারি ব্যতীত আর কেউ মুক্তি পাবে না" (কুরআন-২৬ঃ৮৯) ।

পবিত্র কুরআনে এ আয়াতের যে অর্থ দাড়ায় তা হলো-জীবদ্দশায় আত্মাকে স্বচ্ছ রাখার জন্য রিপু প্রদমিত করে সৎ স্বভাব সম্পন্ন হতে হবে। তাতে আল্লাহর তত্ত্ব-দর্শন লাভ ঘটবে। আল্লাহর তত্ত্ব-দর্শণ লাভ করতে না পারলে মুক্তি পাওয়া যাবে না। মুক্তি না পেলে জাহান্নাম অনিবার্য। তাহলে বুঝা যায় তত্ত্ব দর্শনের জন্য আত্মাকে প্রস্তুত করার উপায় মাত্র। এ বিষয়টুকু বুঝে আসলেই মানুষ নিজেকে চেনার চেষ্টা করবে। কিন্তু বস্তুবাদি জগতে মানুষ এমন ভাবে জড়িয়ে থাকে যে, এ বিষয়টি চিন্তা করার কোন সময়-সুযোগ নেই। নিজেকে চেনার চেষ্টা করাই হলো ধর্ম-আর ধর্ম হলো মুক্তির রাজপথ। বস্তুবাদের তথা জড়বাদের ধাক্কায় মানুষ এ প্রচেষ্টা থেকে সরে গিয়ে ধরে নিয়েছে যে, অন্য একজনের পিছনে দাড়িয়ে নামাজ পড়লেই ধর্ম পালিত হলো। আর কিছু করার প্রয়োজন নেই। নিজেকে চেনার অনেক সাধনার পথে নামাজ একটা উপায় মাত্র। প্রত্যেক ব্যক্তিকেই তার নিজোকে চেনার চেষ্টা করতে হবে। না হয় মুক্তির পথ কোথায়? মুর্শিদের কাছে গিয়ে নিজেকে চেনার পথ শিখে নিয়ে নিজেকেই চেষ্টা করতে হবে। নিজের চেষ্টা ছাড়া আত্মদর্শন ঘটবে না। মুক্তি লাভও হবে না, ফলে জাহান্নাম অবধারিত। বস্তুবাদের কারণে এ বিষয়গুলো আমাদের চিন্তা-চেতনা থেকে সরে গেছে। মহিমান্বিত আল্লাহ বলেন, "(আমার বাণী মিথ্যা বা গল্পগুজব)। কখনো নয়। কিন্তু স্বীয় অর্জিত কর্মের দোষে তাদের আত্মার ওপর মরিচা পড়েছে। " (কুরআন-৮৩ঃ১৪)। এ মরিচার কারণে আত্মতত্ত্ব বা দেহতত্ত্ব ও তত্ত্ব-দর্শন মানুষের বুঝে আসে না। অযত্নে পতিত লোহায় যেমন মরিচা পড়ে এক সময়ে লোহার সকল গুণাগুণ বিনষ্ট হয়ে যায়। ঠিক তদ্রুপ মন্দ স্বভাবের ফলে আত্মার এমন মরিচা পড়ে যাতে আত্ম স্বগুণ হারিয়ে কালিমা লিপ্ত হয়। দেহতত্ত্ব না বুঝলে আত্মার স্বচ্ছতা অর্জন করা যায় না (গজ্জালী[২৬], ১ম খন্ড, পৃ:৩৩-৬১)। ইমাম গজ্জালী দেহ ও আত্মার সম্পর্ক বিষয়ে যে মত পোষণ করেছেন অধিকাংশ মুসলিম দার্শনিক এ বিষয়ে একই অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

শাহরিয়ার বলছেন :

اگر خدا طلبيدي و يافتي در خود
اميد هست كه خود در خدا توانى يافت

(শাহরিয়ার[৬৬], ১ম খন্ড, পৃ: ১৪১)

উচ্চারণ ঃ

আগার খোদা ত্বালাবীদী ভা ইয়া'ফতি দার খোদ,
উমীদ হাস্ত কে খোদ দার খোদা' তাভা'নী ইয়াফত ॥

অর্থ ঃ

যদি খোদাকে অন্বেষণ কর তাহলে নিজের মধ্যেই তাকে খুঁজে পাবে,
আশা করা যায় তুমি নিজেই নিজেকে খোদার মঝে খুঁজে পাবে ॥

আল্লাহ তায়ালা বলেছেন قل الروح من امر ربي অর্থাৎ রূহ আমার আদেশ মাত্র, অর্থাৎ আল্লাহর সাথে রূহ কে নিসবত করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালার প্রতি কোন জিনিসের দু'প্রকার সম্পর্ক বা নিসবত পাওয়া যায়। প্রথম, অনুষঙ্গ ও গুণাবলীর সংযুক্তি বা নিসবত। যেমন : এলম, ক্ষমতা, কালাম, শ্রবণ, দর্শন প্রভৃতি গুণবাচক শব্দগুলির সম্পর্ক বা সংযুক্তিকে সিফাতি নিসবত বা গুণবাচক সংযুক্তি বলা হয়। আর্থাৎ এলম, কালাম, ইচ্ছা, ক্ষমতা, হয়াত ইত্যাদি শব্দগুলি আল্লাহর সিফাত বা গুন এবং তা অসৃষ্ট। এরই মাঝে চেহারা, হাত ইত্যাদি অন্তভুক্ত। দ্বিতীয় সংযুক্তি কোন অনুষঙ্গ বা গুন নয় বরং কোন মূলবস্তু বা ব্যক্তির সংযুক্তি যা সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ তায়াল থেকে পৃথক একটি সত্তা। যেমন : বায়ত (ঘর), নাকা (উষ্ট্রী), আবদ (দাস), রাসূল এবং রূহ। এসবের সংযুক্তি হল স্রষ্টার প্রতি সৃষ্টির সংযুক্তি বা খালেকের প্রতি মাখলুকের নিসবত। একে তাশরিফি নিসবত বা মর্যাদাসূচক সংযুক্তি বলা হয়ে থাকে। (জাওজিয়্যাহ্[৩০], পৃ: ২১৩)

আরব দার্শনিক আল-কিন্দির (৮১৩-৮৭৩ খ্রি:) মতে, মানুষের আত্মা অযৌগিক, অবিনশ্বর, আধ্যাত্মিক ও বুদ্ধিময় দ্রব্য। তিনি বলেন যে, বিশ্ব-আত্মা (the world soul) থেকে মানবাত্মা নির্গত(emanated) হয় এবং বুদ্ধি বা প্রজ্ঞার জগৎ থেকে এটা ইন্দ্রিয় অবতরণ করে। আত্মার দুটি রূপ : ক. জৈবিক আত্মা (animal soul) ও খ. বুদ্ধিময় আত্মা (rational soul) । জৈবিক আত্মার স্তরে মানুষ সৃষ্টির নিম্নস্তরের অন্যান্য ইতর প্রাণীর সাথে সংশ্লিষ্ট; কিন্তু বুদ্ধিময় আত্মা আসে আল্লাহ থেকে এবং সে কারণে এটা মৃত্যুর অধীন নয়, অবিনশ্বর। যদিও আত্মা দেহের সাথে মিশে আছে তথাপি মূলের দিক দিয়ে আত্মা দেহের উর্ধ্বে, দেহ থেকে স্বতন্ত্র, দেশ ও কালের বাঁধনে বাঁধা নয়। এটা বিশুদ্ধ অবস্থায় বিশ্ব-আত্মায় প্রত্যাবর্তন করে। মানব দেহ আত্মার হাতিয়ার মাত্র (আলম[১০], পৃ: ৩৯৯)।

মুয়াল্লিম সানি (দ্বিতীয় শিক্ষক) বলে পরিচিত মুসলিম দার্শনিক আল-ফারাবির(৮৭০-৯৫০খ্রিঃ) মতে আল্লাহর প্রতিবিম্ব (image) হলো প্রথম সৃষ্ট শক্তি (First Created Sprit) এবং প্রথম সৃষ্ট শক্তি থেকে আসে আরো আটটা শক্তি। এ নয়টি শক্তি দ্বিতীয় স্তরের সত্তা। তৃতীয় স্তরে রয়েছে প্রজ্ঞা (Reason), এটাকে পবিত্র শক্তি (Holy Sprit) বলা হয়। চতুর্থ স্তরে রয়েছে আত্মা। প্রজ্ঞা ও আত্মা মৌলিক একত্বে বিরাজ করে না, মানুসের সংখ্যা অনুপাতে বর্ধিত হয়ে থাকে। আত্মা আকার বিহীন ও অজড় হলেও দেহের সাথে সম্পর্কযুক্ত । আল-ফারাবির মতে, মানুষ দুটি দ্রব্য দ্বারা গঠিত : দেহ ও আত্মা (Soul) । দেহ বিভিন্ন অংশের সমবায়ে গঠিত এবং এটা পরিমাপ্য ও বিভাজ্য । কিন্তু আত্মা এসব গুণের অতীত। দেহ সৃষ্টি জগতের ফল (Product) আর আত্মা অতীন্দ্রিয় জগতের স্বতন্ত্র বুদিধবৃত্তির অন্তর্ভূক্ত শক্তি। দেহ পরিপূর্ণতা লাভ করতে সমর্থ নয়, এর পরিবর্তনগুলো আত্মার ক্রিয়ার ফল। আত্মা উপকরণ আর দেহ হলো আধার। আত্মা অপরিবর্তনীয় কিন্তু এটা জড়ের মধ্যে পরিবর্তন আনয়ন করে। আত্মার মধ্যে কোন ইন্দ্রিয়ের প্রয়োজন হয় না, কিন্তু দেহের ক্রিয়াকে পূর্ণতা দানের জন্য আত্মা বিভিন্ন দৈহিক অঙ্গকে ব্যবহার করে। কাজেই আসল মানুষ হলো Sprit বা আত্মা।

ইবনে মাশকাওয়ার (মৃত্যু ১০৩০ খ্রিঃ) মতে, জড়ের নিশ্চিত গুণ হলো-একই সময়ে জড় দুটি আকার ধারণ করতে পারে না। কিন্তু আত্মা একই সময়ে বহু আকার জানতে পারে অর্থাৎ একই সময়ে অনেক বস্তু বা গুণের সংবেদন লাভ করতে পারে। কাজেই আত্মা জড় হতে পারে না। আত্মার

আধ্যাত্মিকতা এর অমরতা নির্দেশ করে এবং দৈহিতক অঙ্গসমূহকে নিয়ন্ত্রণ করে সমগ্র জ্ঞানের মধ্যে সংহতি স্থাপন করে। ইবনে সিনা (৯৮০-১০৩৭ খ্রিঃ), ইবনে আল-হায়সাম (৯৬৫-১০৩৯ খ্রিঃ), ইবনে হাজম (৯৯৪-১০৬৪ খ্রিঃ) ও ইবনে রুশদ (১১২৩-১১৯৮ খ্রিঃ) আত্মা সম্পর্কে আল-ফারবি ও ইবনে মাশকাওয়ার মত সমর্থন করেন (আলম[১০], পৃ:৩৯৩-৪৭৪) ।

পাশ্চাত্য দর্শনেও আত্মা কম আলোচিত নয়। পাশ্চাত্য দর্শনে আত্মা এবং দেহ ও আত্মার সম্পর্কে সম্বন্ধে যে ধারণা পোষণ করা হয় তা মুসলিম দর্শনের সাথে সংঘষ্ট নয়, বরং পরিপূরক । দর্শনের আদি পুরুষ সক্রেটিস আত্মার অমরত্ব স্বীকার করে পরকালের ধারণা দিয়েছেন। তিনি বলেন যে, মৃত্যুর পর আত্মা অন্য জগতে প্রস্থান করে। দেহ ও আত্মার সম্পর্ক জানার জন্য "Know thyself " তত্ত্ব তিনিই ব্যক্ত করেছিলেন। প্লেটো (খ্রিষ্টপূর্ব ৪২৭-৩৪৭) সক্রেটিসের ধারণাকে সুস্পষ্ট করে দার্শনিক ভিত্তির ওপর নির্ভর করে বলেন যে, আত্মা অমর। আত্মা যেহেতু দেহাতিরিক্ত এক আধ্যাত্ম সত্তা সেহেতু আত্মা অবিনশ্বর ও শাশ্বত । জড়দেহ আত্মার পিঞ্জর বা কয়েদখানা স্বরূপ। এরিষ্টটল (খ্রিষ্টপূর্ব ৩৮৪-৩২২) পেণ্ঢটোর ধারণা গ্রহণ করে বলেন যে, আত্মা একটা অজড়ীয় আধ্যাত্মিক দ্রব্য এবং এটা দেহের সাংগঠনিক শক্তি ও দেহের আকার। এরিষ্টটলের আত্মা সম্পর্কীয় মতবাদ মধ্যযুগের দার্শনিক প্লোটিনাস (২০৪-২৭০ খ্রিঃ) ও অগাস্টিনের (৩৫৪-৪৩০ খ্রিঃ) চিন্তায় বিশেষ বিস্তার লাভ করে। তাঁরা বলেন যে, মানবাত্মা বিশ্বাত্মার অংশ বিশেষ। দেহে প্রবেশ করার আগে আত্মা ছিল প্রজ্ঞা জগতের বাসিন্দা এবং সেখানে তা মগ্ন ছিল চিরন্তন 'নওস' বা বিশুদ্ধ প্রজ্ঞা-ধ্যানে। ঈশ্বরের দিকে দৃষ্টিপাত করে আত্মা লাভ করে কল্যাণের জ্ঞান। এরপর জগৎ ও জড়ের দিকে দৃষ্টিপাত করা মাত্রই তার পতন সূচিত হলো। মানবাত্মা জড় দেহের মধ্যে আবদ্ধ। এ করণেই তা জড়জগতের নিয়মাবলী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। মৃত্যুত আত্মা দেহের বন্ধন মুক্ত হয়ে প্রজ্ঞা জগতে ফিরে যেতে চায়। ইন্দ্রিয় প্রবৃত্তি দমনের মাধ্যমেই কেবল আত্মা তার বন্দীদশা থেকে মুক্ত হতে ও ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করতে পারে। আধুনিক ইউরোপীয় দার্শনিক দেকার্ত (১৫৯৬-১৬৫০ খ্রিঃ), বার্কলি (১৬৮৫-১৭৫৩খ্রিঃ), হেগেল (১৭৭০-১৮৩১ খ্রিঃ), কান্ট (১৭২৪-১৮০৪ খ্রিঃ), স্পিনোজা (১৬৩২-১৬৭৭ খ্রিঃ), সকলেই আত্মার অমরত্বার স্বীকার করেন এবং আত্মা অজড়ীয় আধ্যাত্মিক দ্রব্য বা পদার্থ বলে বর্ণনা করেন। তাঁর দেহ ও আত্মার সম্পর্ক বিষয়ে বিভিন্ন মতবাদ, যেমন : ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াবাদ, উপলক্ষবাদ, ঐক্যবাদ, উপসত্তাবাদ, দ্বিপার্শ্ববাদ, অভিন্নতাবাদ ইত্যাদি গড়ে তুললেও তার মূল সুর অভিন্ন। আত্মাই দেহের চালিকাশক্তি, আত্মাই হলো আসল মানুসটি এবং আত্মা দার্শনই মুক্তির প্রকৃত পথ এসব তত্ত্বে সবাই একমত পোষণ করেন (ইসলাম[১৫], ২৫১-২৭৯, বারী[৪৫], পৃ: ২২১-২৫৫)।

সাম্প্রতিককালের বস্তুবাদী আচরণবাদী দার্শনিকদের অধিকাংশই মনে করেন আত্মা জড়ের সৃষ্টি। এর কোন স্বতন্ত্র উচ্চতর মর্যাদা নেই। তারা মনে করেন মানুষ আর দশটি প্রাণীর মতোই প্রকৃতির সন্তান । কাজেই জড়দেহের অন্তরালে আত্মা বলে কিছু নেই । তাদের কাছে আত্ম-দর্শন বা নিজকে জানার চেষ্টা বাতুলতা মাত্র। অদি গুরু সক্রেটিসের তাদের কাছে মূল্যহীন, বা বৃথা প্রয়াস মাত্র। বস্তুবাদের কষাঘাতে এরা বুঝতে চেষ্টা করে না, যে, মানুষের চিন্তা-ভাবনা, স্বাদ-আহলাদ, আনন্দ-বেদনা প্রভৃতি মানসিক বৃত্তি অন্য প্রাণী বা পদার্থের মতো নয়। মানুষ স্রেফ একটা প্রাণী নয়। দেহ ছাড়াও সে সত্যাসত্য , ইস্টানিষ্ট, দয়া-মায়া , প্রেম-প্রীতি প্রভৃতি বিশেষ মূল্যবোধের অধিকারী। তার বিচার-বিবেচনা, ধ্যান-ধারণা,

নিজেকে জানা, অন্যকে জানা ও বস্তুবাদী দার্শনিকদের ধারণা দেহাবসানে সব শেষ-মরণোত্তর জীবন বা পরলোক বলতে কিছু নেই। কুরাানা দর্শন এসব ধারণাকে অমূরক অলীক প্রমাণ করেছে। মানুষ বলতে শুধু একটা মানব দেহকেই বুঝায় না । মানুষ মাত্রই একটা দেহের অধিকারী, কিন্তু এ দেহটাই সব নয়। দেহের অভ্যন্তর থেকে কিছু একটা চলে গেলে দেহ অষাঢ় হয়ে পড়ে। অথচ তখনো দেহটি অবিকল থাকে । তা সত্ত্বেও দেহটি দৈশিক, সামাজিক, আইনগত সর্ব প্রকার মর্যাদা হারিয়ে ফেলে। তাহলে দেহের অভ্যন্তর হতে যে জিনিসটি বেরিয়ে গেল, সকল মর্যাদার অধিকার সেই। দেহটি ফানুস মাত্র। এরপরও যারা দেহকেই সর্বস্ব মনে করে আত্মাকে অস্বীকার করে তার মানুষের মূল্যবোধকেই প্রাকান্তরে অস্বীকার করে। মৃত্যুতে দেহ বিনাশের সাথে সাথে যদি কিছু শেষ হয়ে যায় জীবনভর সংগ্রাম সাধনার মাধ্যমে অর্জিত সদগুণ ও মনুষত্ববোধ যদি মরণোত্তর কোন মর্যাদা না-ই পায় এর্ব নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধের (অর্থ্যাৎ স্রষ্টার প্রতি আনুগত্যের) যদি কোন দেহাতিরিক্ত স্থায়ী তাৎপর্য না থাকতো তাহলে মৃত্যুর তোয়াক্কা না করে মহৎ প্রাণ মানুষ অন্যায়ের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তো না। শুধু ইউরোপিয় যান্ত্রিক সভ্যতা এবং বস্তুবাদী ও ভোগবাদী দর্শন নয় ভারতীয় দর্শনেও কর্মবাদকে একমাত্র কাম্য ভাবা হয়েছে। কর্মবাদী দর্শনে কর্মের বইরে আর কোন কিছুর স্বীকৃতি দেয়া হয়নি।

শাহরিয়ার এই দর্শনের প্রচন্ড বিরোধিতা করেছেন। তার মতে মানবাত্মা কেবল জড়পদার্থ হতে পারেনা। মানুষের মাঝে আল্লাহ এমন কিছু সম্পদ দিয়েছেন যা তাবে আঠার হাজার মাখলুকাতের উপর শেষ্ঠত্ব দিয়েছে। তিনি বলেন :

بال همت و عشقم خود به عرش افشان
تا فرشته رشک آرد بر مقام انساني

(শাহরিয়ার[৬৬], ১ম খন্ড, পৃ: ৪১৩)

উচ্চারণ ঃ

বা'লে হেম্মাত ভা এশক্বাম খোদ বে আরশ আফশা'ন,
তা' ফেরেশতে রাশ্ক অ'ভারাদ বার মাকা'মে ইনসা'নী ॥

অর্থ ঃ

আমার মর্যাদা ও প্রেমের পাখা আরশ পর্যন্ত নিয়ে গেছে,
আর ফেরেস্তারা মানুষের মর্যাদায় ইর্ষান্বিত হয়েছে ॥

মূলত মানব জীবন সম্পর্কিত পাশ্চাত্য দর্শনগুলো একপেশে। ইসলাম দিয়েছে এর প্রকৃত সমাধান। যান্ত্রিক ও বৈষয়িক অগ্রগতির পামাপাশি সুনীতির মনন ও অনুশীলনে ব্রতী হতে তাগিদ দিয়েছে । আমল (কর্ম) ও আধ্যাত্মিক সাধনার মাধ্যমে আত্মদর্শন তথা নিজেকে চেনার মাঝেই মুক্তির পথ নিহিত বলে ইসলামের ঘোষণা। তাই তো রাসুল (স:) বলেছেন :

"মান আরাফা নাফমাহু ফাকাদ আরাফা রাব্বাহু"

অর্থৎ ঃ যে নিজেকে চিনেছে যে তার প্রভুকে চিনেছে (রহমান[৫৮], পৃ: ৪) ।

এতে যে ইঙ্গিত আছে, তা অত্যন্ত স্পষ্ট। যেহেতু নফস (ব্যক্তিসত্তা) ও রব উভয়ই অভিন্ন, লালনের বিভিন্ন গানেও এই সত্যটির প্রতি দৃঢ় প্রত্যয় পাওয়া যায়। 'এই মানুষের আছে রে মন, যারে বলে মানুষ রতন' – সে প্রত্যয়েরই অভিব্যক্তি। (আজরফ[৩], পৃ: ৩৩)

যদিও সুফিতত্ত্বে এবং ভারতীয় দর্শনে 'আত্মানাম বিদ্ধি' (আত্মাকে জান) বলে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তবুও লালনের মত এত স্পষ্ট ভাষায় অন্য কেউ এ মানুষ রতন তত্ত্ব প্রকাশ করেননি। দর্শনের এ সুত্র সম্বন্ধে লালন শাহের সঠিক ধারণার নির্দেশ রয়েছে অন্যান্য লালন সঙ্গীতে। আত্ম-সমালোচনা প্রসঙ্গে একটি সঙ্গীতে লালন বলেন :

সিরাজ শাহ বলে রে লালন
গুরু পদে ডুবে আপন
আত্মার ভেদ জানলে না,
আত্মা আর পরমাত্মা
ভিন্ন-ভেদ জেনো না
(হক[৭৮], পৃ: ৫৮)

মুসলিম দার্শনিকগণ নিজেকে চেনার যে সব পথ বলে দিয়েছেন পাশ্চাত্য দর্শন ও ভারতীয় দর্শনে একই সুর অনুরণিত হয়েছে। আত্মদর্শন তথ্য নিজেকে চেনার মাঝেই নিহিত রয়েছে হজরত খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতির 'মাটির পদা' সরিয়ে বন্ধুর সৌন্দর্য দেখার উপায়।

আত্ম-দর্শন সম্পর্কে হাছন রাজা অতি চমৎকার রাজা অতি চমৎকারভাবে বলেন:

মম আঁখি হতে পয়দা আসমান জমিন,
কর্ণেতে হইল পয়দা মুসলমানী দীন।
শরীলে করিল পয়দা শক্ত ও নরম,
আর পয়দা করিয়েছে ঠান্ডা ও গরম।
নাকেতে করিল পয়দা খোশ বয় বদ বয়,
আমি হতে সর্বোৎপত্তি হাছন রাজা কয়।
মরণ জীবন নাইরে আমার ভাবিয়া দেখ ভাই,
ঘর ভাঙ্গিয়া ঘর বানালি, এই দেখতে পাই।
জিহ্বায় বানাইচে মিঠা আর তিতা,
জীবন মরণ নাইরে দেখ সর্বদাই জিতা!
আপন চিনিয়ে দেখ খোদ চিনা যায়,
হাছন রাজার আপন চিনিয়ে এই গান গায়।
(এন্তাজ উদ্দিন, মরমী কবি হাছন রাজা, পৃ: ৬৫)

দুনিয়ার প্রতি অনিহা :

সালেকের আধ্যাত্মিক উন্নতির একটি গুরুত্বপূর্ন মাকাম হলো দুনিয়ার লোভ লালসাকে পরিত্যাগ করা। দুনিয়াবি চাওয়া-পাওয়া সালেকের জন্য আল্লাহর পথের পর্দা স্বরুপ। ইবনে আতাউল্লাহ বলেন :

''তোমার নির্জনে থাকার বাসনা, যদিও আল্লাহ তোমাকে আয়-উপার্জনের জন্য সংসারে জড়িয়ে রেখেছেন, একটি গোপন আবেগ। এবং তোমার সংসারের মধ্যে আয়-উপার্জনের বাসনা, যদিও

আল্লাহ তোমাকে নির্জনে থাকার সুযোগ করে দিয়েছেন, উচ্চাকাঙ্খা বর্জন করে নিম্নাভিমুখে যাত্রার মত।"(আতাউল্লাহ[৪], পৃ: ৬০)

পৃথিবীর প্রায় সকল সুফী সাধক দুনিয়া ত্যাগের জন্য মানুষকে উপদেশ দিয়েছেন। আল্লাহমুখি হতে হলে একজন সালেক কে অবশ্যয়ই দুনিয় বর্জন করতে হবে।

হযরত শেখ আব্দুল কাদের জিলানি (রঃ) বলেন :

"যখন তোমরা দেখিবে যে, দুনিয়াদারদের হাতে দুনিয়া তাহার অবাস্তব রূপ, জাহেরি নম্রতাও গোপনীয় কঠোরতা ও সংকটময় হওয়া সত্বেও সে দুনিয়াদারগণকে তাহার ধোকার শিকার করিয়া তাহাদিগকে ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করিতেছে এবং দুনিয়া তাহাদের জন্য জীবন নাশক বিষক্রিয়া প্রয়োগ করিতেছে। তথাপিও দুনিয়াদারগণ আপন পর সকল লোক হইতে দূরে তাকিয়া গাফলতের ও ওয়াদা ভঙ্গ করার শিকার হইয়া গিয়াছে, তখন তুমি সেই দুনিয়াদার ব্যক্তিগণকে এই ভাবের দৃষ্টিতে দেখ যেন একজন লোক উলঙ্গ অবস্থায় পায়খানা করিতেছে। আর তাহার চতুর্দিকে পায়থানার দুর্গন্ধ ছড়াইয়া পড়িতেছে। তুমি তখন এই দৃশ্য দেখিয়া চক্ষু বন্ধ করিয়া ফেল এবং নাক বন্ধ কর। ঠিক এমনিভাবে দুনিয়াদারদের জাহেরি রং-রূপ দেখিলে চক্ষু বন্ধ কর এবং তাহাদের খাহেশাত ও পার্থিব স্বাদ বোগের দুর্গন্ধ হইতে নাক বন্ধ করিয়া ফেলিবে, তাহা হইলে দুনিযার বিপদ হইতে তুমি রক্ষা পাইবে। তারপর তোমার ভাগ্যে যাহা আছে তাহা অবশ্যই তুমি লাভ করিবে এবং নিঃ সন্দেহে তুমি তোমার ভাগ্যে লিখা বস্তু ও সম্পদ ভোগ করিবে। যথা- আল্লাহ পাক স্বায় পয়গাম্বর আলাইহিস সালামকে আদেশ করিয়া এরশাদ করিয়াছেন : "হে নবী! আপনি ঐ সব বস্তুর প্রতি মোটেই নজর করিবেন না যাহা আমি কাফেরগণকে ভোগ বিলাসের জন্য পরীক্ষা মূলক দান করিয়াছি আপনার প্রভুর রিজিক অতি উত্তম।" (জিলানী[৩১], পৃ: ১৭)

হযরত শেখ সা'দী (রঃ) বলেন :

হে আহমক! ধর্মের বিনিময় কখনও দুনিয়া খরিদ করো না। বোধ হয়, তোমার জানা নেই যে, পশু-পাখি লোভের তাড়নায় পড়ে শিকারীর জালে আটকে যায়। চিতাবাঘ হিংস্র জন্তুদের মধ্যে প্রধান। সেও খাবারের লোভে শিকারীর জালে আটকে পড়ে। তুমি যার রুটি এবং পানি খাচ্ছ, ইঁদুরের ন্যায় তার জালে আবদ্ধ হয়ে পড়বে। (মানিরি[৫০], পৃ: ২৫২)

তিনি আরো বলেন :

একদিন আমাকে এক হাজী হাসেব হাতির দাঁতের একখানা চিরুণি দিলেন। আল্লাহ তাআলা হজিদের ওপর রহমত করুন, আমি একবার শুনেছিলাম যে, উক্ত হাজি সাহেব আমার থেকে কোন কষ্ট পেয়ে আমাকে কুকুর বলেছিল। আমি চিরুণিখানা নিক্ষেপ করে ফেলে দিলাম, আমার হাড়ের প্রয়োজন নেই। আমাকে পুনরায় কুকুর বলবে না। যখন- নিজের যা আছে, তা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারি, তবে জেনে রেখ হালুয়াওয়ালার অত্যাচার সহ্য করব না। অর্থাৎ যে অল্পতে তুষ্ট থাকে, তার অন্যের মুখাপেক্ষী হতে হয় না। অন্যের রূঢ় ব্যবহার সহ্য করতে হয় না। (মানিরি[৫০], পৃ: ২৫২)

হযরত আবু দারদা (রা:) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন :

''আমি দুনিয়া ও আখেরাতকে এক সাথে অর্জন করিতে চাহিয়া ছিলাম। এবং ইবাদত ও ব্যবসাকে একই সাথে মিলাইয়া দেই। কিন্তু হাজার চেষ্টা করিয়াও তাহা সম্ভব হইল না। অবশেষে দুনিয়াকে ত্যাগ করিয়া আখেরাত এবং ব্যবসা-বাণিজ্যকে বিদায় জানাইয়া ইবাদতের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া গেলাম। হযরত ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন কাহারো যদি দুনিয়া ও আখেরাত একই সঙ্গে একত্রিত হইত তাহা হইলে আমারই তাহা হইত। যে হেতু এরকম ক্ষমতা আল্লাহ পাক আমাকে দান করিয়াছেন। দুনিয়া পরিত্যাগের মাধ্যমে আমলের মূল্য বাড়িয়া যায়। যেমন- আল্লাহর নবী (সাঃ) ইরশাদ ফরমান যে আলেম দুনিয়া ত্যাগ করিয়াছে তাহার দুই রাকায়াত নামায সমস্ত আবেদের কিয়ামত পর্যন্ত ইবাদত আল্লাহর নিকট অধিক পছন্দনীয়। দুনিয়া পরিত্যাগ করার কারণে ইবাদতের যখন এরূপ মর্যাদা বাড়িয়া যায় তখন প্রত্যেক সন্ধানরি উচিত দুনিয়া ত্যাগ করা। তবে আমাদের জানা আবশ্যক যে, যুহদ কি? শোন! আমাদের আলেম সমাজের যুহদ দুই প্রকার। এক প্রকার যাহা বান্দার আয়ত্তাধীন। দ্বিতীয় প্রকার বান্দার আয়ত্তের বাহিরে।'' (মানিরী[৫০], পৃ: ৩৫৫)

হযরত আলি (রা:) বলেন :

হে আল্লাহর সৃষ্ট মানুষ! এ দুনিয়া থেকে দূরে থাকার জন্য আমি তোমাদের উপদেশ দিচ্ছি। তোমরা পছন্দ না করলেও দুনিয়া (শীঘ্রই) তোমাদের ত্যাগ করবে, তোমরা তোমাদের দেহকে সতেজ রাখার চেষ্টা করলেও বার্ধক্য তাকে গ্রাস করবে। তোমাদের দৃষ্টান্ত এবং দুনিয়ার দৃষ্টান্ত একজন পথিকের মতো। যে কিছু দূরত্বের পথ অতিক্রম করে এবং অত:পর দ্রুত অতিক্রম করলেও বা নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছার উদ্দেশ্য থাকলেও সেখানে সে দ্রুত পৌঁছে যায়। কোন নির্দিষ্ট স্থানের দিকে যাত্রা করালেও কত দ্রুত সে সেখানে পৌঁছে যায়। এ দুনিয়া কত সংক্ষিপ্ত, মাত্র একদিনের মতো। যা সে অতিক্রম করতে পারে না। মনে হয় একজন দ্রুতগামী চালক তাকে এই বিশ্ব থেকে প্রস্তান না করানো পর্যন্ত তাকে পরিচালিত করছে।

সুতরাং দুনিয়ার সম্মান ও গর্বের জন্য লালায়িত হয়ো না। এর সৌন্দর্য ও প্রাচুর্যতায় আনন্দিত হয়ো না বা এর ক্ষতি ও দুর্ভাগ্যের জন্য দুঃখ প্রকাশ করো না। কারণ এর সম্মান ও গর্ব শেষ হয়ে যাবে, এর সৌন্দর্য ও প্রাচুর্যতা ধ্বংস হয়ে যাবে এবং এর ক্ষতি ও দুর্ভাগ্য অতিক্রান্ড় হবে। দুনিয়ায় প্রতিটি কালের সমাপ্তি আছে এবং এখানকার প্রতিটি জীবন্ত বস্তু মৃত্যুবরণ করবে। তোমাদের পূর্বপুরুষদের স্মৃতিচিহ্ন কি তোমাদের জন্য সতর্ক হওয়ার নির্দেশ নয়, ঐ স্মৃতিচিহ্ন কি তোমাদের চোখ খুলে দেয় না, কোন শিক্ষা দেয় না? অবশ্য যদি তোমরা অনুধাবন করো।

তোমরা কি দেখতে পাও না যে, পূর্ববর্তীরা আর ফিরে আসে না, এবং জীবিত অনুসারীরা চিরকাল থাকে না? তোমরা কি দেখতে পাওনা যে, সকল ও সন্ধ্যায় বিভিন্ন অবস্থায় এ দুনিয়ার মানুষ অতিক্রম করছে? কেউ (কোথাও) মৃতের জন্য কাঁদছে, কেউ দুঃখ প্রকাশ করছে, কেউ দুর্দশায় জর্জরিত অবস্থায় আছে, কেউ পীড়িত ব্যক্তির খোঁজ খবর নিচ্ছে, কেউ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করছে, কেউ দুনিয়ার লোভে

লালায়িত, অথচ মৃত্যু তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। কেউ ভুলে আছে, অথচ মৃত্যু তাকে ভোলে না, আর পূর্ববর্তীদের পদাঙ্কের উপর জীবিতরা হেঁটে বেড়াচ্ছে।

সাবধান! মন্দ কাজ করার আগে আনন্দ ধ্বংসকারী, উপভোগ বিনষ্টকারী ও আকাঙ্খা হত্যাকারীকে (অর্থাৎ মৃত্যুকে) স্মরণ করো। আল্লাহর অধিকার পূরণে এবং তাঁর অসংখ্য নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করার জন্য তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করো। (তালিব[৩৪], পৃ: ৩৪০-৪১)

শাহরিয়ারের গযলে দুনিয়ার প্রতি নিন্দাবাদ দেখতে পাওয়া যায়। যেমন তিনি বলছেন :

نمي رسي به سر آب جز به وادي عشق
كه اين جهان فريبنده جز سرابي نيست

(শাহরিয়ার[৬৬], পৃ: ১৩৫)

উচ্চারণ ঃ

নেমী রাসী বে সার অব জুয বে ওয়াদীয়ে এশক্ব,
কে ঈন জাহা'নে ফারীবান্দে জুয সারা'বী নিস্ত ॥

অর্থ ঃ

প্রেমের উপত্যাকা ছাড়া পানির দেখা কোথাও পাবে না,
কারণ এই পৃথিবী ধোকাবাজ মরিচিকা ছাড়া আর কিছু নয় ॥

আরেক জায়গায় বলেন :

منصور زنده باد كه در پاي دار گفت
آسان گذر ز جان كه جهان پايدار نيست

(শাহরিয়ার[৬৬], পৃ: ১২৮)

উচ্চারণ ঃ

মানসুর যেন্দে বা'দ কো দার পা'য়ে দা'র গোফ্‌ত,
অ'সা'ন গোযার যে জা'ন কে জাহা'ন পা'য়েদা'র নিস্ত ॥

তওবা :

তওবা শব্দের আর্থ ফিরে আসা বা অনুশোচিত হওয়া। খাজা আব্দুল্লাহ আনসারি বলেন :

ميدان اول مقام توبه است و توبه ي بازگشتن است به خدا... و اركان توبه سه چيز است : پيشيماني در دل، عذر بر زبان و بريدن از بدي و بدان

অর্থাৎ ঃ সালেকের প্রথম মাকাম হলো তওবা আর তা হলো আল্লাহর পথে ফিরে আসা। তওবার রোকন হলো তিনটি : অন্তরের অনুশোচনা, মৌখিক ক্ষমা প্রর্থনা ও পাপ কাজ থেকে বিরত থাকা। বান্দা যখন আল্লাহর দরবারে তওবা করে আল্লাহ তার তওবা কে কবুল করে নেওয়ার অঙ্গিকার করেছেন। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে বলছেন :

وهو الدي يقبل التوبه عن عباده و يعفوا عن السيات و يعلم ما تفعلون . و يستجب الذين امنوا وعملوا الصالحات و يزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد (سوره شوري ٢٥-٢٦)

অর্থাৎ ঃ আর তিনিই (আল্লাহ) যিনি তাহার বান্দাগণের তওবা কবুল করে থাকেন এবং তিনি সর্বপ্রকার পাপাচার ক্ষমা করে দেন। তিনি তোমাদের সকল কাজকর্ম সম্পর্কেই অবহিত আছেন। আর তিনি ঈমানদার ও নেককর্মশীল বান্দাগণের এবাদত কবুল করে থাকেন। তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে অর, অতিরিক্ত দান করে থাকেন। আর কাফেরদের জন্য কঠিন শাস্তি নির্ধারিত আছে।

হযরত খাজা নিজামুদ্দিন আউলিয়া (রহ:) বলেন 'নিজের খারাপ কাজগুলোর জন্য তওবা কর, অনুশোচনা করা ও অনুতপ্ত হওয়া উচিত। তওবা করলে যৌবনেই করা উচিত। বৃদ্ধকালে মানুষ তওবা করবে না তো কি করবে? তার আর করার থাকেই বা কি? এরপর খাজা এ বেইত পাঠ করলেন :

چو پير شوي بر سر انجام آئي
آئي سر حرف خويش نا كام آئي
سازي خود را از تيره راهي
معشوق خود در بي نوائي

(এলাহী[১৭], পৃ: ২-৭)

উচ্চারণ ঃ

চো পীর শাভী বার সারে আনজা'ম অ'য়ী,
অয়ী সারে হারফে খীশ না' কা'ম অয়ী।
সা'যী খোদ রা' আয তীরে রা'হী,
মা'শুক খোদ দার বী নাভা'য়ী ॥

অর্থ ঃ

যখন বার্দ্ধক্য আসে তখন পরিণামের চিন্তা মাথায় আসে,
নিজের অকৃতকর্যতার চিন্তা আসে।
নিজের সম্পদের অন্ধকার পথের পথিক তুমি,
মাশুক তোমার দুনিয়, ঐশ্বর্যহীন ॥

শাহরিয়ার বলেন :

من خود خطا به توبه بپوشم تو هم بيا

گر توبه با خداي خطا پوش مي كني

(শাহরিয়ার[৬৬], পৃ: ৪২৩)

উচ্চারণ ঃ

মান খোদ খাতা' বে তাওবা বেপুশাম তো হাম বিয়া',
গার তাওবা বা' খোদা'য়ে খাতা'পুশ মী কোনী ॥

অর্থ ঃ

আমি তওবার দ্বারা আমার সকল ত্রুটি-বিচ্যুতিকে গোপন করব তুমিও আস
যদি তুমি ত্রুটি গোপন কারি আল্লাহর কাছে তওবা করতে চাও ॥

তিনি আরো বলেন :

از در توبه خطا پيشه دلا عذر گناه
عرضه با شاه گنه بخش خطا پوش كنيم

(শাহরিয়ার[৬৬], পৃ: ৩৩২)

উচ্চারণ ঃ

আয দারে তওবা খাতা' পীশে দেলা' উযরে গোনা'হ,
আরযে বা শা'হে গোনা বাখ্শ খাতা'পুশ কোনীম ॥

অর্থ ঃ

আপনি আমার পক্ষ হইতে বলিয়া দিন, হে আমার সেই বন্দাগণ! যাহারা নিজেদের উপর বাড়াবাড়ি করিয়াছ, তোমরা আল্লাহর রহমত হইতে নিরাশ হইও না। নিঃসন্দেহে, আল্লাহ সমস্ত গোনাহ ক্ষমা করিয়া দিবেন। নিশ্চয়ই, তিনি ক্ষমাশীল ও দয়াবান। আর তোমাদের উপর আসমানি আযাব নামিয়া আসার পূর্বেই তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের দিকে ফিরিয়া আস এবং তাঁহার অনুগত হইয়া যাও। অতঃপর তোমরা কোন দিক হইতেই সাহায্য পাইবে না।"

এই পবিত্র আয়াতটি ঈমানদারদের জন্য একটি অতি বড় আশা ও সান্তনা। ইহাতে মু'মিনদেরকে হুকুম প্রদান করা হইয়াছে যে, তাহারা যেন আল্লাহ তা'য়ালার রহমত হইতে নিরাশ হইয়া না পড়ে। কোটি কোটি গোনাহও আল্লাহ তা'আলার রহমত এবং ক্ষমাশীলতার সামনে কোন অস্তিত্ব রাখে না। সূরা ইউসুফে এরশাদ হইয়াছে :

"আর তোমরা আল্লাহর রহমত হইতে নিরাশ হইও না। নিশ্চয়, একমাত্র কাফের রাই তাঁহার রহমত হইতে নিরাশ হইয়া থাকে।" আর সুরা আলহিজর এর মধ্যে এরশাদ হইয়াছে :

"তিনি (হযরত ইবরাহীম আলাইহিসসালাম ফেরেশতাদের সহিত কথোপকথনের সময়) বলিলেন, কেবলমাত্র গোমরাহ লোক ব্যতিত স্বীয় প্রতিপালকের রহমত হইতে কে নিরাশ হয়।"

আল্লাহ পাকের সত্তা সর্বাপেক্ষা করুণাময় ও ক্ষমাশীল। তিনি সকল দয়াশীলদের মধ্যে সর্বাধিক দয়াপরয়ণ, মুশরেক ও কাফের ব্যতীত সকলকেই ক্ষমা করে দিবেন। যত পাপই সংঘটিত হয়ে যাক না কেন, তাঁর রহমত হতে কদাচ নিরাশ হবেন না, বরং সবসময় তওবার চেষ্টা অব্যাহত রাখবেন। তওবা

বার বার ভঙ্গ হতে থাকুক, তবুও সর্বক্ষণ তওবায় লিপ্ত থাকবেন। একদিন না একদিন ইনশাআল্লাহ খাঁটি তওবা নসিব হয়ে যাবে।

সগিরা গোনাহসমূহের মাগফেরাত এবং ইহার কাফফারা তো পুণ্য কর্মসমূহ দ্বারাও হতে থাকে, কিন্তু কবিরা গোনাহসমূহের নিশ্চিত মাগাফেরাত তওবার সহিত শর্তযুক্ত। যদি কেউ তওবা না করে, আর এইরূপ অবস্থায় তার মৃত্যু এসে যায়, তা হলে ঈমানের শর্তসাপেক্ষে তার মাগফেরাত তো হয়ে যাবে বটে, কিন্তু এটা জরুরি নয় যে, কোনরূপ শাস্তি ছাড়াই তার মাগফেরাত হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলা তো এমনিতেও ক্ষমা করে দিতে পারেন, কিন্তু তাঁর এই এখতিয়ারও আছে যে, পাপের শাস্তি বিধানের জন্য প্রথমে তাকে দোযখে পিক্ষেপ করবেন, তারপর শাস্তির মাধ্যমে পাক-পবিত্র করে জান্নাতে প্রেরণ করবেন। যেহেতু শাস্তির আশঙ্কাও লাগিয়া রহিয়াছে, এই জন্য সর্বক্ষণ খাঁটি তওবা ও ইস্তেগফার করতে থাকবেন এবং আল্লাহ তা'আলার নিকট সর্বদা ক্ষমার আশা পোষণ করবেন। তাঁর রহমত হতে কদাচ নিরাশ হবেন না। যেন এই অবস্থায় মৃত্যু সংঘটিত হয় যে, তওবার মাধ্যমে সবকিছু মাফ হয়ে গিয়েছে। কোন কোন লোক স্বীয় অজ্ঞতাবশত বলে ফেলে যে, আমরা শাস্তি করব। তারা কি জানে যে, দোযখ বস্তুটি কি ? হাদিস শরিফে এসেছে, দোযখের অগ্নির উত্তাপ এত বেশী যে, দুনিয়ার অগ্নির উত্তাপকে সত্তরবার একত্রিত করলে তবেই দোযখের অগ্নির সমান হবে। (এলাহী[১৭], পৃ: ২-৭)

আমরা দুনিয়ার অগ্নির মধ্যে এক মিনিটের জন্যও হাত রাখতে পারি না। এতদসত্ত্বেও আখেরাতের এত উত্তপ্ত অগুণের শাস্তি ভোগ করতে কিভাবে প্রস্তুত হয়ে যাই? পাপের জন্য যে সামান্য সুখ ও আনন্দ অনুভূত হয়ে থাকে, তাতে কি এত কঠোর শাস্তির মোকাবেলায় তা ত্যাগ করার জন্য নিজেকে উৎসাহিত করতে এবং তওবার প্রতি মনোযোগী হতে পারি না?

এই কথাটিও জানা থাকা উচিত যে, মাগফেরাতের সুসংবাদ শ্রবণ করে পাপা-চারের উপর হটকারিতা করা এবং এই আশায় সমানে পাপকর্ম চালাতে থাকা, এই জন্য যে মৃত্যুর পূর্বে তওবা করে ফেলব এটা অতি বড় মূর্খতা ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ, ভবিষ্যতের অবস্থা আমাদের জানা নো। এমনও তো হইতে পারে যে, তওবার অগেই মৃত্যু এসে পড়ল। অধিকিন্তু এটাও অভিজ্ঞতা দ্বারা দেখা গেছে যে, মৃত্যুর পূর্বে তওবা ও এস্তেগফারের সুযোগ শুধু সেইসব লোকদেরই নসিব হয়ে থাকে, যাঁরা পাপাচার হতে বিরত থাকার চিন্তা-ভাবনা রাখেন এবং কদাচিৎ যদি কোন পাপাচার সংঘটিত হয়েও যায়, তবে তওবা করে ফেলেন। আল্লাহ তায়ালা কালামে পাকে এরশাদ করছেন :

" তাহারা কি জানে না যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাগণের তওবা কবুল করেন এবং তাদের সদকা গ্রহণ করেন। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ অত্যন্ত বেশী তওবা কবুলকারি এবং দয়াপরায়ণ।"

"আর সেই ব্যক্তি কোন পাপ কাজ করে কিংবা নিজের উপর যুলুম করে অতঃপর আল্লাহ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে, তাহা হইলে সে আলণ্ঢাহ তা'আলাকে অতীব ক্ষমাশীল ও দয়াপরায়ন পাইবে।"

" আর আমি (আল্লাহ) সেইসব লোকদের জন্য অতিশয় ক্ষমাশীল, যাহারা তওবা করে ও ঈমান আনে এবং নেক আমলের উপর সর্বক্ষণ কায়েম থাকে।)"

তোমরা যদি সেইসব বড় বড় পাপ অর্থাৎ (কবিরা গোনাহসমূহ) হইতে কিরত থাক, যাহা হইতে বিরত থাকার জন্য তোমাদিগকে নির্দেশ দেওয়া যাইতেছে, তাহা হইলে আমি তোমাদের ছোট-খাট পাপ

(অর্থাৎ, সগীরা গোনাহসমূহ) তোমাদের হইতে মোচন করিয়া দিব এবং তোমাদিগকে একটি সম্মানিত স্থানে প্রবেশ করাইব।"

তাফসিরে বয়ানুল কোরআনে কবিরা গোনাহর সংজ্ঞা বর্ণনা প্রসঙ্গে বেশ কয়টি বক্তব্য উদ্ধৃত করা হয়েয়ছে। সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য বক্তব্য যা "তাফসিরে রূহুল মা'আনি" এর মধ্যে শায়খুল ইসলাম বারেযি (রহ:) হতে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, যে গোনাহর উপর কোন শাস্তি অথবা নির্ধারিত দন্ড রয়েছে, অথবা লা'নত প্রদান করা হয়েছে, অথবা যন্মধ্যে অনিষ্টতা কোন এমন গোনাহর অনিষ্টতার সমান অথবা বেশী হয়, যাহার উপর শাস্তি অথবা নির্ধারিত দন্ড অথবা লা'নত রয়েছে, অথবা যাহা দ্বীনের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনের নিমিত্ত সংঘটিত হয়, তা-ই কবিরা গোনাহ। আর হাদিসসমূহের মধ্যে কবিরা গোনাহর যে সংখ্যা বর্ণিত হয়েছে, তা দ্বারা নির্দিষ্ট সংখ্যায় সীমাবদ্ধ করা উদ্দেশ্য নয়। (এলাহী[১৭], পৃ: ২-৭)

সুতরাং সগিরা গোনাহ সংঘটিত হওয়ার পরবর্তীতে কয়েকটি অবস্থা হতে পারে। প্রথম অবস্থা এ হতে পারে যে, কবিরা গোনাহ থেকে বিরত থাকবে এবং প্রয়োজনীয় নেক আমলের পায়বন্দ হবে। এমতাবস্থায় ওয়াদা রয়েছে যে, সগিরা গোনাহসমূহ মাফ হয়ে যাবে এবং আয়াতের মধ্যে এটাই বর্ণিত হয়েছে।

তাই শাহরিয়ারের মতে একজন সাধকের জন্য তওবা অত্যন্ত প্রয়োজনিয় একটি বিষয়।

উপসংহার :

সার্বিক বিবেচনায় শাহরিয়ারের আধ্যাত্মিক দর্শনকে আমরা জীবন ঘনিষ্ট দর্শন হিসেবে উল্লেখ করতে পারি। তিনি খানকা ও খেরকা ভিত্তিক আধ্যাত্মিক দর্শনে কখনোই বিশ্বাস করতেননা। তিনি বিশ্বাস করতেন কপটতা ও লোক দেখানো আমল দ্বার কখনোই আল্লাহর কাছ পর্যন্ত পৌছানো যায়না। বরং কোন ব্যক্তিকে আধ্যাত্মিক শক্তিতে বলীয়ান হতে হলে আত্মিক উন্নতি ঘটানো সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন। সে জন্য তার আত্ম সত্ত্বার বিকাশ ঘটাতে হবে। মানব সত্ত্বাকে কলুষিত কারি রীপুগুলোর দমনের মাধ্যমে আত্মাকে পরিত্র করতে হবে। লোভ-লালসা, কামনা-বাসনা, ক্রোধ-হিংসা, গৌরব-অহংকার ইত্যাদি দমনের মাধমে নিজেকে পরিপূর্ণ মানুষ রূপে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। একজন প্রকৃত মানুষই পারেন আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করতে। মানুষের মানবীয় গুনাবলীর কারণেই আল্লাহ তাকে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টির আসনে আসীন করেছেন। নিজেকে পরিপূর্ণ মানুষ রূপে গড়ে তোলার যে সাধনা, সেটাই আধ্যাত্মিকতার সাধনা।

শাহরিয়ার অধ্যাত্মপ্রেম কে তিন ভাগে ভাগ করেছেন। প্রথমত মানবীয় প্রেম যা পুরো সৃষ্টি জগতের জন্য নিবেদিত। সৃষ্টির প্রতি প্রেম ছাড়া মানুষ স্রষ্টার প্রেমিক হতে পারেনা। দ্বিতীয় পর্যয়ে প্রেমিকের অন্তরে স্রষ্টার প্রতি ভাললাগা তৈরী হয়। তখন সে বিভিন্ন প্রচেষ্টার দ্বারা সেই ভাল লাগাকে ভালবাসায় পরিণত করার সাধণায় লিপ্ত হয়। তৃতীয় পর্যয়ে প্রেমিক আল্লাহর প্রেমে নিমগ্ন হয়।

শাহরিয়ারের মতে : ধর্ম সদা সত্য ও সুন্দরের কথা বলে। যা সত্য নয় বা সুন্দর নয় তা কখনো ধর্ম হতে পারেনা। আর এই সত্য-সুন্দরের প্রকাশ মাধ্যম হলো সুদ্ধ প্রেম। প্রেমই মানুষকে সুন্দরের পথ দেখায়, প্রেম হীনতাই তাকে অসুন্দরে বলয়ে আবদ্ধ করে। আঠারো হাজার মাখলুকাতের সাথে মানুষের

প্রধান পার্থক্য হলো, মানুষ প্রেমের মাহত্ম বোঝে কিন্তু অন্য কোন সৃষ্টি প্রেমের প্রবল শক্তিকে উপলব্ধি করতে পারেনা। মানব সমাজ গঠনের মূল হতিয়ার হলো এই প্রেম, তাই প্রেমই পারে স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে মিলন ঘটাতে। এই অভিসন্ধর্ভে শাহরিয়ারের আধ্যাত্মিক দর্শনকে সংক্ষিপ্ত ভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছি। আমরা যদি নিজেদের জীবনে শাহরিয়ারের এই দর্শনকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারি, অমার বিশ্বাস সুখী-সমৃদ্ধ জীবন ও সমাজ গঠনে তা সহায়ক হয়ে উঠতে পারে।

গ্রন্থাবলী

১. অসতিয়ানি, আব্বাস ইকবাল, ZvevKv‡Z mvjwZ‡b Bmjvg, এন্তেশা'রা'তে দুনিয়ায়ে কিতাব, তেহরান, ১৩৬৩ হি: শা:।

২. আউলিয়া, হযরত খাজা নিজামুদ্দিন, dvIqv‡q' j dvIqv', অনুবাদ কফিলদ্দিন আহমদ চিশতী, চিশতীয়া পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০০২ খ্রি:।

৩. আজরফ, দেওয়ান মোহাম্মদ, 'kb kv¯ I jvjb-gbxIv, লালন পরিষদ পত্রিকা, প্রথম পর্ব, প্রথম সংখ্যা, লালন পরিষদ কেন্দ্রীয় সংসদ, ঢাকা, ১৯৭৭ খ্রি:।

৪. আতাউল্লাহ, শায়খ ইবনে, c_ I cÁv, অনুবাদ মুহাম্মদ আলমগীর, আত্মশুদ্ধি প্রকাশনা, ঢাকা, ১৯৯৯ খ্রি:।

৫. আনুশে, হাসান, ZvÔwi‡L Bivb(K¨vgweR), অনুবাদ, এন্তেশা'রাতে আমির কাবির, তেহরান, ১৩৮১ হি: শা:।

৬. আনুশে, হাসান, 'v‡bkbvÔ‡g‡q Av'weqv'†Z dviwm, মোসেসিয়ে ফারহাঙ্গি ভা এন্তেশা'রা'তিয়ে দানেশনা'মে, তেহরান, ১৩৭৫ হি: শা:।

৭. আব্দুল্লাহ, ডঃ সাইয়্যেদ, Av'weqv‡Z dviwm 'vi wgqv‡b wn›'qvb, অনুবাদ, ডঃ মুহাম্মদ আসলাম খান, তারিখে এন্তেশা'রা'ত, তেহরান ১৩৭১ হি:।

৮. আমিন, মাওঃ মোহাম্মদ রহুল, ZvQvIqd-ZË ev ZwiKZ 'cY, ছারছীনা লাইব্রেরী, ঢাকা, ২০০৬ খ্রি:।

৯. আমেরি, কিউমারস, hevb fv Av'v‡e dvivm 'vi wn›', শোভরায়ে গোস্তারেশে যবান ভা আদাবিয়াতে ফারসি, তেহরান, ১৩৭৪ হিঃ শাঃ।

১০. আলম, ডঃ রশীদুল, মুসলিম দর্শনের ভূমিকা, সাহিত্য সোপান, বগুড়া, ১৯৯৩ খ্রিঃ।

১১. আলুসী, শিহাবুদ্দিন মোহাম্মদ বিন আল-হুসাইনি, iæûj gvÔwb wd Zvdwmwij †KviAvwbj Awhg fv mveDj gvmwb, নশরে দারুল কাতবুল ইলমিয়া, বৈরুত, ১৪১৫ হিঃ কাঃ।

১২. আযম, মো'যামেয়ে একবালী, †kÔ‡iv kv'†qiÔb 'vi BivÔ‡b Bmjvgx, দাফতারে নশরে ফারহাঙ্গে ইসলামী চতুর্থ সংস্করণ, তাবেস্তান ১৩৬৯ হিঃ শাঃ।

১৩. আসগর, ডঃ আফতাব, ZvÔwiL †bwfwQ‡q dvivm 'vi wn›' fv cwK¯Ívb, ইরানি সাংকৃতিক কেন্দ্র,লাহোর পাকিস্তান, ৯৩২-১১১৮ হিঃ কাঃ।

১৪. আহমাদ, ডঃ যহুরুদ্দিন, অনুবাদ ডঃ মুহাম্মাদ হোসাইন তাসবিহি, ivIqv‡e‡Z w'wiwb‡q Bivb fv cwK¯Ívb, কিহানে ফারহাঙ্গি তীর মা'হ, তেহরান ১৩৬৭ হিঃ।

১৫. ইসলাম, ডঃ আমিনুল, RMr Rxeb 'kb, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯২ খ্রিঃ।

১৬. উদ্দীন, মুহম্মদ মনসুর, Biv‡bi Kwe, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৭৮ খ্রিঃ।

১৭. এলাহী, আলহাজ্জ মাওলানা মুফতী মোহাম্মদ আশেকে, অনুবাদ মাওলানা আবুল কালাম মোঃ আব্দুল লতিফ চৌধুরী, এমদাদিয়া পুস্তকালয়, ঢাকা, ২০০৫ খ্রিঃ।

১৮. কাইউম, মোহাম্মদ আব্দুল, †gvnv¤§' eiKZjøvn iPbvejx, বাংলা একাডেমি, ঢাকা ১৯৮৯ খ্রিঃ।

১৯. কাসির, আবুল ফেদা' ইসমাঈল বিন উমর বিন, Zvdwmiæj †KviAvbj Avhxg, দারে তাইয়্যেবাহ লিন্নশর ভাত্তাওযী, ১৪২০ হিঃ।

২০. কাসেমি,মোহসেন আবুল, Zwi‡L †gvLZvmv‡i hev'†b dvivm, এন্তেশা'রা'তে তা'হুরি ১৩৭৮ হিঃ শাঃ।

২১. কাভইয়ানপুর, আহমাদ, †R‡›'Mwb‡q Av'we fv GR‡ZgvÔwq‡q kvnwiqvi, সা'জেমা'নে চাপ ভা এন্তেশা'রা'তে ইকবাল, তেহরান, ১৩৭৫ হিঃ শাঃ।

২২. কুশাইরী, আল, ZviRwg‡q †imwj‡q KkvBix, এন্তেশা'রা'তে এলমি ভা ফারহাঙ্গি, ১৩৭৪ হিঃ শাঃ।

২৩. কে আলী, অধ্যাপক, fviwZq Dcgnv‡'‡k gmjgvb‡'I BwZnvm, আলী পাবলিকেশন্স, ১৯৬২ খ্রিঃ।

২৪. খান, আল্লামা আল্লাহ ইয়ার, Bmjvgx ZvQvD‡di ¯i/c, অনুবাদ, মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, মদীনা পাবলিকেশান্স, ঢাকা, ২০০৫ খ্রিঃ।

২৫. খোর্‌রামশাহী, বাহাউদ্দিন, †hn‡bv hev'†b nv'†dR, এন্তেশা'রা'তে নাহিদ, তেহরান ১৩৮৪ হিঃ।

২৬. গাজ্জালী, ইমাম আল, wKwgqv‡q mvÔ'vZ, ৪ খন্ড, এমদাদিয় লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৮৬ খ্রিঃ।

২৭. চিশতি, আবুল হাসান, iæn, খানকায়ে হাসানিয়া, খুলনা, ১৯৬৩ খ্রিঃ।

২৮. চিশতি (রহঃ), হযরত খাজা মুঈনুদ্দিন, অনুবাদ জেহাদুল ইসলাম ও ডঃ সাইফুল ইসলাম খান, w'Iqv‡bÑB-gCbwÏb, গতিয় প্রিন্টিং, ঢাকা ২০০৩ খ্রিঃ।

২৯. চৌধুরী, ড. মফিজ, Mwj‡ei Mhj, আহমাদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ২০০৭ খ্রিঃ।

৩০. জাওযিয়্যাহ, আল্লামা ইবনুল কায়্যিম, i|n, অনুবাদ মাওলানা মুজীবুর রহমান, এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা ২০০৭ খ্রিঃ।

৩১. জিলানী, শায়খ আবদুল কাদের, dZûj Mvqe, অনুবাদ ঃ মাওলানা বদিউল আলম, মোহাম্মদী বুক হাউস, ঢাকা।

৩২. তামীমদারী, ডঃ আহমাদ, dvmx mwn‡Z¨i BwZnvm, অনুবাদ ডঃ তারিক জিয়াউর রহমান শিরাজী ও মুহাম্মদ ইসা শাহেদী, ইরানিয়ান কালচারাল সেন্টার ঢাকা।

৩৩. তাবারী, মোহাম্মদ বিন জা'ফার বিন জারীর, Rv‡gDj evqvb wd Zvd&wmwj †Kvi-Avb, ২৪ খন্ড, মো'সিসিয়ে রেসালা, ১৪২০ হিঃ।

৩৪. তালিব, আলী ইবনে আবী, নাহজুল বালাগা, নুরুস সাকলায়েন জনকল্যান সংস্থা, ঢাকা ২০০৩ খ্রিঃ।

৩৫. তোরাবি, মোহাম্মদ আলী, gvRv‡jø‡q G‡Ëjv‡Z Gjwg, মেহের ৬৯।

৩৬. দাস্তেগীর, আব্দুল আলীম, gvRv‡jø‡q cvqv‡g bwfb, ১৩৩৯ হি শা, সংখ্যা ৫।

৩৭. দুস্ত, ডঃ আলী আসগর শে'র, শাহরিয়ার ও শে'রে তুর্কী, সা'জেমা'নে চা'প ও এন্তেশা'রা'তে ভযা'রাতে ফারহাঙ্গো হুনার, তেহরান ১৩৮৩ হিঃ।

৩৮. দেহলবী, শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দেস, Avj KvDjj Rwgj, হক লাইব্রেরী, ঢাকা ২০০০ খ্রিঃ।

৩৯. নাফিসি, ডঃ সায়িদ, Zvd&i‡L bvR‡gv bvm‡i dvimx, এন্তেশারা'তে ফোরুগী, তেহরান, ১৩৪৪ হিঃ।

৪০. নাযাদ, ডক্টর কামেল আহমাদ, dvimx Dgwg, নশরো ভিরা'য়েশ, তেহরান ১৩৮৩ হিঃ।

৪১. ফাজেলী, মাহবুদ, Akbvqv evkv'†qiv'†b K¨vd&m‡K Bivb, এন্তেশা'রা'তে বেইনুল মেলা'লি আলহুদা, তেহরান ১৩৮০ হিঃ।

৪২. ফরিদপুরী, হযরত মাওলানা শামছুল হক সাহেব, Zvd&wjgÏxb, এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা ২০০৫ খ্রি।

৪৩. ফরিদপুরী, হযরত মাওলানা শামছুল হক সাহেব, KQ'Q Qexj, এমদাদিয়া পুস্তকালয়, ঢাকা ২০০৬ খ্রিঃ।

৪৪. বারী, আবদুল ফাত্তাহ জামীল, gnvbexi gnvevYx, মল্লিক ব্রাদার্স, কলকাতা ২০০০ খ্রিঃ।

৪৫. বারী, মুহাম্মদ আব্দুল, 'k‡bi K_v, হাসান বুক হাউস, ঢাকা ২০০০ খ্রিঃ।

৪৬. বাহার, মালেকুশশোয়ারা ivIqv‡e‡Z dvinw½‡q Bivb fv wn›', ২য় খন্ড, আমির কবির, তেহরান ১৩৭১ হিঃ।

৪৭. বাংলা পিডিয়া, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, সম্পাদনায়, সিরাজুল ইসলাম, ঢাকা, ২০০৩ খ্রিঃ।

৪৮. বিরশাক, আহমাদ, wgiv‡m Bivb, অনুবাদ, তেহরান ১৩৭৪ হিঃ।

৪৯. মাওলাভি, জালালুদ্দিন মোহাম্মদ বিন মোহাম্মদ, gvmbwf‡q gvbwf, এন্তেশা'রাতে হোরমোস, তেহরান ১৩৮২ হিঃ।

৫০. মানিরী, আহমাদ ইয়াহইয়া, মাকতুবাতে সদী অনুবাদ, এ,কে,এম ফজলুর রহমান মুনশী, দি আদর্শ ছাপাখানা, ঢাকা ২০০৭ খ্রিঃ।

৫১. মাশিরী, ফারিদুন, gvhv‡jø‡q Zvgvkv, ৫ম বর্ষ, খোরদাদ, ১৩৫৪ হিঃ শাঃ।

৫২. মাযারয়ি, ডক্টর ফখরুদ্দিন মাযারয়ি, gvdû‡g †iwš' 'vi †k'†i nv‡dR, অনুবাদ কামবিয মাহমুদ যা'দে, এন্তেশা'রা'তে কুয়ার, তেহরান ১৩৮৩।

৫৩. মোহাম্মদি, আবুল ফজল আলী ও জুলফেকারী, ডক্টর হাছান, nv‡dR †e †ifv‡q‡Z kvnwiqvi, নশরে চাশমে, তেহরান ১৩৮১।

৫৪. মক্কী, হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজের, whqDj Kje, অনুবাদ, মাওলানা ফরীদুদ্দিন মাসউদ, শান্তিধারা প্রকাশনী, ঢাকা ১৯৯৫।

৫৫. মজিদী, নূর হোসেন, b‡i gnv¤§v'xi ggK_v, খায়রুন প্রকাশনী, ঢাকা ১৯৯৮।

৫৬. মজিদী, নূর হোসেন, Biv‡bi mgKvjxb BwZnvm, ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা ১৯৯৬।

৫৭. রশিদ, ফকির আব্দর, mwd 'kb, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ১৯৮০।

৫৮. রহমান, শাহ আবদুর, kidj Bbmvb, হামিদুর রহমান সম্পাদিত, প্রিভিন্সিয়ায়ল লইব্রেরী, ঢাকা ১৩৮৭ বঙ্গাব্দ।

৫৯. রহমান, হাসান হাফিজুর, AvawbK Kwe I KweZv, বাংলা একাডেমি, ঢাকা ১৯৯৩।

৬০. রুদ্র, তপন, †mKwcq‡ii iPbvmgM, সালমা বুক ডিপো, ঢাকা ২০০০।

৬১. রেফায়ী, শাহ সাইয়্যেদ আহমদ কবীর, অনুবাদ মাওলানা মাহমুদুল হাসান, Avj-einvbj gABqv', মাকতাবাতুল আবরার ২০০৬।

৬২. লি, ডক্টর কাভভাস হাসান, ¸‡bnv'†q b I fwi 'vi †k'†i †gvqv‡m‡i Bivb, নশরে সালেস ১৩৮৩ হিঃ শাঃ।

৬৩. শামিসা, ডক্টর সিরুস, mveK wkbwm‡q †ki, এন্তেশা'রা'তে ফেরদৌস, তেহরান ১৩৭১ হিঃ শাঃ।

৬৪. শাহ, ফকির আনোয়ার হোসেন মন্টু, jvjb-msMxZ, লালন মাজার শরীফ ও সেবা-সদন কমিটি, কুষ্টিয়া ১৯৯৫।

৬৫. শাহরিয়ার, উস্তাদ সাইয়্যেদ মোহাম্মদ হোসেন, হায়দার বাবায়ে সালাম, ফার্সি অনুবাদ, সাইয়্যেদ মাহদি দারি, তাবরীজ ১৩৮৪ হিঃ।

৬৬. শাহরিয়ার, মোহাম্মদ হোসাইন, w' fv‡b kvnwiqvi, মোসেসিয়ে এন্তেশা'রা'তে নেগাহ, তেহরান ১৩৮৫ হিঃ শাঃ।

৬৭. শিরাজী, শেখ মোসলেহ উদ্দিন সা'দী, নশরে মাওকুফাতে ডঃ মাহমুদ আফশার, তেহরান ১৩৮০ হিঃ শাঃ।

৬৮. শিরাজী, খাজা শামসুদ্দিন মোহাম্মদ হাফেজ, দিভানে হাফেজ

৬৯. সাফা, ডঃ যবিহুল্লাহ, Zwi‡L Av'weqv‡Z dvivm, এন্তেশা'রা'তে ফেরদৌস, তেহরান ১৩৭১ হিঃ শাঃ।

৭০. সামারকান্দি, নিযামি আরুযি, Pvnvi gvKvjv, এন্তেশা'রা'তে জা'মি, তেহরান ১৯৯৬।

৭১. সারুতিয়ান, ডঃ বেহরুজ, kvnwiqvi gj‡K mLvb, এন্তেশা'রাতে দাস্তান, তেহরান ১৩৮৫।

৭২. সরকার, ডঃ মু আব্দুল লতিফ, AKvC', bvgvR I †ivhv, এ জেড কম্পিউটার এন্ড প্রিন্টার্স ২০০৬।

৭৩. সরকার, মোঃ সোলায়মান আলী, Bebj Avivex I RvjvjwÏb iæwg, বাংলা একাডেমি, ঢাকা ১৯৮৪ খ্রিঃ।

৭৪. হালাবি, ডঃ আলী আসগর, gvewb‡q Gidvbx fv Anfv'†j Av‡idvbx, এন্তেশা'রা'তে আসাতির, তেহরান ১৩৮৮ হিঃ শাঃ।

৭৫. হাযারী, মাওলানা আব্দুর রহিম, mwdZ‡Ëi AvZ¥K_v, রশিদ বুক হাউস, ঢাকা ১৯৯৪ খ্রিঃ।

৭৬. হুকুকি, মোহাম্মদ, gvifwi evi Zvbwi‡L Av'e fv Av'weqv'†Z Ggiæ‡h Bivb, নশরে ক্বাতরে, তেহরান ১৩৮০ হিঃ।

৭৭. হোসাইন ফকির আলতাফ, Kv‡jgv 'cY, আরমার প্রিন্টি ওয়ার্কস, ঢাকা ১৯৮৮ খ্রিঃ।

৭৮. হক, খোন্দকার রিয়াজুল, gigx Kwe †Lv'v eKk kvn: Rxeb I m½xZ, বাংলা একাডেমী ঢাকা, ১৯৯৭ খ্রিঃ।

৭৯. Ali, sv, MIr ahmed, Hossain the savior of islam, tahrik-e-tarsil-e-Quran, new york, 1991.

৮০.Azraf, principal Mohammad, Abu dharr Ghifari, islamic foundation bangladesh, 1980.

৮১. Browne, prof. Edward Granvile, Literary History of persia, T. fisher Unwin. London.

৮২. Falconer, I.G.N, Fables of Bidpai, Cambridge university press, 1885.

৮৩. Glubb, john Bagot, The Life and Time of Muhammad, Hodder stoughton, London, 1979.

৮৪.Hasan, dr. Syed Mahmudul, SOME ASPECTS OF ASLAM, ANANYA, dhaka 2008.

৮৫. Haq, Muhammad Muzammel, Some Aspects of the Principal Sufi Order in India.

৮৬. Haq, prf. Muhammad Enamul, A History of Sufism in Bengal, Asiatic society of Bangladesh, 1975.

৮৭. Husaini, Maulavi S.A.Q , Ibn Al-Arabi, Mohammad Ashraf, Lahore, 1931.

৮৮. Mia, Dr. Abdul Jalil, A contemporary Philosophy of Religion, Islamic Foundation Bangladesh, 1982.

৮৯. Mia, Shajahan, Russell's Theory of perception, Dhaka University 1998.
৯০. Prof, R. Levy, Persian Literature, Oxford University press, London 1923,

যে সমস্থ ওয়েব সাইটের সাহায্য নেওয়া হয়েছে তার বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

http://www.altafsir.com
http://www.azarpadgan.com/

http://epiran.blogfa.com/8806.aspx

http://ganjoor.net/
http://www.hosein1389.blogfa.com/cat-21.aspx
http//www.sid.ir.com/
www.zlib.ir